KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : মীর রহমান
Title চতুরঙ্গ	Size 7'x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ৫৪/১ ৫৪/2 ৫৪/৩ ৫৪/৪	Year of Publication : শ্রাবণ ১৪০০ কার্তিক ১৪০০ ফাল্গুন ১৪০০ চৈত্র ১৪০০
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : আবদুর রউফ	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৫৪ সংখ্যা ৪ চৈত্র ১৪০০

ধর্মবিবর্জিত রাজনীতির বিপদ নিয়ে লিখেছেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ।

ইতিহাসের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মপ্রভাবিত রাজনীতির বিপদ এবং বর্তমান রাজনীতির সংকট পর্যালোচনা করেছেন অধ্যাপক জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রামমোহন, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ এবং অন্নদাশঙ্করের চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সেকুলারিজমের স্বরূপসন্ধান করা হয়েছে 'অন্নদাশঙ্করের সেকুলার ভারতবর্ষ' প্রবন্ধে।

আধুনিক বাংলা গানের ক্রমবিবর্তিত সংকট থেকে উত্তরণের পথে এগিয়ে যাওয়ার ঘটনার তথ্যনিষ্ঠ পর্যালোচনার শেষ অংশ।

কাজী আবদুল ওদুদের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে ওদুদকে নিয়ে তাঁর সমসাময়িক লেখিকা জ্যোতির্ময়ী দেবীর একটি অপ্রকাশিত আলোচনা।

'শিখা' গোষ্ঠীরও আগে 'মুক্তবুদ্ধি'চর্চার যিনি পথিকৃৎ সেই মনীষী লুৎফর রহমানকে নিয়ে তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ।

সমকালের নামে একালের বিদ্যাসাগর বিচার নিয়ে গ্রন্থ পর্যালোচনা।

গ্যাটচুক্তির ফলে সত্যিই কি উন্নয়নশীল দেশগুলির উপর আমেরিকার আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ বেড়ে গেছে?—প্রশ্নটি নিয়ে তথ্যনিষ্ঠ বিশ্লেষণ।

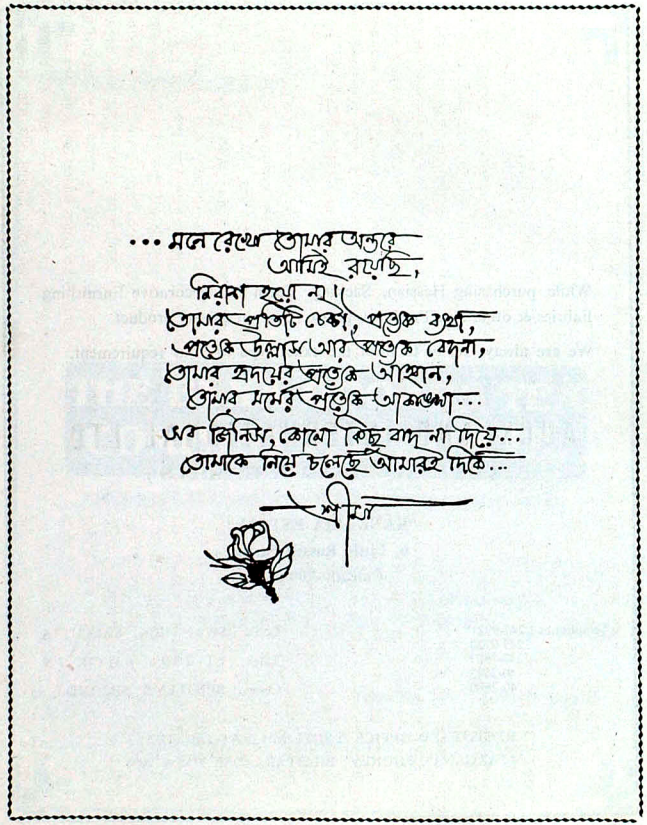

বর্ষ ৫৪ সংখ্যা ৪
চৈত্র ১৪০০

ধর্ম ও রাজনীতি ❑ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ২৬৯
ধর্ম ও রাজনীতি ❑ জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৭১
অন্নদাশঙ্কর রায়ের সেকুলার ভারতবর্ষ ❑ আবদুর রউফ ২৮৭
আধুনিক বাংলা গান — একটি পর্যালোচনা ❑ সুভাষ বাগচী ২৯৭

কবিতা

আকাশ কাঁদে, নদীটি নির্জন ❑ মহাদেব সাহা ২৭৯
আবিল ❑ হরপ্রসাদ মিত্র ২৮০
পরিব্রাজকের দিনলিপি থেকে ❑ বাসুদেব দেব ২৮১
ভারতবর্ষ ❑ দেবী রায় ২৮২
অবতরণ ❑ পার্থপ্রতিম মণ্ডল ২৮৩
মন্ত্র ❑ নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ২৮৫
আমাকে নেবার জন্য ❑ মেঘ মুখোপাধ্যায় ২৮৬

গল্প

ইবলীশের মৃত্যু ❑ সব্যসাচী সমাজদার ২৯১

গ্রন্থ সমালোচনা

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় ৩১২ ❑ সৌমিত্র লাহিড়ী ৩১৫ ❑ সুধীর চক্রবর্তী ৩১৭
❑ শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১৯ ❑ নিবেদিতা চক্রবর্তী ৩২০ ❑ শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায় ৩২২
❑ হাসির মল্লিক ৩২৪

সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি

কাজী আবদুল ওদুদ থেকে (শাশ্বত বঙ্গ) ❑ জ্যোতিময়ী দেবী ৩২৬
বিস্মৃত মনীষী মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ❑ ইসরাইল খান ৩৩৪

আন্তর্জাতিক

গ্যাট চুক্তি : আমেরিকা ও উন্নয়নশীল দেশ — জিতল কে ? ❑ বেণু গুহঠাকুরতা ৩৩৭

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক গুপ্ত প্রেস, কলি-৯ থেকে মুদ্রিত
এবং ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত
অফিস ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ দূরভাষ ২৭ ৬৩২৭
শিল্প পরিকল্পনা রণেনআয়ন দত্ত নির্বাহী সম্পাদক আবদুর রউফ

বাংলাদেশে এখন সবচেয়ে বিতর্কিত বই

আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র

যাঁর লেখা একসময় পাকিস্তানের আইয়ুব সরকার নিষিদ্ধ করেছিল 'ধর্মীয় আবেগে আঘাত' বলে— যাঁর লেখা পড়ে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী আহমদ শরীফ বলেন— ''আরজ আলী মাতুব্বরের গ্রন্থ পড়ে আমি মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছি নতুন কথা বলে নয়, তাঁর মুক্তবুদ্ধি, সৎসাহস ও উদার চিন্তা প্রত্যক্ষ করে।''

তিনখণ্ডে সমাপ্ত সম্পূর্ণ 'আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র' এখন কলকাতায়—

- উচ্চারণ/ইণ্ডিয়ানা
  ২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
- পাতিরাম
  কলেজ স্ট্রিট মার্কেট
- পুস্তক বিপণী ও
- দে বুক স্টোর-এ

পাঠক সমাবেশ

❑ ছোট কাগজ ও অন্য ধারার বই ঘর ❑
১৭/এ, আজিজ মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা

ধর্ম ও রাজনীতি

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

'ধর্ম' শব্দের অর্থ 'ধারক' বা 'নিরায়াক'। যা আমাকে পথ বলে দেয়। জীবনের কী উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার কী উপায়, তা বলে দেয়। আমাদের যা কিছু মহৎ, সুন্দর ও উদার, তার প্রেরণা দেয়। জগতের যা কিছু শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, ধর্ম তার মূলে। শ্রেষ্ঠ মানুষও ধর্মের সৃষ্টি।

অথচ ইদানিং কালে রব উঠেছে যে রাজনীতিকে ধর্মের কবল থেকে মুক্ত রাখা হোক। তা আদৌ সম্ভব কিনা এবং সম্ভব হলে উচিত কিনা, তা একটু বিচার করা যাক।

'ধর্ম' যদি আমার 'ধারক' ও 'পরিচালক' হয়, তাহলে ধর্ম ছাড়া ভাল আমি কিছুই করতে পারব না। যদি করি তা ভুল হবে। উদ্দেশ্যবিহীন হবে। এলোমেলো হবে। মানুষ ভেবে-চিন্তে কাজ করতে পারে। যা ভাল, যা করলে আমার ভাল, অপরেরও ভাল, তা ধর্ম বলে দেবে। আমি যদি ধর্মের নির্দেশ মেনে না চলি, তাহলে যা করব, তা ভুল করা হবে।

প্রত্যেক ধর্মই সত্যের উপর জোর দেয়। অর্থাৎ আমি মুখে যা বলব, কাজেও তা করব। আমার উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে সমতা থাকবে। অসত্যের দ্বারা, অন্যায়ের পথে কোন মহৎ কাজ কখনও হতে পারে না। যাঁরা সত্যনিষ্ঠ, তাঁরা কায়মনোবাক্যে সত্যনিষ্ঠ। সাফল্য লাভ করা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু অসদুপায়ে নয়। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন — 'সত্যের জন্যে সব কিছুকে ত্যাগ করা চলতে পারে, কিন্তু কোন কিছুর জন্যে সত্যকে ত্যাগ করা যায় না।'

রাজনীতি থেকে যদি ধর্ম বাদ দেওয়া হয়, তাহলে যিনি রাজনীতি করবেন, তিনি আর সত্যনিষ্ঠ থাকার কোন প্রয়োজন বোধ করবেন না। যদি বলেন, ধর্মকে বাদ দিয়েও সত্যনিষ্ঠ হওয়া যেতে পারে, তাহলে প্রশ্ন হবে ধর্মকে বাদ দিলে সত্যের প্রেরণা কোথা থেকে আসবে? ধর্ম মানুষকে লোভ সম্বরণ করতে বলে, সর্বদা সৎ পথে চলতে বলে। যাঁরা ধর্মে বিশ্বাস করেন, তাঁরা বহু প্রলোভন সামনে এলেও ধর্মপথ থেকে বিচলিত হন না। অন্তত না হবার চেষ্টা করেন। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি ধর্মহীন হন, তাহলে তাঁর এই প্রলোভন দমন করার কোন দায় থাকে না। তখন ন্যায় বা অন্যায় বিচার না করে যেন-তেন-প্রকারেণ, তাঁর কার্যসিদ্ধির চেষ্টা করেন। কিন্তু ধার্মিক ব্যক্তি তা করবেন না।

যদি বলেন, ব্যক্তিগত জীবনে প্রত্যেকেই ধার্মিক হোন, তাতে কারোর কিছু বলার নেই। ধর্ম প্রত্যেক ব্যক্তির স্ব স্ব ব্যাপার থাকুক, এইটেই বাঞ্ছনীয়। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি সৎ, প্রেমিক, উদার হোক — এতো আনন্দের কথা। এজন্য যদি কেউ ধর্মের সহায়তা নেয়, তাতে অপরের কি বলার থাকতে পারে?

তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে যা ব্যক্তির বেলাতে প্রযোজ্য, তা সমষ্টির বেলাতে প্রযোজ্য হবে না কেন? একটা দল বা সম্প্রদায় সমষ্টিগতভাবে সৎ ও মহৎ হতে চেষ্টা করুক ধর্মের সাহায্য নিয়ে, তাতে আপত্তি হবে কেন? কেউ কেউ বলেন, 'আমি একজন শিক্ষিত সামাজিক মানুষ, আমি মহৎ হব বা হতে চেষ্টা করব নিজের বিবেকের তাগিদে বা কর্তব্যবোধে। এর মধ্যে ধর্মের কি প্রয়োজন?' ইতরপ্রাণীরও কর্তব্যবোধ আছে দেখতে পাওয়া যায়। প্রভুভক্ত কুকুর নিজের প্রাণকে বিপন্ন করেও প্রভুকে বা প্রভুর সন্তান-সন্ততি বা সম্পদকে রক্ষা করতে চেষ্টা করে। তবে তার বিবেকবুদ্ধি কতটা আছে, তা তর্কের বিষয়। সে কি ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বিচার করে চলতে পারে? খানিকটা হয়ত পারে, কিন্তু মানুষের মতো পারে না। মানুষ উচ্চ চিন্তা করতে পারে, একটা আদর্শকে বেছে নিয়ে তাকে অনুসরণ করে চলতে পারে, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা, কোন্‌টা নিজের পক্ষে এবং সকলের পক্ষে কল্যাণকর, তা বিচার করে চলতে পারে, প্রলোভন দমন করতে পারে, নিঃস্বার্থ জীবন যাপন করতে পারে, প্রয়োজন হলে সমষ্টির মঙ্গলের জন্যে নিজের সর্বস্ব উৎসর্গ করতে পারে।

মানুষের এই সব উচ্চ প্রবৃত্তি অথবা যা কিছু অসুন্দর, অন্যায়, আপাতমধুর কিন্তু পরিণামে দুঃখদায়ক, তা থেকে দূরে থাকার চেষ্টা, এই সবের উৎসকে আমরা ধর্ম বলি। আপনি যদি তার নাম শিক্ষা দিতে চান, তাতে কারোর কিছু বলার নেই। ধর্ম একটা কিছু অজ্ঞেয় শক্তি নয়। এ একটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জিনিস। এর কার্য-কারণ আছে। আমি যদি সৎ হই, নিঃস্বার্থ জীবন যাপন করি, সর্বদা পরের মঙ্গল কামনা করি, তাহলে আমি একজন আদর্শ মানুষ। আমি ধনী না হতে পারি, বিদ্বানও না হতে পারি, হয়ত সমাজে আমার কোন প্রতিষ্ঠাও নেই,

তবু আমি মানুষ হিসাবে ধনা। ধর্মই মানুষকে উন্নত থেকে উন্নততর হতে প্রেরণা দেয়। নিজের দোষ সম্বন্ধে সচেতন করে দেয় এবং সমস্ত দোষ থেকে মুক্ত হতে উৎসাহ দেয়। তাহলে একজন ধার্মিক লোক যখন রাজনীতিতে যোগ দেয়, তখন তার রাজনীতি নিশ্চয়ই উঁচু মানের হবে অর্থাৎ তা মিথ্যাবর্জিত হবে, প্রতিপক্ষের প্রতি তার ব্যবহার সৌজন্যসুলভ হবে, হিংসা, লোভ ও ক্রোধের দ্বারা তাড়িত হয়ে কোন অন্যায় আচরণ কারোর সঙ্গে করবে না। কিন্তু যে-ব্যক্তির ধর্মে আস্থা নেই, সেই ব্যক্তি যেন-তেন-প্রকারেণ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চান। ন্যায়-অন্যায়ের ধার ধারেন না। হয়ত সহৃদয়তার স্পর্শও এতটুকুও তাঁর মধ্যে নেই। এরকমের ধর্মহীন বা ধর্মবিরোধী ব্যক্তির রাজনীতি কি নিদারুন হবে, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

কিন্তু তথাকথিত ধার্মিক ব্যক্তিও অন্যায় করতে পারে, তার প্রমাণও অনেক আছে। সে দোষ ধর্মের নয়, সে দোষ ঐ ব্যক্তির। যে-কোন আদর্শের অবমাননা এইভাবে ঘটে আসছে, ঘটে আসবেও। তাতে আদর্শ ছোট হয় না, মিথ্যাও হয় না।

রাজনীতির সঙ্গে ধর্ম মেশানো উচিত নয়, এ কথা অর্থহীন। আমাদের প্রত্যেক চিন্তা, কথা ও কাজ ধর্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত হওয়া উচিত। বিশেষ করে রাজনীতির মতো এমন একটা জিনিস যার সঙ্গে দেশের ভাল-মন্দ ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে। প্রত্যেক রাজনৈতিক কর্মীর উচিত লোককল্যাণের জন্য সব রকমের স্বার্থপরতা, কুটিলতা, সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে থাকা। সবাই যেন দেখে তিনি নিষ্কলুষ। সর্বোপরি তিনি যেন সমদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি হতে পারেন। তাঁর কাছে আপন-পর কেউ নেই, সবাই সমান। যদি কেউ অন্যায় করে, সে তাঁর পরমাত্মীয় ও প্রিয়জন হতে পারে, কিন্তু তাতে শাস্তি দিতে তিনি দ্বিধা করবেন না। তিনি শুধু নিজের বা নিজের সম্প্রদায়ের স্বার্থের কথা ভাববেন না, ধর্ম, বর্ণ ও জাতি নির্বিশেষে সকল মানুষের কল্যাণের কথা ভাববেন।

একমাত্র ধর্মই মানুষকে উদার, সহিষ্ণু, প্রেমিক ও সৎ হতে উৎসাহ দেয়। সুতরাং ধর্মকে বাদ দিলে রাজনীতি দুর্নীতিতে পরিণত হয়। আজ সব দেশেই এই দুর্নীতির প্রাধান্য দেখতে পাচ্ছি। এতে কারোরই সুখ নেই, দুঃখ আজ সর্বজনীন। এই দুর্দশা থেকে রক্ষা পাব যখন ধর্মকে সহায় করে আমরা চলতে চেষ্টা করবে। এ সত্য শুধু রাজনৈতিক ব্যক্তির বেলায় প্রযোজ্য নয়, সব ক্ষেত্রের মানুষের বেলায় প্রযোজ্য।

ধর্ম ও রাজনীতি

জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে প্রাচীন কাল থেকেই দেশে দেশে শাসক শ্রেণী আমজনতার উপর তাদের শোষণ-শাসন কায়েম রাখবার উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার করে এসেছে। প্লেটো তার **রিপাবলিক** গ্রন্থে শাসক শ্রেণীকে উপদেশ দিয়েছেন যে তারা যেন জনসাধারণকে বশীভূত রাখবার জন্য জেনেশুনেই একটি অলীক সৃষ্টিতত্ত্ব প্রচার করে। এই সৃষ্টিতত্ত্বে বলা হবে যে ঈশ্বর পৃথিবীর গর্ভে সব মানুষকে সৃষ্টি করবার সময় কিছু মানুষের মধ্যে সোনা, কিছু মানুষের মধ্যে রুপো, আর বাকি সব মানুষের মধ্যে পেতল ও লোহা মিশিয়ে দিয়েছিলেন। আর এভাবেই সমাজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্তরবিন্যাস ঈশ্বরের ইচ্ছায় চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল। কৌটিল্য তার **অর্থশাস্ত্র** গ্রন্থে বলেছেন যে রাজা এবং পুরোহিতেরা যেন প্রজাদের যুদ্ধে উৎসাহিত করবার জন্য বেদ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে এই তত্ত্ব প্রচার করে যে যুদ্ধে সাহসিকতা প্রদর্শন করে নিহত হলে মুনিঋষিদের চেয়েও উচ্চতর স্বর্গে স্থান পাওয়া যায়। তাছাড়া নিজ প্রজাদের বশীভূত রাখবার জন্য এবং প্রতিপক্ষ রাজাকে পরাজিত করবার উদ্দেশ্যে নানারকম ধর্মীয় ভাঁওতা প্রয়োগের উপদেশ **অর্থশাস্ত্রের** সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। আর পৃথিবীর সব দেশেই রাজা ও তাদের অন্নভোজী পুরোহিতেরা রাজাদের ঐশ্বরীয় উৎপত্তি এবং তাদের অনুশাসনের অলৌকিক উৎসের তত্ত্ব প্রচার করে এসেছে। যেকোন ধর্মের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই দেখা যায় যে এভাবে শাসক শ্রেণী সর্বদাই তাদের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য জনসাধারণের ধর্মবিশ্বাসকে একটি প্রধান হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে এসেছে। কিন্তু এই নিবন্ধে আমরা আমাদের আলোচনা প্রধানত ভারতবর্ষে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের মধ্যেই সীমিত রাখব। অবশ্য ধর্ম ও রাজনীতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছুটা সাধারণ আলোচনা করা হবে।

মনু রাজাদের ঐশ্বরীয় উৎপত্তির তত্ত্ব, চাতুর্বর্ণ্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত অসম আর্থসামাজিক কাঠামো ঈশ্বর দ্বারা রচনার তত্ত্ব, এবং শাসক শ্রেণী দ্বারা রচিত রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক বিধানগুলির অলৌকিক উৎসের তত্ত্ব নিপুণভাবে প্রচার করেছেন। এভাবেই হিন্দুধর্মের ভিত্তিমূল **মনুস্মৃতিতে** ধর্মকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসাবে স্পষ্টতই ব্যবহার করা হয়েছে। এমনকি উপনিষদের রচয়িতারাও ধর্মের রাজনৈতিক প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ **ঈশাবাস্যোপনিষদ** প্রথম শ্লোকেই বলছে :

> ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
> তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ ধনম্॥

— ঈশ্বর চলমান জগতের সর্বত্র বিরাজমান আছেন। তিনি তোমার জন্য যা ত্যাগ করেছেন তাই ভোগ করো, অন্য কারোর ধনে লোভ কোরো না।

প্রশ্ন ওঠে, ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান, এই তত্ত্বের সঙ্গে ধনবণ্টনের প্রশ্নকে জড়িয়ে পরের ধনে লোভ না করবার উপদেশ দেওয়া হল কেন? সহজ উত্তর এই যে এই শ্লোকের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে অসম ধনবণ্টনকে সমর্থন জানানো, আর এভাবে ধর্মতত্ত্বের সাহায্যে শাসক শ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধি করা। ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবানের মুখে এই উক্তি প্রচার করা হয়েছে যে তিনি স্বয়ং চাতুর্বর্ণ্য প্রথা সৃষ্টি করে তার উপর মানুষের সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাছাড়া শূদ্র এবং নারীদের ধর্মশাস্ত্র দ্বারা নির্দিষ্ট শৃঙ্খলিত আর্থসামাজিক হীনস্থানকে ঐশ্বরীয় সমর্থন জানিয়ে শ্রীভগবানের অনেক প্রবচন ভগবদ্গীতায় সংকলিত হয়েছে। এভাবে জনসাধারণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের উপর মুষ্টিমেয় পরগাছা শাসক শ্রেণীর শোষণ-শাসনকে চিরায়ত করবার উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার করা হয়েছে। ধর্মের এ ধরনের রাজনৈতিক প্রয়োগের উদাহরণ রামায়ণ-মহাভারতেরও সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

মধ্যযুগে এদেশে তুর্কি-আফগান এবং মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে হিন্দু রাজা, সামন্ত, সমাজপতি এবং পুরোহিতকুলের রাজনৈতিক সংকট উপস্থিত হয়। এ সময়ে হিন্দু সমাজের শাসকশ্রেণীর পক্ষে বহিরাগত সভ্যতা ও সংস্কৃতির রাজনৈতিক মোকাবিলা করা কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না। কারণ ইসলামীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছিল বলিষ্ঠভাবে আন্তর্জাতিক, সামাজিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সমষ্টিগত ঐক্যে বিশ্বাসী। অন্যদিকে হিন্দু ধর্ম ও সভ্যতা ছিল জাতীয় স্তরে সীমাবদ্ধ, গুরুতর সামাজিক অসাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক। তাছাড়া মধ্যযুগে আরব সভ্যতা ছিল পৃথিবীর সব চেয়ে উন্নত সভ্যতা, আর

ভারতীয় সভ্যতা ছিল অতল অন্ধকারে। এই পরিস্থিতিতে বহুসংখ্যক হিন্দু ধর্মাবলম্বী শাসকদের ইসলাম ধর্ম স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিল। আরেক অংশ রাজনৈতিক পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলতে ধর্মীয় ভক্তিবাদের মধ্যে আশ্রয় নেয়। তাও আবার অনেকটাই ইসলাম ধর্মের আদর্শে ও অনুকরণে। অন্যদিকে হিন্দু সমাজপতিরা চাতুর্বর্ণ্য প্রথাকে এবং ধর্মশাস্ত্রনির্দিষ্ট নারী ও শূদ্র-অতিশূদ্রের আর্থসামাজিক হীনস্থানকে আরও মজবুত করে ইসলামের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলার চেষ্টা করে। এভাবে রাজনৈতিক প্রত্যাঘাতে অক্ষম বহুধাবিভক্ত এবং অসম হিন্দু সমাজ মধ্যযুগে ধর্মকে রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আত্মরক্ষার কাজে ব্যবহার করে।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে এদেশে যে ধর্মসংস্কার আন্দোলন আরম্ভ হয় তারও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক। ব্রিটিশ শাসনে পরাজিত, অপমানিত, লাঞ্ছিত এবং হতাশাগ্রস্ত ভারতীয় হিন্দু সভ্যতা, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। সামরিক শক্তিতে ছীনবল, সামাজিক ক্ষেত্রে বহুধাবিভক্ত এবং ধর্মশাস্ত্রের অন্ধ অনুশাসনে আবদ্ধ, বিজ্ঞানে অনুন্নত, অশিক্ষিত ও দরিদ্র ভারতবাসীদের পক্ষে পাশ্চাত্য আগ্রাসীদেরকে রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ জানানো সম্ভব ছিল না। তাই তারা ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে, এবং বিদেশি পণ্ডিতদের দ্বারা আবিষ্কৃত প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের মহিমার অহঙ্কারে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করে। তারপর বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক ও তাত্ত্বিক অবদানে হিন্দু ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ জন্মলাভ করে। বিশেষত 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত, 'আনন্দমঠ' প্রভৃতি উপন্যাস, এবং 'কৃষ্ণচরিত্র', 'ভগবদ্গীতা' ও 'ধর্মতত্ত্ব' প্রভৃতি প্রবন্ধ গ্রন্থদেশে হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রেরণা জোগায়। হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের আন্তর্জাতিক তৎপরতা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে ভারতে হিন্দু জাতীয়তাবাদের উন্মেষে বিশেষ সাহায্য করে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন এবং স্বদেশি আন্দোলনের মাধ্যমে যে জঙ্গী জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়, তার মধ্যেও বাসা বেঁধেছিল ধর্মীয় রাজনীতি। অরবিন্দ ঘোষ (পরবর্তী কালে শ্রী অরবিন্দ), বিপিন চন্দ্র পাল এবং বাল গঙ্গাধর তিলকের রাজনৈতিক রচনায় ও কার্যকলাপে এই হিন্দুত্বধর্মী জাতীয়তাবাদী রাজনীতির বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল।

অন্যদিকে ভারতীয় ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও অনিবার্য ভাবেই ধর্মীয় রাজনীতির জন্ম হয়। ১৮৫৭ সালের প্রথম ভারতীয় মুক্তিযুদ্ধের পর থেকেই ইংরেজ সরকার ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতে এবং বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করতে আরম্ভ করে। মুসলমানেরাও আগ্রাসী বিধর্মী বিদেশি শাসকদের সঙ্গে কোনরকম সহযোগিতা করতে অস্বীকার করে এবং তাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শিক্ষাব্যবস্থা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখে। এই সুযোগে উচ্চবর্ণ হিন্দুদের এক অংশ ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠে এবং ইংরেজ সরকারের অধীনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কর্মরত বাবু, ভদ্রলোক ও ব্যবসায়ী মুৎসুদ্দি শ্রেণীতে পরিণত হয়। এই ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে সার সৈয়দ আহমেদ খানের নেতৃত্বে মুসলিম সমাজে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের উদ্দেশ্যে আলিগড় আন্দোলন গড়ে ওঠে। তারপর জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হিন্দু ভদ্রলোকদের ধর্মীয় রাজনীতিতে পরিণত হবার সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম লীগের মাধ্যমে মুসলিম ধর্মীয় রাজনীতির জন্ম হয়। এভাবে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ধর্মীয় রাজনীতিকে ভিত্তি করে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। আর ইংরেজ সরকারও দুই বেড়ালের মধ্যে বানরের পিঠে ভাগ করবার নীতি অনুসরণ করে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে ইন্ধন জোগাতে আরম্ভ করে।

বাল গঙ্গাধর তিলক গণেশ পুজো এবং ভগবদ্গীতার মাধ্যমে মহারাষ্ট্রে যে হিন্দু ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি করেছিলেন, সেই একই নীতি অনুসরণ করে মহাত্মা গান্ধী তুলসী রামায়ণ ও ভগবদ্গীতার সাহায্যে উত্তর ভারতে ধর্মকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে তোলেন। বাল্মীকি রামায়ণের কাহিনী নয়, তুলসীদাসের **রামচরিতমানসের** ভক্তিধর্মই রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধীকে প্রেরণা জুগিয়েছিল। ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতি থেকে হিন্দু সমাজের আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে রামসীতা ও হনুমানকে নিয়ে মধ্যযুগ থেকে উত্তর ভারতে যে ভক্তি আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তাকেই রামরাজ্যের রাজনৈতিক আদর্শ হিসাবে তুলে ধরে রামধুনের ভক্তিগীতির মাধ্যমে মহাত্মা গান্ধী স্বাধীনতা আন্দোলনকে হিন্দু ধর্মীয় জাতীয়তাবাদে রূপান্তরিত করেছিলেন। এভাবে তিনি উত্তর ভারতে হিন্দু কৃষকদের জাতীয় আন্দোলনে টেনে এনেছিলেন। আবার ভগবদ্গীতার কৃষ্ণভক্তি এবং নিষ্কাম কর্মের আপাত দার্শনিক তত্ত্বও তাঁর রাজনৈতিক জীবন ও কর্মকাণ্ডে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। গীতাকে তিনি জননী আখ্যা দিয়েছিলেন, আর স্পষ্ট ঘোষণা করেছিলেন যে গীতায় তিনি নিজ জীবনের তথা জাতীয় জীবনের সব সমস্যার সমাধান খুঁজে পান। তাঁর নিজের এবং তাঁর অনুগামীদের দ্বারা প্রতিটি আশ্রম এবং কর্মক্ষেত্রে গান্ধীজির নির্দেশে শেষ রাত্রে ঘুম থেকে উঠে সবাইকে গীতা পাঠ করতে হত, এবং এক সপ্তাহে একবার সম্পূর্ণ গীতা পাঠ শেষ করতে হত। এভাবে ভগবদ্গীতার ধর্মীয় প্রেরণায় হিন্দু ভদ্রলোকদের এক অংশ গান্ধীজির নেতৃত্বাধীনে জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা আন্দোলনে নেমে পড়েছিল।

বর্তমান কালে গণসংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে গান্ধীজি প্রদর্শিত অহিংস সত্যাগ্রহের সপক্ষে অনেক গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি আছে। একথাও সত্য যে তিনি ব্যক্তিগতভাবে সাম্প্রদায়িকতার

দোষে দুষ্ট ছিলেন না, সর্বধর্ম সমন্বয়ের তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন এবং ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য আমরণ চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। কিন্তু একথাও সমান সত্য যে রামায়ণ, ভগবদ্গীতা, এবং সাধারণভাবে হিন্দু ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের সম্ভাবনা ছিল সুদূরপরাহত। এ কারণেই মহাত্মা গান্ধীর অবিসংবাদী নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন মুসলিম জনসাধারণের গরিষ্ঠ অংশকে কোন প্রেরণা জোগাতে পারেনি। খিলাফত আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর কৌশলী রাজনৈতিক সমর্থন সত্ত্বেও মুসলিম জনসাধারণের অধিকাংশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল স্রোত থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছিল। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের এই হিন্দু ধর্মীয় স্বরূপই শেষ পর্যন্ত ভারত বিভাগের অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এদিকে কংগ্রেসের হিন্দু নেতাদের দ্বারা অবহেলিত ও অপমানিত হয়ে অধার্মিক মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ প্রতিশোধমূলক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে ইসলাম ধর্মকে রাজনীতির প্রধান অস্ত্র হিসাবে বেছে নেন, আর এই তরিকায় মুসলিম লীগকে এবং অশিক্ষিত, দরিদ্র মুসলিম জনসাধারণকে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্তও জিন্নাহ্ ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন না। কিন্তু হিন্দু জাতীয়তাবাদী রাজনীতির মোকাবিলা করতে গিয়ে তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদী মুসলিম রাজনীতির প্রধান প্রবক্তা ও নেতা হয়ে দাঁড়ান। এভাবেই হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ইংরেজ আমলে সাংবিধানিক সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ জোরদার হয়ে ওঠে। আর শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং ভারত বিভাগে পর্যবসিত হয়। একথা অনস্বীকার্য যে অবিভক্ত ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদী মুসলিম রাজনীতির পেছনে ধর্ম ছাড়া আরও অনেক ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক এবং সমাজবৈজ্ঞানিক কারণ বর্তমান ছিল, যেগুলোকে বাদ দিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশের সমকালীন রাজনীতি বোঝা সম্ভব নয়। কিন্তু জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল স্রোতে হিন্দু ধর্মীয় প্রভাব প্রকট হবার ফলে মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদ যে শক্তিশালী হয়েছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির তৃতীয় ফলশ্রুতিরও এখানে উল্লেখ প্রয়োজন, বিশেষত এই কারণে যে ভারতীয় ইতিহাসবিদ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেননি। এই তৃতীয় দিকটি হল হিন্দু ধর্মের অভ্যন্তরে শূদ্রশক্তির নবজাগরণ, অস্তিত্ব বিরহ এবং জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সাধারণ ঔদাসীন্য। মহারাষ্ট্রে জোতিরাও ফুলের নেতৃত্বে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই নবজাগরণ উল্লেখযোগ্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপ নেয়। মহাত্মা ফুলে বেদ, উপনিষদ, মনুস্মৃতি, ভগবদ্গীতা সহ ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু ধর্মের সমস্ত মৌলিক ধর্মগ্রন্থগুলিকে সরাসরি আক্রমণ করেন, চাতুর্বর্ণ্য সহ জাতিভেদ প্রথার সক্রিয় বিরোধিতা করেন, শূদ্র ও অতিশূদ্রদের ধর্মশাস্ত্র নির্দিষ্ট আর্থসামাজিক হীনস্থানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, এবং নারীশিক্ষা ও বিধবা বিবাহের সপক্ষে প্রচার করেন। প্রকৃতপক্ষে জোতিরাও ফুলেই ছিলেন আধুনিক ভারতে শূদ্র জাগরণের প্রথম পথিকৃৎ। বর্তমান শতাব্দীতেও দক্ষিণ ভারতে, বিশেষত তামিলনাড়ুতে পেরিয়ার রামস্বামী নামেকারের নেতৃত্বে ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী শূদ্র আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। পেরিয়ার প্রথম জীবনে গান্ধীজির নেতৃত্বে কংগ্রেস রাজনীতিতে, এমনকি বিখ্যাত বাইকম সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ক্রমশ তাঁর এই অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাস জন্মায় যে কংগ্রেস রাজনীতি প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণহিন্দুদের আধিপত্যে পরিচালিত, এবং এ কারণে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অভ্যন্তরে শূদ্রমুক্তির কোন আশা নেই। তাই তিনি এমনও বলতেন যে এদেশের শূদ্রদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা উচিত। সকলেই জানেন, পেরিয়ারের আন্দোলন ক্রমশ বিচ্ছিন্নতাবাদী রূপ ধারণ করে এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল স্রোত থেকে দূরে সরে যায়।

কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্ম এবং হিন্দু রাজনীতির কবল থেকে শূদ্রমুক্তি আন্দোলনের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেন বাবাসাহেব ডঃ বি. আর. আমবেদকর। ভারতবর্ষের বর্তমান এবং অতীত রাজনীতিকদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে বেশি উচ্চশিক্ষিত। নিজ জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতায় এবং এদেশের শূদ্রশক্তির শৃংখলিত ছীনস্থান ও লাঞ্ছনার বেদনায় তিনিও ব্রাহ্মণ্যবাদভিত্তিক হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল স্রোত থেকে নিজেকে এবং শূদ্রমুক্তি আন্দোলনকে কিছুটা দূরে সরিয়ে রাখেন। এ কারণে অনেক বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ডঃ আমবেদকরের সমালোচনা এবং বিরোধিতা লক্ষ করা যায়। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মীয় স্বরূপই ডঃ আমবেদকরকে দলিত শূদ্র-অতিশূদ্র শ্রেণীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আতঙ্কিত করে তুলেছিল। আর এ অবিশ্বাস ও সন্দেহের অনেক যুক্তিযুক্ত কারণ হিন্দু ধর্ম ও রাজনীতির গভীরে প্রোথিত ছিল এবং আছে। অতএব এ বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই যে বিচ্ছিন্নতাবাদী মুসলিম আন্দোলনের মতোই বিক্ষুব্ধ শূদ্র আন্দোলনও জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা সংগ্রামের হিন্দু ধর্মীয় স্বরূপের প্রতিক্রিয়া হিসাবেই গড়ে উঠেছিল।

স্বাধীনতার পরে ভারতীয় সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসাবে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু সংবিধানে

ধর্মনিরপেক্ষতার কোন সংজ্ঞা অথবা ব্যাখ্যা নেই। অতএব শাসক শ্রেণীর ভাষ্যই সাংবিধানিক ধর্মনিরপেক্ষতার তাত্ত্বিক এবং নৈতিক ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ স্বাধীনতোত্তর এই রাষ্ট্রীয় ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিতে যথেষ্ট ধোঁয়াশা এবং গোঁজামিল ছিল এবং আছে। কারণ প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার সমাজবৈজ্ঞানিক অর্থ ধর্মের প্রতি ব্যক্তিমানুষের এবং রাষ্ট্রের উদাসীনতা, আর ধর্মের পরিবর্তে বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় আসক্তি। কিন্তু এদেশের সরকারি ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিতে সব ধর্মের প্রতি রাষ্ট্রের সমান উৎসাহদান এবং শাসক শ্রেণীর ধর্মান্ধতাই রূপায়িত হয়েছে। এভাবে সব মানুষের নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস প্রবল হলে, এবং রাষ্ট্র তাতে উৎসাহ জোগালে ধর্মান্ধতা এবং ধর্মীয় রাজনীতি অবশ্যম্ভাবী। এহেন ধর্মোৎসাহী ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবক্তারা চতুরভাবে এই তত্ত্ব প্রচার করে থাকে যে ধর্ম ব্যক্তি মানুষের একান্ত প্রাইভেট বিষয়। ব্যক্তিগত জীবনে মানুষের ধর্মনিষ্ঠ হওয়াই উচিত, অন্তত অনুচিত নয়। কিন্তু এই প্রাইভেট ধর্মকে পাবলিক রাজনীতি থেকে আলাদা করে দূরে সরিয়ে রাখা কর্তব্য। তবেই ধর্মনিরপেক্ষতা রূপায়িত হবে। কিন্তু চালাকি দ্বারা মহৎ কর্ম হয় না, আর এই চতুর তত্ত্বের ভিত্তিতেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ধর্মহীন রাজনীতি গড়ে তোলা সম্ভব নয়। কারণ ধর্ম কোন বিমূর্ত অলৌকিক সত্তা নয়। তার মূল মানব সমাজের বিবর্তনশীল আর্থসামাজিক কাঠামোর গভীরে নিহিত আছে, তার স্থূল জাগতিক-প্রাতিষ্ঠানিক রূপ আছে। ধর্ম অন্তরে-বাইরে মানুষের সামগ্রিক জীবন এবং সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবহারকে প্রচ্ছন্নভাবে অধিকার করে ফেলে। ধর্মবিশ্বাসীদের ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত রাজনীতিতে অতএব ধর্মের অনুপ্রবেশ অবশ্যম্ভাবী। ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস এই সাক্ষ্যই বহন করে।

এ প্রসঙ্গে আরও মনে রাখতে হবে যে রাষ্ট্র কোন নৈর্ব্যক্তিক সত্তা নয়। শাসক শ্রেণীর কিছু মানুষই রাষ্ট্রের পরিচালনা করে থাকে। তাদের আচরণই রাষ্ট্রের আচরণ। যে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত ভদ্রলোকেরা স্বাধীনতার পরে এদেশে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেছে, তারা প্রায় সকলেই ধর্মবিশ্বাসী এবং ধর্মাচারী। তারা যাগযজ্ঞ, পুজোপার্বণ, মন্তরতন্তর, গঙ্গাস্নান, তীর্থদর্শন, মস্তকমুণ্ডন প্রভৃতি অসংখ্য ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে অভ্যস্ত। এদের বেশির ভাগই কোন না কোন গুরু-বাবার চেলা, যাদের নিয়মিত দর্শন করে এরা কুর্সিরক্ষা ও উন্নতির জন্য পরামর্শ নেয়, এবং সম্ভবত সে পরামর্শ মতোই সরকারি কাজ পরিচালনা করে। একজন সিনিয়র প্রাক্তন ক্যাবিনেট মন্ত্রী এবং অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দ ভারত সাধু সমাজের সভাপতি ছিলেন। আরেকজন প্রাক্তন সিনিয়র কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট মন্ত্রী করণ সিং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সভাপতি ছিলেন। এক জওহরলাল নেহরু ছাড়া বাকি সব হিন্দু কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা প্রত্যেকেই কমবেশি একই পথের পথিক ছিলেন এবং আছেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাও জনৈক ধর্মগুরুর শিষ্য, যাগযজ্ঞ-পুজোপার্বণে অভ্যস্ত, আর হিন্দুধর্মের প্রধান প্রধান ধর্মগুরুদের সন্দর্শনে এবং আশীর্বাদ ও পরামর্শ প্রার্থনায় উৎসাহী। মুখ্য নির্বাচন কমিশনর টি.এন. শেষণ সম্প্রতি প্রায় এক লক্ষ টাকা দিয়ে একটি প্রাইভেট বিমান ভাড়া করে মৃত কাঞ্চীর শংকরাচার্যকে সমাহিত করবার অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন। এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ বলা বাতুলতা মাত্র।

আধুনিক কালে যেসব দেশে রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব কমে এসেছে, সেখানে প্রকৃতপক্ষে প্রথমে শিল্পায়ন, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি এবং ব্যাপক গণশিক্ষার মাধ্যমে ধর্ম সম্বন্ধে মানুষের মনে কিছুটা বৈরাগ্য এসেছে। যদিও ইউরোপের অনেক দেশেই ধর্মীয় নামযুক্ত রাজনৈতিক দল এখনও অনেক আছে, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও White Anglo--Saxon Protestantism (WASP) অথবা শ্বেতচর্ম অ্যাংলো-স্যাক্সন প্রজাতির প্রোটেস্টান্ট ধর্মই রাষ্ট্রে ও রাজনীতিতে আধিপত্য করে। কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে বিজ্ঞানের অগ্রগতি, জনশিক্ষার প্রসার এবং শিল্পায়নের পর থেকে সেখানে রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব অনেক কমে এসেছে, কারণ ব্যক্তির জীবনেও ধর্মের প্রভাব কমে গেছে। বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে অবশ্য অনেক বিকার লক্ষ করা যাচ্ছে। সেখানে এখন ধনপূজা, আণবিক শস্ত্রপূজা এবং যোনিপূজা ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত জীবনের আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ধর্মে উদাসীনতার সঙ্গে সঙ্গে এসব নৈতিক এবং আদর্শগত বিকারও বর্জনীয়। প্রকৃতপক্ষে ধনতন্ত্র, সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানাভিত্তিক বলগাহীন ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ, এবং সাম্রাজ্যবাদের অভ্যন্তরে ধর্মের ক্ষয় হয়েছে বলেই পাশ্চাত্য সমাজে এসব বিকার দেখা দিয়েছে। ধর্মের প্রতি উদাসীনতা বৃদ্ধির সঙ্গে নৈতিক বা আদর্শগত বিকারের কোন অনিবার্য কার্যকারণ সম্বন্ধ নেই। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে প্রবল ধর্মবিশ্বাসের যুগে পাশ্চাত্য সমাজ ও সভ্যতা ছিল বর্তমান কালের চেয়ে অনেক বেশি নীতিহীন, আদর্শহীন এবং গুরুতর অসাম্য ও স্বৈরাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত।

আমাদের দেশে একদিকে আছে ধর্মীয় রাজনীতির অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা, আর অন্যদিকে অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, মধ্যযুগীয় ভূমিব্যবস্থা, শিল্পায়নের মন্থরতা, অশিক্ষার অন্ধকার, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অনুন্নত অবস্থা, আর ক্রমবর্ধমান বেকারি। সমাজতন্ত্রের সাংবিধানিক আদর্শও আশির দশক থেকেই বর্জিত হয়েছে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক আত্মনির্ভরতা ও স্বকীয়তার আদর্শে জলাঞ্জলি দিয়ে দেশ প্রত্যক্ষভাবে নয়া সাম্রাজ্যবাদী বিদেশি শক্তি এবং ধনতান্ত্রিক আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় আদর্শের এই সার্বিক অবক্ষয়, গতিশীলতার

সামগ্রিক অভাব, সর্বব্যাপী দুর্নীতি, দারিদ্র্য, অশিক্ষা এবং বেকারির মধ্যে অবশ্যম্ভাবী রূপেই জন্ম নিয়েছে মৌলবাদী ধর্মীয় রাজনীতি। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ই মৌলবাদী রাজনীতির জন্মভূমি।

একথা মনে করলে ভুল হবে যে এদেশে মৌলবাদী রাজনীতির ব্যাপক সাম্প্রতিক অভ্যুত্থানের জন্য শুধুমাত্র প্রত্যক্ষভাবে হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক দল এবং শক্তিগুলিই দায়ী। এ ব্যাপারে ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী তথাকথিত অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল ও শক্তিগুলির ভূমিকাও কম নয়। রাতের অন্ধকারে অযোধ্যায় বাবরি মসজিদে রামলালার মূর্তি স্থাপন পঁয়তাল্লিশ বছর আগে দুষ্কৃতীরা করে থাকতে পারে কিন্তু সাম্প্রতিক কালে সেই মসজিদের দরজা খুলে সেখানে নিয়মিত রামলালার দর্শন ও পুজোর ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে কেন্দ্রীয় সরকারে অধিষ্ঠিত তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ দলই করেছে। ১৯৮৮ সালে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি সহ বাবরি মসজিদের খুব কাছে রামমন্দিরের শিলান্যাস করেনি ভারতীয় জনতা পার্টি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ অথবা শিবসেনা। করেছিলেন কংগ্রেস সভাপতি এবং প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী। তারপর সরকারি দূরদর্শনে দীর্ঘকাল ধরে অনৈতিহাসিক ও ভক্তিবাদী রামায়ণ ও মহাভারতের বিকৃত অবতার কাহিনী প্রচার করে গণমানসে ধর্মান্ধতা এবং মৌলবাদী রাজনীতির ইন্ধন জুগিয়েছে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার। ধর্মান্ধ ও প্রকাশ্যভাবে মৌলবাদী যে রাজনৈতিক শক্তিগুলি এতকাল ভারতীয় রাজনীতির প্রান্তসীমায় অবস্থিত ছিল, এই পরিস্থিতিতে তারা সুযোগ বুঝে ধর্মীয় রাজনীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রশক্তি অধিকারের ফন্দিতে বেপরোয়া তাণ্ডবে মেতে ওঠে। ধর্মাসুরের রথযাত্রা, হিন্দী বলয়ে কপিসেনার রাজনৈতিক অভিযান, এবং শেষ পর্যন্ত অসুর বাহিনীর বর্বর উল্লাসে অযোধ্যার বাবরি মসজিদ ধ্বংস এই ধর্মীয় রাজনীতিরই অনিবার্য পরিণাম। কিন্তু এখানেও মনে রাখা দরকার যে বাস্তবে বাবরি মসজিদ রক্ষায় ব্যর্থতার জন্য প্রত্যক্ষ ভাবে নরসিংহ রাও পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারই দায়ী, যে নরসিংহ রাও অবশ্যই সনাতন হিন্দুধর্মে গভীরভাবে আসক্ত।

অর্থাৎ যে হিন্দু ধর্মীয় রাজনীতি স্বাধীনতা আন্দোলনের গোড়া থেকেই এদেশে প্রভাব বিস্তার করেছিল, সে ধর্মীয় রাজনীতিই আজ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে সুবিশাল বিষবৃক্ষে পরিণত হয়েছে। প্রত্যক্ষভাবে হিন্দুত্ব ও রামরাজ্যবাদী দলগুলি সাম্প্রতিক মৌলবাদী রাজনীতিতে অগ্রণী ভূমিকা অবলম্বন করলেও এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে এদেশে হিন্দু ধর্মীয় রাজনীতির শেকড় ইতিহাস ও সমাজ-ব্যবস্থার অনেক গভীরে প্রোথিত আছে।

এ প্রসঙ্গে অনেকেই এদেশের মুসলমানদের ধর্মান্ধতা ও মৌলবাদী রাজনীতির কথা টেনে আনেন। ঐতিহাসিক সত্য এই যে সব ধর্মের প্রথম যুগের মতোই ইসলামের সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে প্রথম থেকেই ধর্ম ও রাজনীতি অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে ছিল। কোরান শরিফ এবং হাদিস শরিফেও ধর্ম ও রাজনীতিকে পৃথক করা হয়নি। মধ্যযুগের পর থেকে ইসলাম ধর্মে কোন বিজ্ঞানভিত্তিক অথবা বৌদ্ধিক নবজাগরণ হয়নি। আধুনিক পৃথিবীর জ্ঞান ভাণ্ডার, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে সমন্বয় রেখে কোন ব্যাপক ধর্মসংস্কারও হয়নি। কামাল পাশার তুরস্কে, নাসেরের মিশরে, সুকার্নোর ইন্দোনেশিয়ায়, মুজিবের বাংলাদেশ এবং সাদ্দাম হোসেনের ইরাকের রাজনীতিতে ধর্মান্ধতার কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম লক্ষ করা গেছে। কিন্তু সৌদি আরব, ইরান ও পাকিস্তান সহ অনেক ইসলামপ্রধান দেশে বর্তমান রাজনীতি ধর্মের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে সামগ্রিকভাবে আন্তর্জাতিক মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির এটি একটি বড় দুর্বলতা। তাছাড়া ধর্ম সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র রাজনৈতিক কিংবা অন্য ধরনের সমালোচনা অনেক ক্ষেত্রেই ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজপতিরা সহ্য করতে অপারগ। অথচ এই অসহিষ্ণুতার মধ্যেও কিছুটা সুবিধাবাদের ছাপ স্পষ্ট। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোনও কোনও মুসলিম লেখক পরোক্ষভাবে সাহিত্যিক তরিকায়, আর বিদ্রোহী নারী তসলিমা নাসরিন সরাসরি অসীম সাহসিকতায় ইসলামের যেটুকু সমালোচনা করেছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি কঠোর এবং তীব্র ইসলামের এবং হজরত মহম্মদের সমালোচনা আছে এডওয়ার্ড গিবনের বিশ্ববিখ্যাত *Decline and Fall of the Roman Empire* গ্রন্থে, অথবা এইচ. জি. ওয়েলসের *Outline of History* গ্রন্থে। কিন্তু এই দুই গ্রন্থ, এবং পাশ্চাত্য দেশে প্রকাশিত এ ধরনের অন্য আরও অনেক ইসলাম বিরোধী গ্রন্থ নিয়ে ইসলামপ্রধান দেশগুলিতে কোন রাষ্ট্রীয় উত্তেজনা বা সামাজিক বিক্ষোভ দেখা যায় না। কারণ সে কাজ অনেক বেশি কঠিন। এই পরিস্থিতির প্রধান কারণ এই যে অধিকাংশ ইসলামপ্রধান দেশে সামাজিক সাম্য উল্লেখযোগ্য ভাবে বর্তমান থাকলেও অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অসাম্য অত্যন্ত প্রকট। সেসব দেশে এখনও প্রধানত রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, এবং রাজনৈতিক স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠিত আছে। আর দরিদ্র ও অশিক্ষিত জনসাধারণের ধর্মান্ধতাকে শক্তিশালী করে শাসক শ্রেণী নিজেদের শোষণ-শাসনকে চিরায়ত করবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে শাসক শ্রেণী দ্বারা ধর্ম উৎসাহিত এবং ব্যবহৃত হচ্ছে।

কিন্তু ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের রাজনীতি প্রসঙ্গে একথা মনে রাখা দরকার যে ধর্ম ও সংস্কৃতির দিক থেকে যারা সংখ্যালঘু, তারা সব দেশেই ধর্মীয় একতার মধ্যে সুরক্ষার সন্ধান করে এসেছে। এদেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে হিন্দু ধর্মের ব্যাপক প্রভাবের ফলে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের ধর্মের মাধ্যমে সুরক্ষার চেষ্টা অনিবার্যভাবেই শক্তিশালী হয়েছে। একথাও জোর

দিয়ে বলা প্রয়োজন যে ভারতবর্ষের অধিকাংশ মুসলমানই ধর্মীয় রাজনীতির পক্ষপাতী, এ ধারণা কট্টরপন্থী হিন্দুদের বিদ্বেষভাবপ্রসূত কল্পনা মাত্র। ইসলাম ধর্মাবলম্বী জনসাধারণের এক বিরাট অংশ রাজনীতিতে ধর্মহীন কৃষক-শ্রমিক আন্দোলনের শরিক। বিভিন্ন নির্বাচনের ফলাফলও মুসলমানদের মধ্যে মূলত ধর্মীয় রাজনীতির সাক্ষ্য দেয় না। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি প্রত্যক্ষ সত্য যে বর্তমান ভারতীয় রাজনীতিতে মুসলিম মৌলবাদের চেয়ে হিন্দু মৌলবাদের দাপট অনেক বেশি। আর ধর্মীয় সংখ্যাগুরুদের মৌলবাদী রাজনীতি যে কোন দেশেই ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মৌলবাদী রাজনীতির চেয়ে সামগ্রিকভাবে অনেক বেশি ভয়াবহ ও মারাত্মক।

একথা অনস্বীকার্য যে ভারতে যে ধরনের গণতন্ত্র প্রচলিত আছে, তাতে বেশির ভাগ রাজনৈতিক দলই নির্বাচনে জয়লাভের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীর আনুগত্য এবং সমর্থন লাভের চেষ্টা করে, আর সে মতলবে বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীদের মধ্যে বিভেদ বাঁচিয়ে রেখে কৌশলে নিজেদের ভোট ব্যাংক বাড়াবার চেষ্টা করে। ইন্দিরা গান্ধী যখন যত্রতত্র মন্দিরে মন্দিরে পুজো দিতে আর গুরু-বাবা-সাধু সন্দর্শনে যেতেন, অথবা যখন একজন তথাকথিত ব্রহ্মচারীকে তার রাজনৈতিক আশ্রয়ে নিজ শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে দিয়েছিলেন, তখন সম্ভবত তিনি ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস থেকে এসব করেননি। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের রাজনৈতিক সমর্থন এবং আনুগত্য লাভের মতলবে নিজ ধর্মীয় ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবার জন্যই করেছেন। রাজীব গান্ধী যখন 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দিয়ে অযোধ্যায় রামমন্দিরের শিলান্যাস করেন, তখন তিনিও একমাত্র ভোটের উম্মিদেই এভাবে হিন্দু মৌলবাদকে উৎসাহিত করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাওও অংশত একারণেই বাবরি মসজিদ ধ্বংসের আগে উপযুক্ত সরকারি প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেননি। সরাসরি হিন্দুত্ববাদী যেসব রাজনৈতিক দল রামায়ণের কল্পকাহিনীকে আশ্রয় করে হিন্দি বলয়ে ধর্মান্ধ হিন্দুদের দলে টেনেছে, আর আদিম বর্বরতায় ধ্বংস করেছে বাবরি মসজিদ, সেসব দলও ধর্মকে রাষ্ট্রশক্তি দখলের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবেই ব্যবহার করেছে। আবার অনেক ক্ষেত্রেই তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ সরকারি দল ধর্মান্ধ মুসলমানদের রাজনৈতিক সমর্থন ও ভোটের আশায় মুসলিম মৌলবাদকে সমর্থন জানিয়েছে এবং মুসলিম ব্যক্তিগত আইনকে মানবতামুখী করবার পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। শাহবানু মামলায় সুপ্রিম কোর্টের মানবিক রায়ের পরে নারীর উপর পুরুষের অন্যায় অধিকারকে বাঁচিয়ে রাখতে শাসক দলের উদ্যোগে সংবিধান সংশোধন এই রাজনৈতিক অভিসন্ধির উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। এমনকি অনুসূচিত জাতি-উপজাতিদের প্রকৃত মুক্তির চেয়ে তাদের ভোট ব্যাংক হিসাবে ব্যবহার করবার প্রবণতাই বেশি লক্ষ করা যায়। আর এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে শূদ্র-অতিশূদ্র শ্রেণীর আর্থসামাজিক হীনস্থান হিন্দুধর্মের অবিচ্ছেদ্য আঙ্গিক। এখানেও ধর্মের নৃশংসতাকে আঘাত না করে তাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করবার জন্য ইস্তেমালের প্রবণতাই বেশি।

বৃহত্তর জাতীয় জীবনে ধর্মকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের এই রীতি স্থানীয়ভাবে ক্ষুদ্র আকারেও সারা দেশেই দেখতে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ কলকাতা শহরে পাড়ায় পাড়ায় যত ক্লাব আছে, তারাই দুর্গাপুজো-কালীপুজো সহ বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রধান সংঘবদ্ধ উদ্যোক্তা। আর অধিকাংশ রাজনৈতিক দলই এসব ক্লাব এবং তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা এবং সক্রিয় সমর্থন করে থাকে। দলীয় নেতারা এসব ক্লাবের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থেকে সর্বত্র দুর্গাপুজো, কালীপুজো প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদ্বোধন করে, এবং জনসাধারণের উপর প্রচণ্ড অত্যাচার চালিয়ে যেভাবে এসব ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পাণ্ডারা জোর করে চাঁদা আদায় করে তারও সরব অথবা নীরব সমর্থন করে থাকে। কারণ নির্বাচনের সময় আবার ক্লাবে ক্লাবে বারোয়ারি পুজোর পেশিবহুল ভক্তজনেরাই মাথাপিছু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে রাজনৈতিক দলের 'স্বেচ্ছাসেবক' এবং অ্যাকশন স্কোয়াডে রূপান্তরিত হয়। যেসব বামপন্থী রাজনৈতিক দল আদর্শগত কারণে এসব বারো মাসে তেরো পার্বণের উদ্বোধন অনুষ্ঠান প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করে না, তারাও কিন্তু রাজনৈতিক সমর্থন এবং ভোট হারাবার ভয়ে সরাসরি এই ব্যাপক অপসংস্কৃতি ও গণপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে অপরাগ। তেমনই ভারতের অন্যত্র রামসীতা পুজো, হনুমান পুজো, গণেশ পুজো সহ অগণিত দেবদেবীর পুজো-আরাধনায় বেশির ভাগ রাজনৈতিক দলের প্রধান প্রধান নেতারা প্রায়শই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। এভাবে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার রাজনীতিক পয়গম্বরেরা নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বেশরম ভাবে ধর্মকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে ধর্মীয় রাজনীতির প্রাবল্যের জন্য শুধুমাত্র বিভিন্ন ধর্ম ও ধর্মগোষ্ঠীকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার কমাতে হলে বর্তমানে প্রচলিত রাজনীতিরও ব্যাপক পরিবর্তন ও পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন। বর্তমান কালের দলীয় রাজনীতির ব্যবস্থায় বহুসংখ্যক মানুষের উপর ব্যক্তিগত প্রভুত্ব অর্জন, চোরাপথে হঠাৎ বড়লোক হওয়া, আর অনেক ধরনের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করাই বেশির ভাগ রাজনীতিকের মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য অর্থবল ও বাহুবলের সাহায্যে নির্বাচন জয়ই বর্তমানে প্রচলিত গণতন্ত্রের আসল পরিচয়। একদিকে বৃহৎ পুঁজিপতি, বৃহৎ ভূস্বামী, ফাটকাবাজারের এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের অসংখ্য দালাল, সমাজবিরোধী মাফিয়া চক্র, মদ্য ব্যবসায়ী, চোরাচালানকারী, বিল্ডিং প্রমোটার, সাট্টা ডন ও তাদের বিশাল মাস্তান বাহিনী এবং বেশ্যাপল্লীর দালালেরা নিজেদের বিত্তবল

ও বাহুবলে বারোমাস রাজনৈতিক দলগুলির এবং তাদের নেতাদের দেখভাল করে। আর ভোটের সময় তারাই 'স্বেচ্ছাসেবক' বাহিনী সাপ্লাই করে। আবার এই অসুর বাহিনীই মওকা বুঝে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার বিষে রাজনীতিকে বিষিয়ে তোলে। বর্তমান নির্বাচন ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ শূদ্রশ্রেণীর উপর সংখ্যালঘু আর্যশ্রেণীর প্রভুত্ব চিরায়ত হয়ে থাকে, আর এই প্রভুত্ব ও শোষণ-শাসনকে চিরস্থায়ী করতে আর্য শাসক শ্রেণী নির্লজ্জভাবে নানা কৌশলে ধর্মকে ব্যবহার করে।

অতএব রাজনীতিকে ধর্ম থেকে মুক্ত করতে হলে বর্তমানে প্রচলিত গণতন্ত্র ও নির্বাচন ব্যবস্থার পরিবর্তে এমন নতুন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রয়োজন যেখানে অসুর শক্তির বিত্তবল এবং বাহুবল ছাড়াই জনসাধারণের গরিষ্ঠ অংশ সক্রিয়ভাবে রাষ্ট্রশক্তির পরিচালনায় অংশ নিতে পারবে। আমাদের মতে প্রাপ্তবয়স্ক জনসাধারণের মধ্য থেকে কম্পিউটারের সাহায্যে র‍্যানডম্ স্যাম্পলিং পদ্ধতিতে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনই এই লক্ষ্যে পৌঁছবার একমাত্র সঠিক পথ। এই পদ্ধতি প্রয়োগ করলে জনসাধারণের প্রকৃত প্রতিনিধিরাই রাষ্ট্র পরিচালনায় সামিল হতে পারবে। আর একই সঙ্গে গণতন্ত্র থেকে বিত্তবান, বাহুবল, ধর্ম, সাম্প্রদায়িকতা, জাতপাত প্রভৃতির আসুরিক প্রভাব বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয় (এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত প্রস্তাবনার জন্য দেখুন, জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়, "Democracy without Politics", *The Statesman Festival Number*, 1993)।

কিন্তু একথাও ভুললে চলবে না যে মানব সমাজের মধ্যে আদিম ধর্মবিশ্বাস এবং বিজ্ঞান ও মানবতা বিরোধী ধর্মান্ধতা বর্তমান আছে বলেই অধিকাংশ রাজনৈতিক দল এবং তাদের পেছনে অশুভ শক্তিগুলি ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহার করবার সুযোগ পাচ্ছে। অতএব শেষ পর্যন্ত মানুষের ধর্মবিশ্বাস শিথিল না হলে রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব অথবা ধর্মে রাজনীতির প্রভাব ক্ষীণ হবার আশা কম। বর্তমানে প্রচলিত গণতন্ত্রের মৌলিক রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মান্ধতার অবসান এবং ধর্মবিশ্বাসের শিথিলতাও তাই অবশ্য প্রয়োজন। নতুবা রাজনীতিতে ধর্মের আসুরিক প্রয়োগ রোধ করা সম্ভব হবে না।

প্রধানত প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশে নিরাপত্তার অভাববশতই মানুষের ধর্মের প্রয়োজন হয়। শৈশবে মানুষ সামগ্রিক অনিরাপত্তা হেতু নিজ সুরক্ষার জন্য মা-বাবার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল থাকে। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ যখন তার সামিজিক পরিবেশে (কখনও বা প্রাকৃতিক পরিবেশে) নিরাপত্তার অভাব অনুভব করে, তখন বৃদ্ধ অথবা মৃত মা-বাবা তাকে সুরক্ষা দিতে পারে না। তাই সে শৈশবে গঠিত মানসিকতা অনুযায়ী মা-বাবার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন সর্বশক্তিমান বিশ্বপিতা কিংবা বিশ্বমাতার সন্ধান করে আর হাতের কাছে পাওয়া গুরু-বাবা-পীরদের 'অলৌকিক' শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে। ধূর্তভণ্ড ধর্মবণিকেরা মানুষের এই স্বাভাবিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এমন এক সর্বশক্তিমান বিচারক ঈশ্বরের চরিত্র সৃষ্টি করে, যিনি মোল্লা-পুরোহিতদের কথা না শুনলে সব মানুষকে ভয়ানক নরকে নিক্ষেপ করেন। তাছাড়া এই ধর্মব্যবসায়ীরা আত্মা, পরজন্ম, স্বর্গনরকের আশা-আতঙ্ক প্রভৃতি সৃষ্টি করে, তাদের রচিত ধর্মশাস্ত্রের মাধ্যমে অসংখ্য সামাজিক বিধান জনসাধারণের উপরে চাপিয়ে দিয়ে, আর পুজোপার্বণ, প্রার্থনা-উপাসনা, মন্তরতন্তর, দানদক্ষিণার মাধ্যমে আমজনতার পিঠে চেপে বসে। ধর্মবণিকদের দ্বারা চিত্রিত ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন কল্পিত রূপ-অরূপ এবং ধর্মীয় সামাজিক বিধানগুলি পৃথিবীর প্রায় সব মানুষই জন্মগতভাবে পরিবারের মধ্য থেকে আপন করে নিতে বাধ্য হয়, বয়ঃপ্রাপ্ত হবার পর নিজ বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে বেছে নিতে পারে না। অথচ এহেন ধর্ম নিয়েই দেশে দেশে অবিরত সংঘাত ও মৌলবাদী রাজনীতি চলছে। যেহেতু পৃথিবীর কোন দেশেই আজ পর্যন্ত এমন কোন সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি যেখানে মানুষের সামগ্রিক নিরাপত্তা বোধ জন্মাতে পারে, অতএব অদূর ভবিষ্যত কোন দেশেই মানুষের ধর্মবিশ্বাস একেবারে চলে যাবার সম্ভবনা নেই। কিন্তু ধীরে ধীরে ধর্মবিশ্বাসের অন্ধত্ব কমিয়ে তাকে মানবতামুখী করা অসম্ভব নয়।

দ্রুত শিল্পায়ন ও সামগ্রিক আর্থিক বিকাশ, সর্বজনীন শিক্ষা এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও ক্রমবর্ধমান বিজ্ঞানমনস্কতা মানুষকে ক্রমশ পুজো-উপাসনা, মন্তরতন্তর থেকে বিজ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট করবে। তখন মানুষ পরলোকের চেয়ে পৃথিবীকে, ধর্মের চেয়ে বিজ্ঞানকে বেশি ভালোবাসতে শিখবে। মানুষ বুঝবে যে মহাবিশ্বের পেছনে যদি কোন অকল্পনীয় শক্তি প্রচ্ছন্ন থাকে, তবে তাকেও একদিন বিজ্ঞানের সাহায্যেই জানা যাবে, ধর্মের সাহায্যে নয়। কিন্তু বহুকাল পর্যন্ত পৃথিবীর অনেক মানুষের মনে ধর্মবিশ্বাস কমবেশি জেগেই থাকবে। এ বেআব্রু সত্যকে অস্বীকার করে দৃশ্য ভবিষ্যতে কোন নতুন সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে না। অতএব প্রশ্ন ওঠে, যতদিন পর্যন্ত একদিকে বিজ্ঞানভিত্তিক গণশিক্ষা এবং অন্যদিকে সুরক্ষিত জীবনের আশ্বাস থেকে মানুষের ধর্মবিশ্বাস একেবারে মিলিয়ে যাচ্ছে না, ততদিন ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্ক কিভাবে পুনর্বিন্যাস করা সম্ভব? অনাভাবে প্রশ্ন করা যায় যে ততদিন ধর্মকে কি এমন কোন মানবিক রূপ দেওয়া সম্ভব যাতে সে প্লেটো-কৌটিল্য দ্বারা নির্দেশিত এবং বর্তমানে প্রচলিত পথে শাসক শ্রেণীর শোষণ-শাসনের হাতিয়ার না হয়ে আর্থসামাজিক পিরামিডের বিস্তীর্ণ মূলদেশে অবস্থিত আমজনতার মুক্তিসংগ্রামের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়াতে পারে?

এ ধরনের কিছু উদাহরণ খ্রিস্টধর্মের ইতিহাসে আছে। ত্রয়োদশ শতাব্দিতে অ্যাসিসির সেন্ট ফ্রানসিস খ্রিস্টধর্মের নামে অহিংস শস্থায় দরিদ্রদের সংগঠিত করার চেষ্টা করেন। চতুর্দশ শতাব্দীতে ইংলন্ডে পাদ্রী জন বল আদম ও ইভের যুগে মানব সমাজে প্রচলিত আদিম সাম্যের আদর্শের উল্লেখ করে খ্রিস্টধর্মের প্রেরণায় ওয়াট টাইলারের নেতৃত্বে সংগঠিত কৃষক বিদ্রোহকে উদ্দীপিত করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে জার্মানীতে টমাস মুনৎসার বিশুদ্ধ খ্রিস্টধর্মের সাম্যের আদর্শ তুলে ধরে কৃষক বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলন্ডের লেভেলার (Leveller) এবং ডিগার (Digger) আন্দোলনে খ্রিস্টধর্মীয় সাম্যের আদর্শ তুলে ধরা হয়, বিশেষত গেরারড উইনস্ট্যানলি পরিচালিত ডিগার বা জবরদখল জমিতে চাষের আন্দোলনে। এই ট্র্যাডিশনকে পাথেয় করে বিগত দুতিন দশকে প্রধানত লাতিন আমেরিকায় তথাকথিত লিবারেশন থিওলজি (Liberation Theology) বা মুক্তির ধর্মতত্ত্ব গড়ে উঠেছে। এমনকি পোপের নেতৃত্বে রোমান ক্যাথলিক চার্চও এই চিন্তাধারাকে সমর্থন জানিয়েছে। যেখানে অসাম্য-অবিচার-অত্যাচার ব্যাপক ও চরম রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, সেখানে ধর্মে নিহিত সাম্য ও মুক্তির আদর্শকে সামনে তুলে ধরে বিদ্রোহী-বিপ্লবী রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা ধার্মিক মানুষের অবশ্য কর্তব্য এবং ধর্মীয় আদর্শ, এই হল লিবারেশন থিওলজির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

খ্রিস্টধর্মের অভ্যন্তরে ধর্মীয় প্রেরণায় সংগঠিত বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনগুলি অবশ্য দেশকালের নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে বিশেষ রূপ ও রসে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সেসব ঐতিহাসিক আন্দোলনের হুবহু অনুকরণ করা বর্তমান কালে সম্ভবও নয়, বাঞ্ছিতও নয়, বিশেষত অন্য ধর্মাবলম্বীদের পক্ষে। তাছাড়া বর্তমানে খ্রিস্টধর্ম প্রভাবিত দেশগুলিতে প্রচলিত রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক কাঠামো সাম্য ও মুক্তির অনুকূল কিনা সে বিষয়েও গভীর সন্দেহ আছে। বর্তমান লেখক সহ অনেকেই এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন। কিন্তু বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজ ও সভ্যতার পরিবর্তনে মানবিক অবয়বে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার বিষয়ে লিবারেশন থিওলজির মূল বক্তব্য অগ্রাহ্য করা যায় না। হিন্দুধর্ম ছাড়া আর প্রায় সব ধর্মেই তাত্ত্বিক স্তরে সাম্যের আদর্শ বর্তমান আছে। হিন্দুধর্মেও অদ্বৈতবাদকে সাম্যের আদর্শের সপক্ষে ব্যবহার করা অসম্ভব নয়। সব ধর্মেই মুক্তির সংজ্ঞা যদিও মূলত পারলৌকিক, তথাপি ইউরোপে রিফরমেশনের পর থেকে খ্রিস্টধর্ম যেমন মূলত জাগতিক উন্নতিতে মনোনিবেশ করেছিল, তেমনই অন্য ধর্মকেও জাগতিক মানব মুক্তির তত্ত্বের উৎস হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, যদিও রিফরমেশনের পরবর্তী পুঁজিবাদী-ভোগবাদী-সাম্রাজ্যবাদী আদর্শের অনুকরণ বর্জনীয়।

মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে অগণতান্ত্রিক জবরদস্তির মাধ্যমে সরাসরি আঘাত না করে সে বিশ্বাসের মধ্য থেকে যদি সাম্য ও মুক্তির আদর্শের নির্যাস বের করে আনা যায়, আর ধর্মের নামে সে বিশ্বাসকে দলিত-শোষিত শূদ্র মানুষের মুক্তির রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে বিদ্রোহে প্রতিরোধে বিপ্লবে ব্যবহার করা যায়, তবে বাস্তবতার দৃষ্টিকোণ থেকে তাতে আপত্তি করবার বিশেষ কারণ থাকতে পারে না। হয়ত বা এ পথেই একদিন ধর্ম ও রাজনীতি উভয়েরই এমন রূপান্তর ঘটবে যে আজকের ধর্ম আর আজকের রাজনীতিকে সেদিন আর চেনাই যাবে না। অতএব মানব সমাজের ক্রান্তিকারী রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তনে যারা বিশ্বাসী এবং প্রয়াসী, তাদের পক্ষে এ পথে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো অবশ্যই যুক্তিসম্মত। কিন্তু একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে শেষ পর্যন্ত ব্যাপক বিজ্ঞানমুখী গণশিক্ষা ও গণচেতনাই মানব সমাজের মুক্তির পথ। সে মুক্তির লক্ষ্যে ধর্মের রূপান্তরে বর্তমানের বাস্তব কৌশল হিসাবে আর সব আঙ্গিক-উপকরণ থেকে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করে সাম্য-মুক্তির আদর্শ রূপে রাজনীতিতে প্রয়োগের চেষ্টা মানব মুক্তির প্রতিকূল নয়।

বর্তমানে প্রচলিত ধর্ম ও রাজনীতি দুইই মানব সভ্যতার অগ্রগতি ও মানব মুক্তির পরিপন্থী। একমাত্র এ নিবন্ধে আলোচিত পথে ধর্ম ও রাজনীতি উভয়ের মৌলিক রূপান্তরের মাধ্যমেই সাম্য মুক্তি রূপ নিকষিত মানব ধর্ম সামগ্রিক মানব মুক্তি রূপ রাজনীতির হাতিয়ারে পরিণত হতে পারে। এ ধর্ম কিন্তু সে ধর্ম নয়, আর এ রাজনীতিও সে রাজনীতি নয়। বর্তমান রূপে ধর্ম ও রাজনীতি উভয়ই বর্জনীয়। একথাও জোর দিয়ে বলা প্রয়োজন যে ধর্মীয়-সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সমাধান ভাববাদী তত্ত্বকথা, ঈদ কিংবা বিজয়া দশমীতে ভাববাদী তাকাল্লুফ, অথবা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রচারের মাধ্যমে সম্ভব নয়। এসব প্রতীকি আচরণে রাজনীতি ও বুদ্ধিজীবীদের ভাবমূর্তি হয়ত বা উজ্জ্বল হতে পারে, কিন্তু ধর্মীয় রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িকতার অবসান হতে পারে না। একমাত্র ধর্ম ও রাজনীতির মৌলিক রূপান্তরের মাধ্যমেই ধর্মীয় রাজনীতির বিলোপ সম্ভব। আর তার জন্য প্রয়োজন একাধারে রাজনৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক পুনর্বিন্যাস ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব।

আকাশ কাঁদে, নদীটি নির্জন

মহাদেব সাহা

দুপুর যেন তন্দ্রাহত বন
শান্ত নদী, একাকী নির্জন ;
আকাশ বলে মেঘের উপাখ্যান
দু'চোখ বুজে দেখার নামই ধ্যান।
আমি বৃথাই জলের দিকে চাই
হৃদয়ে চড়া, সৌতাও কাছে নাই
দেখি কেবল দগ্ধ খাঁখাঁ বালি —
ছায়ারা দেয় শূন্যে হাততালি ;
জীবন জুড়ে দুঃখ লেখে নাম
শূন্যতাই কি সবার পরিণাম !
ভালোবেসে যেদিকে হাত বাড়াই
ধরার মতো কোথাও কিছু নাই,
দেখি শুধু পাহাড় ভেঙে পড়ে
কেন নবীন পাতারাও যে ঝরে,
দুপুর যেন মর্মাহত বন
আকাশ কাঁদে, নদীটি নির্জন।

আবিল

হরপ্রসাদ মিত্র

টান্‌টান উৎসাহের পাল তুলে
দরিয়া পেরুচ্ছে না কেউই।

প্রচণ্ড রোদ্দুরে কিংবা
অবর্ষণ পুঞ্জমেঘতলে
বদ্ধ ঘরে অন্তরীণ
দিন যায়, অগণন দিন।

তক্তাপোষে শয়ান শরীরে
শুশুকের মতন ওল্টানো
জেগে জেগে।

পিচ্ছিল শরীরে
ঘর্মাক্ত চামড়ার আঠা।
রাষ্ট্রের পরোয়া নেই তাতে।
গঙ্গায় পদ্মায় জলাভাব।
অন্তর্ঘাত সারা দুনিয়াতে।

বাজে গান রেকর্ডপ্লেয়ারে—
'যখন এসেছিলে অন্ধকারে
চাঁদ ওঠেনি সিন্ধুপারে।'

পরিব্রাজকের দিনলিপি থেকে

বাসুদেব দেব

না, আমি ফুল ফোটাতে পারিনি তোমাদের বাগানে
খাঁচার পাখিকে শেখাতে পারিনি বুলি
এলোমেলো রাস্তাগুলোর গলায়
বেঁধে দিতে পারিনি নির্দিষ্ট গন্তব্যের ঠিকানা
পারিনি ভদ্রগোছের একটা ঘর বসাতেও
যেখানে ভালোবাসার কথার মধ্যে ঢুকে পড়বে না মশা

আগুন, আগুন সঙ্গে নিয়ে হাঁটছি, এক পতিত অগ্নিহোত্রী
পারিনি অগ্নিকাণ্ড ঘটাতে
কেবল দু একটা ফুলকি উড়ে গিয়ে পড়েছে কখনো
তোমাদের বিছানায়, বই-এর মধ্যে
গাছ হয়ে ছিলাম তাই কিছুদিন
নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছিলাম মাটির গভীর, গভীরতরে
হঠাৎই শান্তি আর ধ্রুবের প্রলোভন থেকে উপড়ে নিয়ে
মিশে গেলাম মাতলা নদীর প্রবাল উদ্দামে
সইলো না সেই উচ্চণ্ড আবেগ
সারারাত তাই গ্রামের খামারে কাকতাড়ুয়া হয়ে জেগে ছিলাম
ভালো লাগলো না ভাই, শেয়ালদা স্টেশনে
হকার হয়ে লাফিয়ে উঠে গেলাম চলন্ত ট্রেনে

এমনি করে প্রচণ্ড ক্ষিধে আর তেষ্টায় জ্বলতে জ্বলতে
নিজেকে টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দিয়েছি সর্বত্র
গ্রামে শহরে, জঙ্গলে পাহাড়ে, যুদ্ধে ও ধ্বংসে, মড়কে উৎসবে
শিখতে চেয়েছি কখনো জল ও বাতাসের ভাষা
উদ্ধার করতে চেয়েছি দুর্বোধ্য নক্ষত্র সংকেতে গুপ্তধনের হদিশ
আমি এক বাউণ্ডুলে পরিব্রাজক মাত্র
আমার হাতে তাই কোন চাবি নেই
তোমাদের পথের পাশে বশংবদ টিপকলও হতে পারিনি একটা
আমাকে ক্ষমা করো তোমরা
আমি ফুল ফোটাতে পারিনি তোমাদের বাগানে

ভারতবর্ষ

দেবী রায়

জীবনানন্দ দাশ কোনোদিন বিদেশ যাননি,
যামিনী রায়-ও না!
কেন যাননি?
হাঁটুর উপরে কাপড় তুলে রাস্তা পেরোতেন বলে?

যামিনী রায় অবশ্য বিশ্বাস করতেন যে, সে কথা
আপাতত থাক্
জীবনানন্দ দাশের পারিবারিক জীবন, কি সেই সন্দেহ?

রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার বিদেশ পরিভ্রমণ করেছিলেন,
বুদ্ধদেব, অমিয় থেকে শঙ্খ-সুনীল-জ্যোতির্ময়....
তারপর কে নয়? কে যে নয়!

বিবেকানন্দ একবার আমেরিকায় পৌঁছে পাশ্চাত্য তথা জগৎ-কে
বাধ্য করেছিলেন চোখ ফেরাতে, তার দিকে!
এ বাঁচা জিবের তলায় সরবিট্রেট রেখে ধুকপুক বাঁচা নয়
বলেছিলেন: 'সিস্টার্স অ্যান্ড ব্রাদার্স অফ আমেরিকা'

আমি কে? না, আমি-ই ভারতবর্ষ!
সংঘাত নয়, সহাবস্থান। জয়ী, মস্তিক নয় — হৃদয়!
রামকৃষ্ণের যাওয়ার প্রয়োজন হয়নি
কার প্রয়োজন হয়, কার যে হয় না!

ঝড় কেন ক্ষুব্ধ ও উত্তাল করে সংকীর্ণ স্থান-কে?
ধীর—শান্ত বায়ুপ্রবাহ —
সে কেন সারা পৃথিবীকে নিশিদিন বুকে আঁকড়ে রাখে।

হ্যাঁ, যামিনী রায় বিশ্বাস করতেন যে
তাঁর 'সাধনা' যদি সত্য হয়
তাহলে —

সমগ্র পৃথিবী তাঁর দরোজায় এসে দাঁড়াবে!

অবতরণ

পার্থপ্রতিম মণ্ডল

ঐ তো দৃশ্যমান হয় নির্বিজিত প্রান্তর
আর ঐ শক্ত জমে যাওয়া লাভার শীর্ষদেশ থেকে
নেমে গেছে অজ্ঞাত সুড়ঙ্গে
গর্ভদেশ যার শুধু মিশ কালো অন্ধকার
সম্ভাবনাহীন
কি জানি অভ্যন্তরে থাকলেও থাকতে পারে প্রাণ
অন্যতর কিম্বা এ সংশয়ই
নির্বাপিত পুরোপুরি
হ্যামলেটের দ্বিধাগুলি নেই তো আর তাছাড়া
এতো জানা-ই যে
— অন্তত বিজ্ঞান তাই বলে —
স্বর্গবাসী দেবদূতেরা আসে না নেমে
নেমে আসে না তারা নিয়ে যেতে
মৃত আত্মাদের
তাহলে আপাতত শেষ কথা এই
— অবতরণ
অবতরণ কেননা অত্যন্ত মানুষ এই চক্ষুদ্বয়
পারে না তাকাতে
ভূমিপৃষ্ঠে সুতীব্র আলোর পানে
দাহ মনে হয় — হয়ত বা জীবনসঞ্চারী —
এ প্রশ্ন মিছে
প্রশ্নরা মিছে সব কেননা উত্তর অজানা
কোথায় কিভাবে বা কেন অজানা

আর গতি ত্বরান্বিত করার প্রয়োজন নেই কোন
প্রয়োজন নেই তা আরো শ্লথ করার
এই নরকের পরে নেই কোন উতলা হৃদয়
— দু'পাশের গলন্ত অগ্নিময় অতল উপাদান চিরে
নেমে যেতে যেতে জ্বলে যায়
শুধু শরীর —
অনুসরণকারী ছায়ার ভীত কণ্ঠস্বরে

উৎকণ্ঠাও নেই কোন —
চারপাশ ঘিরে শুধু
মৃত আত্মাদের বলাবলি —
তারাও যারা বেঁচে থাকবে
আরো কিছুকাল অতঃপর
— কে বলেছে 'লিথি'
সেই স্রোত যা ধুয়ে নিয়ে যায় সব স্মৃতি
পরলোকে ? — আমি তো দেখেছি
কাতরাতে-থাকা তাদের যারা বেঁচে থাকবে
আরো কিছুকাল
ভেসে যেতে সে জলে —

এই প্রতিটি আসবাব আমাকে মনে করিয়ে দেয়
শৈশবের কথা
— বলো, তবে শুরু করতে হবে কোথা থেকে —
এই প্রতিটি আসবাবের গায়ে লেগে আছে
আঙুলের গন্ধ
খেলে বেড়ানো ধুলো মাখা আশ্চর্য দুপুর
দুপুর গড়ানো সন্ধ্যে
শরপাতাবনে কেটে গেছে হাত
মেঘের রঙে বিভোর (বোধহীন নাকি) ফেলে আসা
শরের তীর
— বলো, তবে শুরু করতে হবে কোথা থেকে —

— চুপ, চুপ, সব ফাঁস হয়ে যাবে —

বলো, এরও আগে শুরু ছিল নাকি
অ্যাট্রিয়ুসের দেওয়ালে যেমন

তা র প র দী র্ঘ স ম য়
না ম তে থা কা পা
ফে লে ফে লে
দী র্ঘ স ম য় নে মে চ লা
ওরেসটিস্, বলো, আমাকে কি মার্জনা
করে দেওয়া হবে শেষমেস —
দেবদূতেরা কি দাঁড়িয়ে আছে স্বর্গদ্বারে ?
নরকের পথ খোলা ?
বলাকা কোথায় যায় — পরীদের দেশে ?
শীর্ণ চক্ষুদ্বয় বড়ো ক্লান্ত সুতীব্র আলোকে —

মন্ত্র

নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

কে শহরের কে গ্রামের
কে বামের কে ডানের
কে আল্লার কে রামের
এ সব প্রশ্ন —
আজ তোমার কাছে অবান্তর।

তুমি শুধু মনে রেখো —
যে জীবন দেওয়া হয়েছে তোমাকে,
তাকে শ্রম দিয়ে, ভাবনা দিয়ে, পরিচর্যা দিয়ে —
বড় করে তুলতে হবে
একটা গাছের মতন।

তোমার জীবন — এই গাছ ;
অন্ধকার থেকে, রক্তপাত থেকে,
ক্ষমতার অন্ধ মোহ থেকে,
প্রাচুর্যের মিথ্যে দম্ভ থেকে —
তাকে সবসময় দূরে রাখো।

তুমি তাকে আনো বারান্দায়,
সে প্রাণভরে শীতের রোদ্দুর নিক ;
নামহীন কোনো নদীর ধারে
তাকে নিয়ে এসো,—
নিরাসক্ত এগিয়ে চলার গাম্ভীর্য
সে বুঝে নিক।

দাঁড়ের পাখিকে 'রাধাকেষ্ট' শেখাবার মতো
তুমি তাকে প্রতিদিন শেখাও —
আমাদের কোনো ধর্ম নেই,
আমাদের কোনো সঙ্ঘ নেই,
আমরা সমগ্র পৃথিবীর।
আমরা শুধু জানি একটাই মন্ত্র :—
মানুষ দীর্ঘজীবি হোক্
জ্ঞান দীর্ঘজীবি হোক্
শান্তি দীর্ঘজীবি হোক্

আমাকে নেবার জন্য

মেঘ মুখোপাধ্যায়

(ইগতপুরী থেকে কাসারা হাওড়া-বম্বেগামী রেলপথের স্মৃতিতে)

হাঁ করেছিল গুহা

আমি ঝপ করে ঢুকে পড়লাম তার ভেতরে
বলে উঠলাম আঃ
বাঁচলাম

বনপাহাড়ের মধ্যে আবর্তময় এই দুপুরে
গ্রীষ্মের ন্যাংটো রৌদ্রে
দৌড়তে দৌড়তে দৌড়তে দৌড়তে
হঠাৎ অন্ধকার —
হঠাৎ ঠাণ্ডা
শিরশিরে নরম হাওয়া

হাঁ করেছিলো গুহা
আমি ঢুকে পড়েছি তার মধ্যে
বলেছি আঃ বাঁচলাম —
শিরশিরে জলজ হাওয়া
জন্মপূর্বের স্মরণ বিস্মরণ
অদ্ভুত রঙে আঁকা

আর কী এক গন্ধ
যেন চেনা যেন অচেনা
আমার চোখ খোলার আগের
আমার মৃত্যুর পরের
ঘ্রাণময় গুহার গভীর
নিজস্ব গন্ধ

হাঁ করেছিলো গুহা
আমাকে নেবার জন্য
বলে উঠলাম আঃ
বাঁচলাম, পর্জন্য
এবার তুমুল বৃষ্টি নামাও

অন্নদাশঙ্কর রায়ের সেকুলার ভারতবর্ষ

আবদুর রউফ

সেকুলারিজমের সংজ্ঞানির্ধারণ একটা তর্কসাপেক্ষ ব্যাপার। তাই সেদিকে না গিয়ে ইতিহাসের সাহায্যে এর অর্থ অনুধাবন অনেক বেশি সহজসাধ্য বলেই মনে হয়। ইউরোপেই যে প্রথম সেকুলারিজমের ধারণা এবং সেকুলার স্টেটের উদ্ভব ঘটে এ বিষয়ে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। এই কারণেই আধুনিক ইউরোপের ইতিহাসের অভিজ্ঞতাকে যাচাই করে দেখা অত্যন্ত জরুরী। অন্নদাশঙ্কর রায় 'আমাদের ভবিষ্যৎ' প্রবন্ধে দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছেন, 'আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে ইউরোপের ইতিহাস যারা মন দিয়ে পড়েছে তারাই কেবল সেকুলার স্টেট বস্তুটিকে ধারণ ও বহন করতে পারে।' (পৃ. ২৩৩, প্রবন্ধ)

পারিবারিক, আর্থ-সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক জীবনে চার্চের স্বেচ্ছাচারী আধিপত্য থেকে মুক্ত হওয়ার বাসনা থেকেই ইউরোপে সর্বপ্রথম সেকুলার ধ্যান-ধারণা বিকাশ লাভ করে। সম্ভবত সেই কারণেই সেকুলার কথাটার বাংলা করা হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ। কেউ কেউ অবশ্য এই ধর্মনিরপেক্ষ বলতে বোঝেন ধর্মবিরোধী। এদের কথা মনে রেখেই শ্রী রায় বলেছেন, 'সেকুলার কথাটা ধর্মের বিপরীত নয়। ধর্ম থাকুন, কিন্তু তা যেন আফিং না হয়। ধর্মের নেশায় যেন তারা স্বাধীনতা বিকিয়ে না দেয়।' (আমাদের ভবিষ্যৎ, পৃ. ২৩৫, প্রবন্ধ) তিনি আরও বলেছেন, 'মানুষ মানুষকে ধর্মের দ্বারা চিহ্নিত করতে সব সময় রাজি নয়, এই হলো সেকুলার মনোভাবের আদত কথা। নইলে ধর্ম ছাড়তে বা ধর্মে অবিশ্বাস করতে কেউ বলছে না। সেকুলার স্টেট ধর্মবিরোধী নয়। ডেভবুদ্ধিবিরোধী।' (স্বাধীনতা দিবসের ভাবনা, পৃ. ২৭১, প্রবন্ধ) ধর্ম এবং রাষ্ট্র সম্পর্কে শ্রী রায়ের সাফ কথা হল, 'ধর্ম চিরকাল থাকবেই, ধর্ম না হলে মানুষের চলে না। রাষ্ট্রও চিরকাল থাকবে, যদি না মানুষের জীবন বিকেন্দ্রীকৃত হয়। ধর্মের সঙ্গে আমাদের ঝগড়া নেই, আমরা বরং ধর্মের ঝগড়া চুকিয়ে দিতে চাই। সে অধ্যায় শেষ হলে আমরা বাঁচি। আমরা বলি ধর্মও থাকুক রাষ্ট্রও থাকুক। কিন্তু জোড়া লেগে ধর্মরাষ্ট্র না হোক।' (চেতাবাণী, পৃ. ২৩৩ প্রবন্ধ) হিন্দী 'পন্থনিরপেক্ষ' কথাটা বোধ হয় 'সেকুলার'-এর অনেকখানি কাছাকাছি। কারণ ধর্ম নয় এমন যেসব পন্থ বা ডগমাসর্বস্ব জীবনদর্শন আছে যার মধ্যে নাস্তিক্যও পড়ে যথার্থ সেকুলারিস্ট সেগুলি সম্পর্কেও রাষ্ট্রীয় নিরপেক্ষতা অবলম্বনের পক্ষপাতী। রাষ্ট্র যেহেতু সমস্ত নাগরিকের কাছেই আনুগত্য দাবি করে তাই কোন নাগরিক নাস্তিক কিংবা অজ্ঞেয়বাদী হলেও তার অধিকার কিছুমাত্র কম হতে পারে না।

বঙ্গবাদীদের কেউ কেউ সেকুলার কথাটার বাংলা করেছেন পার্থিব। তাঁরা বলেন, 'All secular concepts start with the non-recognition of any supernatural entity অর্থাৎ যে কোন অতিপ্রাকৃত সত্তার অস্বীকৃতির পথেই সমস্ত পার্থিব চিন্তার জন্ম।' এঁদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এগোলে সেকুলার রাষ্ট্রের শেষ পর্যন্ত ধর্মবিরোধী না হয়ে উপায় নেই। আমাদের দেশের রাজনীতিক এবং রাষ্ট্রীয় কর্ণধারদের বেশির ভাগই কিন্তু এই ব্যাখ্যার ধার ধারেন না। তাঁদের কাছে সেকুলার স্টেটের বর্তমানে মানে দাঁড়িয়েছে 'equal encouragement for all religions বা সমস্ত ধর্মে সমান উৎসাহদান।' অন্নদাশঙ্কর রায় সেকুলারিজমের স্পিরিট যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা এই দুই মতের চেয়ে অনেকখানি ভিন্ন প্রকৃতির।

একথা অবশ্য ঠিক, সেকুলারিজমের সমস্ত ধ্যান-ধারণার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে মানুষ। শ্রী রায় যেমন বলছেন, 'এ যুগ বিজ্ঞানের যুগ, এ কথা সকলে জানে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, মানবিকতার যুগ। যাকে বলে হিউম্যানিজম তার লক্ষণ হলো সমাজের চেয়ে মানুষ বড়ো, সম্প্রদায়ের চেয়ে মানুষ বড়ো, শ্রেণীর চেয়ে মানুষ বড়ো, সংঘের চেয়ে মানুষ বড়ো।' (যুগজিজ্ঞাসা, পৃ. ২৪৫, প্রবন্ধ) মানুষকে এই গুরুত্বপ্রদানই হল সেকুলারিজমের আদৎ লক্ষণ। আগে এই গুরুত্বের জায়গায় ছিলেন ঈশ্বর। কিন্তু মানুষকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে সেকুলারিস্টদের সমস্ত চিন্তাভাবনা বিবর্তিত হলেও তাঁরা তাঁদের মতো করে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী কোন চেতন সত্তার উপলব্ধিতে পৌঁছবেন না কিংবা বস্তুবহির্ভূত কোন অতিপ্রাকৃত

প্রবন্ধটি অন্নদাশঙ্কর রায়ের নবতি বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ভারতীয় ভাষা পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত মূখিন ব্যাপী অন্নদাশঙ্কর সম্বর্ধনা সভায় ১৩ই মার্চ '৯৪-এ দুপুরের অধিবেশনে পঠিত।

সত্তাকেই মানবেন না এমন ধারণা ঠিক নয়। কিন্তু কোনভাবেই সেই অতিপ্রাকৃত সত্তা তাঁদের কাছে কোন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিধিনিষেধের ধ্বজাধারী ঈশ্বর নন। কারণ সেকুলারিস্টগণ বিশ্বাস করেন মানুষের ভাল-মন্দ, নীতি-দুর্নীতির বিচার হবে সর্বজনীন মানুষের সর্বোত্তম কল্যাণের নিরিখে, কোন ঈশ্বর দ্বারা পূর্বনির্দিষ্ট বিধি-বিধানের নিরিখে আদপেই নয়।

ব্যক্তি কিংবা রাষ্ট্রের এইরকম একটা সেকুলার অবস্থান সম্পর্কে ধারণা করা ভারতবর্ষের মানুষের পক্ষে তেমন কিছু কঠিন নয়। মনে রাখতে হবে এখানে ঈশ্বরচেতনা, যা কিছু ভাল তার মধ্যে ভগবানের প্রকাশ আর যা কিছু খারাপ তা শয়তানের কারসাজি, এইরকম কোন সরলীকৃত ব্যাপার নয়। এখানে বিচিত্র বিধি-নিষেধের ধ্বজাধারী বহু দেব-দেবীর মধ্যে ব্যক্তিকৃত ঈশ্বর যেমন আছেন তেমনই এমন ঈশ্বরও আছেন যিনি বিশ্বচরাচর ব্যাপ্ত করে একটি চেতন সত্তার অনুভব মাত্র। যে অনুভবের ভিত্তিতেই বলা হয় জগৎ সংসারের সবকিছুই ব্রহ্মময়। সবকিছুই যদি ব্রহ্মময় হয় তাহলে তো আর দেবতা-দানব, ভগবান-শয়তান বলে কিছু থাকে না। সেক্ষেত্রে ভাল-মন্দ, নীতি-দুর্নীতির বিচার হয়ে পড়ে নিরর্থক। অর্থাৎ ঈশ্বরের নিরিখে বিচার আর এগোতে চায় না। তাই মানুষকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে তার সর্বোত্তম কল্যাণ কামনায় ভাল-মন্দ, নীতি-দুর্নীতির বিচার করা ছাড়া কোন উপায় থাকে না। তাই আধুনিক জীবনের তাগিদে সেকুলার মানবতাবাদের চিন্তা যখন ইউরোপ থেকে এসে আমাদের ভাবজগতে আলোড়ন তুলল তখন আমাদের মনীষীগণ সেটাকে গ্রহণ করলেন নিজেদের মতো করে। মানুষের স্বাভাবিক যুক্তিবিচার, ইতিহাসের অভিজ্ঞতা এবং বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতেই তাঁরা মানবতাবাদী চিন্তার বিকাশসাধন ঘটালেন ঠিকই কিন্তু এঁদের মধ্যে সেই সব মনীষীর চিন্তাই গণমানসের উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হল যাঁরা এই সেকুলার মানবতাবাদকে সম্পূর্ণ ভারতীয় ধাঁচে ঢেলে সাজাতে সক্ষম হয়েছিলেন। বলাই বাহুল্য যে সারা ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে এঁদের সংখ্যা ছিল নিতান্তই নগণ্য।

একথা অবশ্য একশো ভাগ ঠিক যে ইউরোপের সেকুলার ধ্যান-ধারণার অভিঘাতেই আমরা প্রথম সচেতনভাবে ধর্মীয় ঈশ্বর এবং দেব-দেবী নিরপেক্ষভাবে সর্বজনীন মানুষের সর্বোত্তম কল্যাণের কথা ভাবতে শুরু করি। কিন্তু এর ফলে ঈশ্বরচিন্তার আর একটি রূপ যে আমাদের মধ্যে ছিল সেটা অন্য তাৎপর্য পেতে শুরু করে। রামমোহন যে ঈশ্বরের কথা আমাদের শোনালেন তার সঙ্গে হিন্দুসমাজে প্রচলিত দেব-দেবীমূলক ঈশ্বরচিন্তার মিল ছিল না। ফলে সমাজে আলোড়ন শুরু হয়। রামমোহন কোন ঋষি বা প্রেরিত পুরুষ ছিলেন না। তিনি সেরকম কোন দাবিও করেননি। যেরকম নতুন ধরনের ঈশ্বরচিন্তার সূচনা তিনি করলেন তা ছিল রেনেসাঁর চেতনাপুষ্ট ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী মানুষের ঈশ্বরভাবনা। যদিও এই ঈশ্বর ভারতীয় ধ্যান-ধারণার ঐতিহ্য বহির্ভূত কোন সত্তা নয়। কিন্তু পরিপ্রেক্ষিত পাল্টে যাওয়ায় এটাকে গণ্য করা যেতে পারে পন্থনিরপেক্ষ ভারতীয়ের ঈশ্বরভাবনা হিসাবে। যদিও পরবর্তীকালে রামমোহনের অনুগামীরা এই ঈশ্বরভাবনাকে কেন্দ্র করে আর একটি নতুন পন্থের জন্ম দিয়েছিলেন।

আমার নিজের ধারণা, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ঈশ্বরচিন্তাও এইরকমই একটা ব্যাপার। তাঁরাও হিন্দু দেব-দেবীদের নিয়ে প্রচলিত সংস্কারগুলিকে বিশেষ আমল দেননি। ধর্মীয় বিধি-নিষেধের বেড়াগুলি ভাঙতে ভাঙতে শেষ পর্যন্ত জগৎকল্যাণকেই দিয়েছেন সর্বোচ্চ স্থান। বলেছেন, 'জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'। এইভাবে জগৎকল্যাণ তথা মানবকল্যাণকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে ঈশ্বরচিন্তার বিবর্তন এর আগে দেখা যায়নি। মনে রাখতে হবে এঁদের এই জগৎকল্যাণ ভাবনার মধ্যে কোনরকম স্বর্গলাভ বা মোক্ষপ্রাপ্তির বাসনা ছিল না। বিবেকানন্দ বেদান্তদর্শন ব্যাখ্যা করে দেশের যুবকদের বলেছেন, 'তোমাদের সবার মধ্যেই রয়েছে ব্রহ্ম। তোমরা ব্রহ্মের তেজে জেগে ওঠ'। এই ব্রহ্ম তেজে জাগ্রত যুবকদের তিনি দেশব্রতী হতে বলেছেন। মানবকল্যাণে নিবেদিত প্রাণ হয়ে ওঠার আহ্বান দিয়েছেন। বলেছেন, দেশের একটা মানুষও যতক্ষণ অভুক্ত থাকবে তাকে খাওয়ানোই যথার্থ ধর্মাচরণ। বলেছেন, নিজেদের জাতীয় পরিচয়ে গৌরবান্বিত হয়ে উঠতে (এই কথাটার এখন অবশ্য শোনা যায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপব্যাখ্যা)। উপদেশ দিয়েছেন, গীতাপাঠ স্থগিত রেখে ফুটবল খেলে স্বাস্থ্যোদ্ধার করতে। এইসব কোনমতেই সেইসময় দেশে প্রচলিত ধর্মীয় চিন্তার প্রতিধ্বনি ছিল না। এ একেবারে অন্য ধরনের ভাবনা। পুরো ব্যাপারটাই পার্থিব, ইহলৌকিক ; পারলৌকিক ভাবনার কোন স্থানই এখানে নেই। আর সবচেয়ে বড় কথা হল এই ভাবনা পন্থনিরপেক্ষ। বিবেকানন্দ শুধু হিন্দুকে আহ্বান করেননি, তিনি ডাক দিয়েছেন সারা ভারতের সমগ্র জনসাধারণকে। এই কারণে একেই আমি বলতে চাই, এ হল সেকুলারিস্ট বা পন্থনিরপেক্ষ ভাবনার ভারতীয় রূপ। যদিও এই ভাবনা তখনও বৃহত্তর হিন্দুধর্মীয় ঐতিহ্যের বৃহত্তর গণ্ডী অতিক্রম করেনি। বিবেকানন্দের ধর্মীয় আত্মপরিচয়ে হিন্দু আইডেনটিটিই ছিল মূল কথা। কিন্তু এই হিন্দুত্ব পুরোপুরি তাঁর নিজের ব্যাখ্যাকৃত, যা সমকালীন কোন পন্থেরই অনুসরী ছিল না। বেদান্ত দর্শনভিত্তিক হিন্দুত্বের এই অভিনব ব্যাখ্যা (যার মস্তিষ্ক বেদান্ত এবং দেহ ইসলাম) হিন্দু আইডেনটিটির গণ্ডী অতিক্রম করে যায় রবীন্দ্রনাথে এসে।

একজন যথার্থ সেকুলারিস্ট মানবতাবাদী মানুষের ঈশ্বরচেতনার এবং জগৎকল্যাণচিন্তার কীভাবে মেলবন্ধন ঘটতে পারে তার সর্বোত্তম নিদর্শন আমরা পাই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ যখন দেশের মানুষের সমস্যার কথা বলেন, সেগুলি সমাধানের পথ খোঁজেন, প্রচলিত ধর্ম সেক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ালে তার বিরুদ্ধেও কলম ধরতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন না। কখনও কখনও এমন মনে হওয়াও অস্বাভাবিক নয় যে প্রচলিত কোন ধর্মেই তাঁর আস্থা নেই। প্রাচীন ভারতের আশ্রমবাসী ঋষিদের সম্বর্কে তাঁর শ্রদ্ধান্বিত মনোভাব ছিল ঠিকই কিন্তু ঋষিবাক্য মাত্রেই অভ্রান্ত এমন বিশ্বাস তাঁর কোনদিনই ছিল না। রবীন্দ্রনাথকে কোন বিশেষ ধর্মের আওতাভূক্ত মানুষ হিসাবে কল্পনাই করা যায় না। ধর্ম ছাড়া অন্য কোন বিশেষ মতাদর্শের প্রতিও তাঁর কোনরকম অন্ধ আনুগত্য ছিল না। সব কিছুকেই তিনি যুক্তি বুদ্ধি, নিজের এবং ইতিহাসের অভিজ্ঞতা দিয়ে যাচাই করে নেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। সেই হিসাবে তিনি একজন পুরোপুরি পন্থনিরপেক্ষ মানুষ। কিন্তু এই পন্থনিরপেক্ষতা তাঁকে শিব ও সুন্দরের সাধনা থেকে বিরত করতে পারেনি কখনই। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মূর্ত ভারতীয় সেকুলার হিউম্যানিজমের আদর্শ তাই অনন্য।

এই অনন্য রাবীন্দ্রিক ভারতীয় সেকুলারিজমের স্পিরিট যথার্থভাবে অনুধাবন করেছেন অন্নদাশঙ্কর রায়। শ্রী রায়ের সেকুলারিজম তাই বস্তুবহির্ভূত সত্তার পরিপূর্ণ অস্বীকৃতির নামান্তর নয়, কিংবা সর্বধর্মে সমান উৎসাহপ্রদান নামক অপব্যাখ্যারও অনুসারী নয়। প্রচলিত কোন বিশেষ ধর্ম কিংবা দেব-দেবী ধারণা যে তাঁর স্বীকৃতি পায়নি একথাতো বলাই বাহুল্য। বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ইতিহাসের অভিজ্ঞতা এবং সাধারণ যুক্তিবিচারের ভিত্তিতে সর্বজনীন মানুষের সর্বোচ্চ কল্যাণই অন্নদাশঙ্করের সেকুলারিজমের মূল লক্ষ্য। সেকুলার স্টেটের পক্ষপাতী তিনি এই কারণেই। তিনি মনে করেন, 'হিন্দুত্ব বা ইসলাম বা খ্রীস্টধর্ম নিয়ে যদি মানুষ সন্তুষ্ট থাকত তা হলে মানব বিবর্তন এইখানে শেষ হয়ে যেত। সেই শেষ নয়। তাই মানবিকবাদের উদয় হয়। মানবিকবাদ মানব থেকে আরম্ভ করে, ঈশ্বর থেকে আরম্ভ করে না।' (বিষাদসিন্ধু, পৃ. ৬২, খোলা মন ও খোলা দরজা) তাঁর দাবি, এইরকম ভাবনার ভিত্তির উপর গড়ে উঠুক সেকুলার স্টেটের ইমারত। কিন্তু যেহেতু অন্নদাশঙ্করের সেকুলারিজম ভারতীয় পরম্পরা থেকে বিচ্ছিন্ন কোন ব্যাপার নয় এবং তা শতকরা একশো ভাগ রাবীন্দ্রিক তাই কল্যাণময় ঈশ্বরচেতনার সঙ্গেও রয়েছে এর গভীর সংযোগ।

অন্নদাশঙ্কর অবশ্য একে ঈশ্বর বলতে নারাজ। তাঁর মতে এটা চিরন্তন কোন চিৎ সত্তা। 'নীতিজিজ্ঞাসা' প্রসঙ্গে নিজের মনের সংশয় প্রকাশ করে সেই ১৯২৯ সালে তিনি লিখেছিলেন, 'আমরা আকাশ বাতাস জয় করেছি, মানুষের মনের অলিগলির খবর রাখি, কিন্তু সব মিলিয়ে যা এক — যাকে বিশ্বাস করাটাই যাকে জানা — যাকে বোধ করাটাই যাকে বোঝা — সেই অখণ্ড ও অনির্বাণ স্বতঃসিদ্ধের বেলায় আমরা সংশয়বাদী। কেন আমাদের জন্ম, কেন আমাদের মৃত্যু, কেন আমাদের সুখ দুঃখ — কেন-র উত্তর খুঁজে পাচ্ছিনে। বেদ-বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্ব ও কথামালার গল্প দুই সমান আজগুবি ঠেকছে।

'সব অস্থিরতা সত্ত্বে কী স্থির সেইটে না জানলে বিশ্বাস রাখব কার উপরে, নিষ্ঠা রাখব কার প্রতি ? সব পরিবর্তন সত্ত্বে কী অপরিবর্তনীয় সেইটে না জানলে পরিবর্তনে আনন্দ পাব কেমন করে ? যা কিছু সৃষ্টি করব সবই কি লোপ পাবে ? যা কিছু হব তার কিছুরই কি চিহ্ন থাকবে না ? এ জীবনের কি এই জীবনেই আদি এবং এই জীবনেই শেষ ? যত খুশি অন্যায় করে গেলে কি মৃত্যুর পরে তার শাস্তি নেই ? আজীবন যাতনা পেলে কি মৃত্যুর পরে তার পুরস্কার নেই ? আত্মা কি অমর নয় ? আমরা কি এত অসহায় যে পৃথিবী ধ্বংস হলে আমাদেরও ধ্বংস হবে ? কাল কি এত নিষ্ঠুর যে ভালো মন্দ উভয়কেই মুছে দেবে ? মঙ্গলময় কি নেই ? নবনীতির ভিত্তিপাতের জন্যে চিরন্তনকে আবিষ্কার করা আবশ্যক।' (নীতিজিজ্ঞাসা, পৃ. ৫৭, প্রবন্ধ) অন্নদাশঙ্করের এই নবতি বর্ষ পূর্তির সময়েও অতি সম্প্রতি তাঁকে জিজ্ঞেস করে জেনেছি* এই চিরন্তনের প্রতি আস্থা তিনি কোনদিনই হারাননি। কারণ, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস সবরকম মানবকল্যাণ চিন্তার গভীরে এই চিরন্তনের অবস্থান না থাকলে মানুষের সত্যাসত্যের ধারণা এবং নীতি-মূল্যবোধের কোন ভিত্তি থাকে না। কিন্তু এই চিরন্তন চিৎ সত্তার সঙ্গে প্রচলিত ঈশ্বর ধারণাকে মিলিয়ে ফেললেই বেধে যায় যত গোলমাল। তখন চলে আসে ধর্ম এবং কান টানলেই যেমন মাথা আসে সেইভাবে চলে আসে জাত-পাত, হিন্দু-মুসলমান ইত্যাদি জটিল সব সমস্যা।

তাই অন্নদাশঙ্করের বিশ্বাস, আমাদের দেশে সেকুলারিজমের ধ্যানধারণার বিকাশ ঘটাতে হবে প্রচলিত ধর্ম, ঈশ্বর এবং দেব-দেবী সংক্রান্ত সংস্কারগুলি এড়িয়ে গিয়ে। অন্তত রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে কোনরকম প্রশ্রয় প্রদান চলবে না। শ্রী রায়ের দৃঢ় অভিমত, আমাদের মতো এই বহু ধর্ম, বহু দেব-দেবী, বহু জাতি-বর্ণ এবং বহু ভাষাভাষী অধ্যুষিত দেশে সেকুলারিজমকে জাতীয় আদর্শ করা ছাড়া কোন উপায় নেই। পাকিস্তান ধর্মকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ করে কিংবা বাংলাদেশ

* ১৫ই মার্চ ১৯৯৪-এ প্রচারিত আকাশবাণীর তরফে লেখক কর্তৃক নেওয়া সাক্ষাৎকার।

ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ঐক্যবিধানের প্রতীক করে পার পেয়ে গেলেও আমাদের পক্ষে এর কোনটাই সম্ভব নয়। আমাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শ হতে পারে একমাত্র সেকুলারিজম। কিন্তু এও মনে রাখতে হবে পুরোপুরি ইউরোপীয় মডেলের সেকুলারিজম এখানে চলবে না। এই সেকুলারিজম নিঃসন্দেহে হবে রাবীন্দ্রিক। যেখানে মানবকল্যাণ চিন্তার সঙ্গে অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটেছে শিব এবং সুন্দরের সাধনার।

আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক এবং বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় কর্ণধারগণ যদি এই রাবীন্দ্রিক ভারতীয় সেকুলারিজমের স্পিরিট যথার্থভাবে অনুধাবন করতে পারেন তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই পঙ্কুনিরপেক্ষ মানবতাবাদের আবেদন দেশের তৃণমূলে পৌঁছে দিতে কোন অসুবিধাই হবে না। আর এই রাবীন্দ্রিক ভারতীয় সেকুলারিজমের স্পিরিটকে ঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হলে বিষয়টিকে যথার্থভাবে অনুধাবন করেছেন যে চিন্তাবিদ সেই অন্নদাশঙ্কর রায়ের স্মরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আমাদের অন্য কোন উপায় নেই।

ইবলীশের মৃত্যু

সব্যসাচী সমাজদার

শীতের বিহানবেলা বিলপাড়ে ঘাসের ডগায় নিহরদানা খুঁটে খায় ক'টা চড়ুই। ঘাসে-ঘুরে ঘুরে ভেজা পালক। ফুরুৎ ফুরুৎ ওড়ে। এ ওর দিকে চায়। কিচির মিচির ডাকে।

দুনিয়ার গায়ে ফিকে আঁধার। কুয়াশার লেবাসে ঢাকা চারপাশ। গাছপালার ফাঁকে শিস দেয় পাখিরা। বাতাসে প্রবল জাড়। ভিজে মাটির বুকে অদ্ভুত সুবাস।

দুনিয়ার এ ধরন রূপ দেখে অবাক হয়ে গেল তোরাবালি। ভাবে, এসব বানাল কে? আগাছা নিড়ানে বাধা পড়ে। বেখেয়ালে দাউলির খোঁচা লেগে আঙুল ছড়ে যায়। রক্ত ঝরে। তবু দুঁস ফেরে না তোরাবের। ভাবনায় বুঁদ হয়ে থাকে।

বেলা ততক্ষণে বেড়ে যায়। পুবদিকে লালচে রং ধরলে ঘাসের মাথায় নিহরদানাগুলি ঝলমল করে। ভুঁইয়ের আলগা মাটি আর নিহরে তোরাবের পা দুটো মাখামাখি। মাঠ ছেড়ে আলে ওঠে ও। উবু হয়ে বসে পড়ে পুবমুখো। গোল সানকির পারা লাল সূর্য ধীরে সুস্থে মুখ দেখায়।

চারদিক শুনশান। বেহদ্দ উহর খইড়ামারী বিল। দিনমান ঘোর নির্জন। বাতাসে অদৃশ্য ছীন-পরী ঘুরে বেড়ায়। গরু-মহিষ ভুলপথে এ মাঠে চলে এলে গেরস্থের নাকাল। সঙ্গে লোক জুটিয়ে খুঁজতে আসে। বিলের উঁচু জমিতে কোমরসমান উলুখড়ের বন। সেই বনের আড়াল থেকে হঠাৎ ডানা ঝাপটে একঝাঁক হরিয়াল বিলের ওপারে উড়ে যায়। ওদের ডানা ঝাপটানোর শব্দে চমকে ওঠে তোরাবালি।

বিলের এই জোতজমি চৌধুরি সাহেবের। এক পুরুষে এতসব করা যায় না। চৌধুরিদের সাবেক দালান। সদরে ভারী কাঠের পাল্লা। কাঠের গায়ে নকশাকাটা। অন্দরে বিশাল আঙিনা। শান বাঁধানো কুয়োতলা। ওপাশে ভুমিঘর। গোয়ালে গাই-বলদ। বারান্দার দক্ষিণে দু'তলার সিঁড়ি। তার নিচে সম্বৎসরের ধানের বস্তা রাখা থাকে। সম্পত্তি কিছু কম নেই চৌধুরিসাহেবের। ফের তিনি পাকছাক আদমি। বছরকয় আগে হজ্ব আদায় করে এসেছেন। দেহে গোড়ালি-ছুঁই আলখাল্লা। মাথায় নামাজি টুপি। দিনমান খানাঘরে বসে এ দুনিয়ার বৃত্তান্ত-ব্যাপারে নানান আলাপ করেন। বিলের জমিতে তোরাবকে কাজে লাগানোর সময় বলেছিলেন, "সবই কুদরতের খেলা রে তোরাবালি। এই যে দেখছ দুনিয়া, এর মালিক হলেন তিনি।"

হাজিসাহেবের চোখের পাতা পড়ছিল ঘন ঘন। আর তোরাব ভেবেছিল, কী আশ্চর্য!

তোরাবের ভাবনা টের পাননি হাজিসাহেব। ফের বলছিলেন, "খোদার কাছে কিছুই অজানা থাকে না বাপ। কারণ তিনি সর্বশক্তিমান।"

এভাবে হাজিসাহেবের সঙ্গে তোরাবের পরিচয়। হাজি দেখলেন, লোকটা একটু ক্ষ্যাপাগোছের ভালো মানুষ। পছন্দ হয়ে গেল। কাজে লাগালেন পাটের কারবারে। কাঁটা ধরার কাজ। কিছুদিনে দেখা গেল কাঁটার হিসেব বারবার ভুল করছে তোরাব। হাজির কারবার দেখে ছেলে বাপকে বলল, "আব্বাজি আপনার ও লোকে আমার কাজ চলবে না। দু'দিনেই ব্যবসা চোপট করে দিবে।"

ছেলের কথায় মৃদু হেসেছিলেন চৌধুরি, "তাই তো রে বাপজি। কিন্তু ওকে নিয়ে কী করা যায় বল দেখি?"

"সে আপনি যা হয় করেন।"

ছেলে আর দাঁড়ায়নি। বাপের প্রতি একটা ক্ষোভ রয়েছে তার। যতসব শানকি লোকের জন্য আব্বার প্রাণ কাঁদে। কাজ না করিয়ে পয়সা দেয়। অথচ বাপকে কিছু বলার সাহসও নেই ছেলের। সে কারণে বাপের সঙ্গে তোরাবকে নিয়ে বেশি কথা বলতে চায়নি। তা হাজি পড়লেন বিপদে। ভেবে পাচ্ছিলেন না তোরাবের একটা বন্দোবস্ত।

সন্ধেবেলা খানাঘরের বারান্দায় বসে বললেন, "কী করা যায় বল দেখি?"

সামনে বসেছিল তোরাব। আশমানে মস্ত একখান গোল চাঁদ। দুধ-জোৎস্নায় ভাসছে মাঠ-ঘাট। সে আলোয় উদাসীন তোরাবের মুখ দেখে হাজি বড় কষ্ট পেলেন, "কী ভাব তোরাবালি?"

"ভাবি না কিছু শুধু দেখি।"

দেখার কথা বলে যেন অনেক কিছু বোঝাতে চায় তোরাব। অথচ কী ভাষায় বোঝাবে তা ওর জানা নেই।

বারান্দার নিচে ফুলের বাগান থেকে সুগন্ধী বাস বাতাসে

ভাসছিল। ঝোপের আড়ালে একটানা ঝিঁঝির গান। হাজিসাহেব শোনাচ্ছিলেন — সৃষ্টি রহস্য, প্রথম পুরুষের জন্মবৃত্তান্ত। যাঁর জন্ম মাটি থেকে, মাটি দিয়ে গড়া দেহ।

এইসব ছিল সেই রাত্রির কথা। সেদিন প্রথম মাটিকে ভালবেসে ফেলে তোরাবালি। শেষে হাজিসাহেব বলেছিলেন, "আর বেশি দেরি নাই তোরাবালি। কেয়ামতের সকল আলামত দেখা পাচ্ছি। দুনিয়াতে খোদা মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁর এবাদতের জন্যে। একথা সব লোকে বুঝে না।"

তোরাব পুনরায় আশ্চর্য হয়েছিল। হাজিসাহেব মুরুব্বি মানুষ, যিনি কিনা কেয়ামতের আগাম খবর রাখেন। দুনিয়া ধ্বংস হতে আর বেশি দেরি নেই। ইস্রাফিলের শিঙ্গা বেজে উঠল বলে! তোরাব তাই দেরি করেনি। তড়িঘড়ি চলে এসেছে বিলপাড়ে। আলের ধারে বড় পাকুড়গাছটার নিচে একচালা বেঁধে নিয়ে দিবা মাটির অন্তরে ডুব দিয়েছে। ধ্বংস হওয়ার আগে দুনিয়াটাকে আরও বেশি করে দেখে নিতে চায় ও। বছরে অন্তত একটা চাষের কড়ার দিয়েছেন হাজিসাহেব।

জমিতে সব্জি ফলায় তোরাবালি। এসন বেগুনের চাষ। একহাত অন্তর চারাগোঁতা। সবে বাড় ধরেছে। ঠিকমতন বেড়ে উঠলে ভাল ফলন দেবে। ভোরের আলো না ফুটতে দাউলি হাতে উঁইয়ে নামে তোরাব। কিন্তু রোজই কোনও একটা কারণে আশ্চর্য হয়ে ওর হাত থেমে যায়।

নানান কারণে মানুষ আশ্চর্য হয়। কিন্তু তোরাব বুঝি আশ্চর্য হওয়ার জন্যই জন্মেছিল। ওর আশ্চর্য হওয়া বড় ফাঁদে ফেলেছে ওকে। গাঁয়ের মানুষ ওর ভাবনার খবর রাখে না। ওরা তোরাবকে সন্দেহ করে। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, "ক্যামুন আছ গো তুরাবভাই?"

তোরাব জবাব দেয়, "ভালো নাই গো।"

তারপর মাটিতে মুখ নামিয়ে বলে, "কেয়ামতের দেরি নাই। সব ধ্বংস হ্যা যাবে।"

লোকের বুকে বড় বাজে কথাটা। ভয় হয়। লোকটা নিঘ্যাত শয়তানের সাগরেদ। গাঁয়ের কেউ কেউ বলে, ওরা নাকি একলামাঠে তোরাবকে বাতাসের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছে। ওরা গাল দেয়, "সুমুন্দি নিঘ্যাত ইবলীশ। নালে গা ছমছম বিলপাড়ে দৈবী বাতাসের সাথে কথা বলে ক্যানে?"

গেরস্থ তাই তোরাবকে দেখলেই দরজা আঁটে। বিবিরা সন্তানকে সাবধানে আঁচলের নিচে আড়াল করে। কে জানে কোন্ নষ্ট বাতাস গায়ে লাগে!

তোরাব এসব জেনে গিয়েছিল। সে কারণে গাঁয়ে ঢুকতে মন চায় না ওর। সপ্তাহের খোরাকি চালটুকু হাজিবাড়ি থেকে আনার সময় বড় কষ্ট হয় তোরাবের। ছেলেবয়স থেকে এ গাঁয়ে মানুষ। ছোটবেলায় সমবয়সি ছেলেরা ওকে পাগলা বলে খেপাত। ধুলো মুঠো করে নিয়ে ওর গায়ে ছুঁড়ে দিত। সে সময় মা এসে বাঁচাত ওকে। পড়শি বউ-ঝিদের সঙ্গে গালাগালি দিয়ে ঝগড়া করত। সন্ধ্যে বাপ বাড়ি ফিরলে নালিশ করত। বাপ সারাদিন রাজমিস্ত্রীর জোগাল খাটত। অন্য সময় জমিতে মুনিষের কাজ করত। মায়ের নালিশ আর কান্না শুনে রেগে উঠত বাপ, "হ্যারা ছেলাকে মানুষ ক্ষ্যাপা বুলবে না তো কি করবে। মেলা বকবক করিস না চুপ য্যা।" বাপের ধমকে ভয় পেত মা। রাতে শুয়ে কোলের কাছে টেনে নিয়ে সোহাগ করত ছেলেকে, "বাপধন আমার। খুদা তুকে পেঠেইছে। তু হলি খুদার ধন, মানিক আমার।"

সেই বয়স থেকেই একলা হয়ে গিয়েছিল তোরাবালি। খেলার সঙ্গী ছিল না কোনও। বুনো শোকামাকড়, গাছগাছড়া, পুকুরের মাছ আর নানান পাখিদের মধ্যে ছিল ওর দুনিয়া। তখন থেকেই একা একা কথা বলত তোরাব। সে সব কথা অন্যেরা বুঝত না। তাবাদে একদিন মা'টাও মরে গেল। তোরাব একার জগতে একমাত্র আশ্রয়টুকু হারিয়ে আরও একা হয়ে গেল। যতসব প্রাকৃতিক বস্তু ও জীবেরা হল তোরাবের শেষ আশ্রয়। কিন্তু যেদিন বাপ দ্বিতীয় বিবি ঘরে আনল সেদিন থেকে ওর প্রকৃত দুঃখ শুরু হল। সৎ মা ঘরে এসে প্রথমদিনই বাপকে বলল, "ওই পাগলাটাকে লিয়ে আমি সংসার করতে পারব নি। গাদাগাদা গিলবে আর হাগবে। কামের বেলা নাই।"

বাপ উদাসীনভাবে বলল, "ছেলাটা এট্টু ওইরকমই। ঠিক আছু উকে আমি সাথে লিয়ে যাব কাজে।"

বাপের সঙ্গে ইঁট বওয়ার কাজে লাগল তোরাব। কিন্তু কাজে ওর মন ছিল না। ইঁটের পাঁজার ফাঁকে শিঁপড়ের সারি দেখে হাঁ করে চেয়ে থাকত। কিম্বা বালি সিমেন্টের মিশ্রিত গন্ধ নাক টেনে টেনে শুঁকতে থাকত চেরাক্ষণ। কাজে ঢিল পড়ায় গাল দিত মিস্ত্রী। পেটাত বাপ। কিন্তু কাঁদত না তোরাব। শুধু ব্যথা পাওয়া অবাক চোখ তুলে বাপের দিকে তাকিয়ে থাকত। শেষে বাপ একদিন বলল, "তুকে আমি বসিয়ে গিলাতে পারব না। লিজের পথ দেখে লেগ্যা।"

তখন তোরাবের অঙ্গের বড় টান। গাঁয়ের মসজিদের খতিব লোকটা ভাল ছিল। তার ফাইফরমাস খাটত তোরাব। দিন গেলে দু'মুঠ জুটত সেখানে। আল্লার পথে থকার নিদেন দিত খতিবসাহেব। তাবাদে হাজিসাহেবের সঙ্গে পরিচয়। তখন থেকেই গাঁয়ের মানুষ হিংসে করত তোরাবকে। খানিক ভয় পেত। শেষতক বিলপাড়ের মাঠে তোরাবের একলা জীবন। এখন বেশ ভাল আছে। শুধু ওই কেয়ামতের কথাটা মাথায় এলেই ভয় হয় ওর।

বিলের উঁচু পাড়ে উলুখড়ের বনে হাওয়ার শব্দে কান পেতে

ও শুধু নীরবে ভাবনা করে। কত ধরন ভাবনা, শেষ নেই।

এলোমেলো বাতাসে পাকুড়ের মরা শুকনো পাতা আলমানে পাক খেয়ে ঘোরে। হরিয়াল আর গাঙশালিখের ঝাঁক বিল পেরিয়ে আকাশ যেখানে ঝুপ করে মাঠে নেমেছে, সেদিকে উড়ে যায়। তখন বড় কান্না পায় তোরাবের। এসব কিছুই থাকবে না। কেয়ামতের রোজে সমস্তই ধ্বংস হয়ে যাবে!

(দুই)

সকালের রোদ তোরাবের শরীরে খেলছিল। শীতের বাতাসে বেড়ে ওঠা বেগুনক্ষেত। সবুজ পাতার গায়ে তখনও নিহরদানাগুলি শুকিয়ে যায়নি। হঠাৎ সেই সকালে বিলপাড়ে চৌধুরিসাহেব হাজির হলেন। এসে দাঁড়ালেন পাকুড়গাছের এপাশে মিঠে রোদে। পায়ের পাম্পশু আলের ঘাসে ঘষে নিলেন বারকয়। নিহর শুকিয়েছে কিনা দেখলেন। তারপর বললেন, "এলাম রে তোরাবালি। তুমি কেমন ফলন করেছ তাই দেখতে এলাম বাপ।"

হাজিসাহেবের চোখ ছিল সবুজ চারাভূমিতে। তোরাব খুশি হয়ে ওঠে। এ মানুষটা তাকে জানে, কথা বোঝে। সেই টানে সোজা চলে এসেছে আজ। তোরাব বলল, "আসেন।"

হাজিসাহেব আল ছেড়ে নেমে এলেন। কোমর ছুই ছুই গাছগুলো সাবধানে বাঁচিয়ে ক্ষেতের মাঝ বরাবর তোরাবের পিছু ধরলেন, "য়্যাঁরে বাপ চারার ফলন তো দেখি ভালোই হয়েছে।"

তোরাব সে কথার জবাব দেয় না। বলে, "মাটি থিকে বাসনা উঠে ক্যানে?"

হাজিসাহেব অবাক হলেন, "মাটি থেকে গন্ধ!"

"জি। বিয়ানবেলা আমি তেষুন ভুঁই লিড়াতে নেমাছি। হঠাক বাসনা পেলাম।"

হাজিসাহেব থেমে গিয়েছিলেন। তোরাবের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন, "হয় রে বাপ হয়।"

"কিন্তুক ক্যানে হয়।"

"হয় কারণ এসবের মালিক হলেন গে খোদা। ফের আল্লার প্রিয় বান্দা মাটিতে শুয়ে আছেন। একলক্ষ চব্বিশহাজার পয়গম্বর আছেন। তাই মাটির ভিতর বাস পাও বাপধন।"

হাওয়ায় হাজিসাহেবের আলখাল্লা এলোমেলো উড়ছে। খসে পড়েছিল মাথার টুপি। হাজিসাহেব নিচু হয়ে টুপিটা কুড়িয়ে নিলেন। ফের মাথায় বসিয়ে এগিয়ে গেলেন ক্ষেতের মাঝে। চারপাশ সবুজ হয়ে আছে। হাজিসাহেব ক্রমে খুশি হচ্ছিলেন। হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখছিলেন চারাগুলো। বাবরবার ছোঁয়ায় পাতার গায়ে জমে থাকা নিহরে তাঁর হাতের চেটা, আঙুল ভিজে গিয়েছিল। হাজিসাহেব বললেন, "ফলাও বাপ ফলাও। সৃষ্টির এমন রূপ দেখলে আল্লা খুশি হন রে ব্যাটা।"

তোয়াব কিন্তু খুশি হতে পারছিল না। এ সৃষ্টিও একদিন থাকবে না। ধ্বংস হয়ে যাবে। বুকের ভিতর কষ্ট হয় ওর, "কিন্তুক আল্লা ক্যানে দুনিয়া ধ্বংস করবে সেই কথাটা বুলেন গো।"

হাজিসাহেব চিন্তিত হলেন। হাতদুটো ঘষে নিলেন, "পাপ বেড়ে যাচ্ছে গো। আল্লা সীমা বেঁধে দিয়েছেন। সীমা লঙ্ঘনকারীদের আল্লা কখনো ক্ষমা করেন না। খোদার এবাদত না করে মানুষ সেই সীমা লঙ্ঘন করছে। তাই কেয়ামত এগিয়ে আসছে। শেষ বিচারের দিন আর বেশি দেরি নাই।"

হাজিসাহেব বিষণ্ণ হয়ে গেলেন। তোরাব হঠাৎ মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠল, "লয়, ইটা ঠিক লয় গো। ঠিক কাজ লয়।"

ক্রমাগত মাথা ঝাঁকাচ্ছিল তোরাব। ছুটে গেল ক্ষেতের এদিক ওদিক। বড় মমতায় ছুঁয়ে দেখছিল চারাগুলো।

মাঠ ছেড়ে চটপট উঠে এলেন হাজিসাহেব। আলে উঠে আর পিছনে তাকালেন না। তাঁর কেমন ভয় হচ্ছিল। সোজা গাঁ মুখো হাঁটতে লাগলেন।

আর তোরাব সারাদিন ক্ষেতের মাঝে ছোটাছুটি করতে থাকল। বুকের মধ্যে একটা কষ্ট ওকে কিছুতেই থামতে দিচ্ছিল না। হাজিসাহেব কখন চলে গিয়েছেন ও জানে না। যখন হুঁস ফিরল সন্ধ্যা হয়ে গেছে। পৃথিবীকে রক্তচক্ষু শাসিয়ে কিছুক্ষণ আগে দিনমণি বিদায় নিয়েছেন। গাছগাছালি আর বিলের ওপর কুয়াশামাখা ছায়া ছায়া আঁধার। কিচির মিচির সুরে পাখিরা ডাকছে। পাকুড়ের ডালে বাসায় ফিরছে ওরা।

তোরাব চিত হয়ে আলের ওপর শুয়ে থাকে। চোখ ফেটে গড়িয়ে পড়ে তরল লবণ।

শীতের সূচ নিয়ে রাত এল। পৃথিবীর গায়ে সেলাই করে দিল অন্ধকার। গা-ছমছম বিলের বাতাসে গাছেদের মরা পাতাগুলি ঝরে পড়ছিল। ঘোররাতে আশমানে সিকিফালি মিষ্টি কুমড়োর মতন চাঁদ ওঠে। সে আলো আর কুয়াশায় মাখা তোরাবকে মনে হয় অশরীরি ছীন। তোরাব ভাবছিল, এ দুনিয়া সিনি এত রূপ দিয়ে বানিয়েছেন, ফের তা ধ্বংস করবেন কেন?

সে রাত্রি ছিল ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের। কারণ সে রাতে প্রথম আল্লার বিরুদ্ধাচরণ করেছিল তোরাবালি। আদমকে সেজদা না করার অপরাধে ফেরেস্তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী ইবলীশকে শাস্তি দিয়েছিলেন আল্লা। কারণ ইবলীশ আল্লার বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। আর পৃথিবীর মাটিতে তোরাবালি নামের এক আদম বংশধর আল্লার নির্দিষ্ট ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করে ক্রমে ইবলীশে পরিণত হচ্ছিল। এ কথা সে নিজেও জানতে পারেনি। পৃথিবীর

সেই মধ্যরাতে গৈবী বাতাসের সঙ্গে মিশে যাওয়া চাঁদ ও কুয়াশা সে সবের সাক্ষী ছিল।

(তিন)

ভয়ংকর সেই রাত্রি শেষে তোরাবালি দেখল, একইরকম ভোর হচ্ছে। কিন্তু ওর শরীরে কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল। ক্ষেতে নেমে পরখ করে দেখল চারাগুলো বেশ বড় হয়েছে। কয়েকটা গাছে ফুল ধরেছে।

সেদিন থেকে ওর অভ্যেস হয়ে গেল অদ্ভুত। প্রতিদিন চারাগুলোকে লক্ষ করে ও। ধ্বংসের আগাম কোনও খবর কিছু মেলে কিনা।

একদিন ওর মনে হল, এবার ফল পাড়া যেতে পারে। কারণ এসব তো মানুষের জন্য তৈরি হয়েছে!

ভর দুপুর মাথায় নিয়ে হাজিবাড়ির দরজায় গিয়ে দাঁড়াল তোরাব। বাড়ির কিসান ছবিরুদ্দিন ওর পথ আটকাল, "হাজিসাহেব এখুন বাড়ি নাই, পরে আসবা।"

"কুথায় গেলছে?"

"জানি নাখো।"

"কিন্তুক দরকার ছিল যে।"

"কি দরকার?"

"বুলবা ক্ষ্যাতে বাগুন হয়াছে।"

"হাঁ বুলব।"

"এ হপ্তার চালটুকুন লিব। বাড়ির মানুষকে খবর দাও।"

কিসান লোকটা একটু কী ভেবে নিল, "ঠিক আছ, তুমি ইখানে ডেড়িয়ে থাক। আমি লিয়ে আসছি।"

লোকটা বাড়ির ভিতরে চলে গেল। তোরাব আধখোলা দরজার ফাঁকে ভিতরে আঙিনা দেখতে পায়। কুয়োতলায় জল তুলছে বাড়ির কাজের মেয়ে। উঠোনের একপাশে চাটায়ের ওপর ধানসেদ্ধ শুকাতে দেওয়া হয়েছে। তারের ওপর কাপড় মেলা। কয়েকটা ছানাপোনাসহ বাড়ির মুরগীটা এদিক ওদিক ঘুরছে।

"এই লাও।"

ধামায় চাল এনেছে ছবিরুদ্দিন। কাঁধের গামছাটা দু'হাতে সামনে মেলে ধরল তোরাব। কেজি পাঁচেক মোটা লাল চাল। গরমভাতে বড় সোয়াদ। চাল দেওয়া হয়ে গেলে ধামার পিঠে বাড়ি মেরে ভিতরের চালগুঁড়ো আর ময়লা ঝাড়ল ছবিরুদ্দিন। পিছন ফিরে বাড়ির ভিতর চলে যেতে গেলে কথা বলে তোরাব, "কথাটা হাজিসাহেবকে বুলো কিন্তু।"

বিরক্তিতে মুখ কুঁচকে তোরাবের দিকে ফেরে ছবিরুদ্দিন, "কুন কথাটা?"

"ওই বাগুনের।"

"হাঁ হাঁ বুলব।"

ছবির আর দাঁড়ায় না। লোকটার ব্যবহারে তোরাবের বড় কষ্ট হল। রোজ হাসরের মাঠে আল্লা এর বিচার করবেন।

দুপুর মাথায় বিলপাড়ে ফিরল তোরাব।

পরদিন সকালে হাজিবাড়ি থেকে লোক এল। ঢাকি মাথায় ছবিরুদ্দিন। অন্যজন ওর মামু। হাজির খোলানে খাটে। পাকুড়তলায় দাঁড়িয়ে সে বলল, "হাঁ রি মামু ই যে দেখি জ্বীনের কাণ্ড। শালা ডহর মাঠে কী ফলন করাছে রে বাপ!"

ছবির বিড়িতে ফুক ফুক টান দিল, "শালো কী আর ইনশান নাকিন। পাক্কা ইবলীশ। সুরৎখান দ্যাখ ধিনি......"

ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলল লোকটা। চোখ মেলে দিল ক্ষেতের দিকে। ভুঁইয়ের মাঝে ভাবনায় বুঁদ হয়ে বসে থাকা তোরাবকে দেখে বলল, "কী এত ভাবনা করে বুল দেখিন?"

"কী জান?"

"চ ভুঁইয়ে নামি।"

ওরা ক্ষেতে নামল। সামনের গাছ থেকে চটপট ক'টা বেগুন ছিঁড়ে নিল। ভয় পেয়ে উড়ে যায় একটা হরিয়াল। তোরাব মাথা তুলে ওদের দেখতে পেল, "খবদ্দার গাছে হাত দিবা না বুলছি।"

তোরাবের চিৎকারে ঘাবড়ে গেল ওরা, "ক্যানে কী হয়াছে?"

ক্ষেতের গাছগুলো সাবধানে বাঁচিয়ে ছুটে এল তোরাব, "ফ্যার বুলছি হাত দিবানা গাছে।"

"আমরা হাজির কিসান। চিনতে পারছ না তুরাবভাই।"

"হাঁ হাঁ চিনাছি। কিন্তুক গাছে হাত দিবানা বুলে দিছি।"

"হাজি বুলেছে বাগুন লিয়ে হাটে যেতে। তার লেগে এসাছি।"

"হাজি বুলুক। ক্ষ্যাত থিকা উঠো।"

তোরাব বুঝি ক্ষেপে গেছে। চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে। গর্দানের শির ফুলে ঘাড়টা টান টান। সারাদেহ থর থর করে কাঁপছে, "উঠ শালোরা।"

ভাবুক মানুষ যে হঠাৎ এমন সুরৎ নিয়ে পারে হাজির কিসান দু'জনের জানা ছিল না। ওরা ভয় পেয়ে ক্ষেত ছেড়ে আলে ওঠে, "কিন্তুক হাজিকে কী বুলব?" সাহস করে বলল ছবির। তোরাব ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়। একবার লোক দুটোকে দেখে নিল। তারপর হাতের দাউলিটা ক্ষেতের মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিল, "ঢাকি লিয়ে আস।"

ওরা ঢাকি আনে। ক্ষেত থেকে বেছে বেছে অতি সাবধানে বেগুন তোলে তোরাব। ঢাকিটা ভর্তি হলে বলল, "লিয়ে যাও।"

ঢাকি ভরা বেগুন মাথায় তুলল ছবিরুদ্দিন। ওরা হাঁটা দেয় হাটমুখো।

(চার)

শীতের মাঝামাঝি এক সকালে ভুঁইয়ে নেমে অবাক হয়ে গেল তোরাবালি। চারাগুলো এখন পূর্ণবয়স্ক। গাছে গাছে ঝুলে রয়েছে নধর বেগুন। গাছগুলো ঘন আর কোমর ছাড়িয়ে গেছে। ক্ষেতের দিকে তাকালে মনে হয় না কোনওদিন এখানে চাষির হাত পড়েনি। যেন কতকাল এমনই রয়েছে বিলপাড়ে এই ক্ষেত।

প্রতিদিন গাছগুলোকে নজর করে দেখা তোরাবের অভ্যাস। কিন্তু সেই সকালে চমকে উঠল ও। সূর্যের আলোয় যা দেখল তা বিশ্বাস করতে পারছিল না তোরাব। গাছগুলোর পাতা ক্ষুদে ক্ষুদে পোকাতে ছেয়ে গেছে। সুতোর মতন দেখতে পোকাগুলো। 'দয়ে' পোকা ধরেছে। কাল সাঁঝবেলাও ছিল না পোকাগুলো। একরাত্রে লক্ষ লক্ষ এ পোকা এল কোথা থেকে? তোরাব এবার সত্যি ভয় পেল। তবে কি কেয়ামত এসে গেল! মহা ধ্বংসের এ এক নতুন আলামত দেখতে পেল তোরাবালি।

পাগলের মতন ক্ষেতের চারদিকে ছোটাছুটি করে গাছগুলোকে পরখ করছিল তোরাব। না, একটি গাছও রেহাই পায়নি। সমস্তই ভরে গেছে সেই ক্ষুদে পোকাগুলিতে। তোরাব ভেবে পাচ্ছিল না কিছুই। কীভাবে বাঁচাবে সে এই ক্ষেতটুকু!

আলের ওপর পা ছড়িয়ে বসে পড়ে তোরাব। চারদিক শূন্য মনে হয়। কোনও দৃশ্যই আর ওর মন টানে না। আল্লা এভাবেই সীমা লঙ্ঘনকারীকে শাস্তি দেন! তোরাব ভাবে, 'হে খুদা জীবনে অন্যায্য কাজ করিনি। তবু এ কোন্ আলামত দেখাও হে মালিক?'

ভাবতে ভাবতে কেঁদে ফেলে ও। সারাক্ষেত ওপর থেকে জলজ্যান্ত সবুজ দেখায়। অথচ গোপনে পোকাগুলি চুষে নিতে থাকে পাতা ও কাণ্ডের রস।

শীতের মাঝবেলার রোদ তোরাবের পিঠের চামড়ায় বাদামি বর্ণ ধারণ করে। বিলের শুকিয়ে আসা পানি ও কাদায় একটা বক তখন একপায়ে ঘুমোয়। আর তোরাব ভুলে যায় খিদে বা তৃষ্ণা।

এভাবে বেলা কাটে। দিন যায়। এবং সহসা নাবাল জবিতে হাজির হন চৌধুরি সাহেব। বলেন, "খবর নিতে এলাম গো তোরাবালি। এভুঁইয়ের ফলের হকদার নই। কিন্তু যখন ফল দিলে তার পয়সা তো আমার হয় না হে। ও আমি মসজিদে দিয়ে দিয়েছি। এখুন বল কাজখান ঠিক কিনা?"

হাজিসাহেব তাকিয়ে থাকেন তোরাবের মুখে। বোবা চোখে চেয়ে আছে লোকটা। সে দৃষ্টিতে আহত এক নিরীহ পশুকে দেখতে পান হাজিসাহেব। এই মানুষ কিনা এমন ক্ষেত গড়ে! ডহর জমিকে করে তোলে ফলবতী! জমি হয়ে ওঠে প্রাণের সঞ্চারী! বড়ই আশ্চর্যের কথা, হাজিসাহেব ভাবেন। সবই কুদরতের খেলা। ছয়দিনে সৃষ্ট এ দুনিয়া আল্লার জন্য মানুষের এবাদত ভূমি। এই সব ভেবে পুলকিত হন হাজিসাহেব। আর তোরাব সহসা ডুকরে কেঁদে ওঠে। যেন একটি আহত পশু কঁকিয়ে ওঠে যন্ত্রণায়।

"একি কর বাপধন, কাঁদ কেন?"

বিস্ময় হাজিসাহেবের পুলকিত মনে হঠাৎ বিষাদ এনে দেয়।

"সব শ্যাষ হয়া গিছে গো। সব শ্যাষ হয়া গিছে।"

কান্নার এ বুকফাটা স্বরে চমকে ওঠে বিলপাড়ের একঠেঙে বক। চমকে ওঠেন হাজিসাহেব, "কী শেষ হয়ে গিয়েছে? কিগো মুখ খুলো না কেন?"

জবাবের বদলে একটানা ডুকরাতে থাকে তোরাব। প্রকৃতির সকল শব্দের ভিতর যুক্ত হয়ে যেন তুমুল বর্ষণ শুরু হয়েছে। এ হেন দৃশ্যে হাজিসাহেব বিব্রত হন। ভাবেন, সত্যিই লোকটা বড় ছিটেল। না হলে এমন কাঁদে কেন? তোরাবের পিঠে হাত রেখে সান্ত্বনা দেন হাজিসাহেব, "কেঁদ না বাপ, বড় মেহনত করেছ বটে। এ তোমার আল্লার কাছে নেকি হয়ে আছে ব্যাটা। খেদ কোরো না। তিনি সব বিচার করেন।"

তোরাব বসে পড়েছিল মাটিতে। চোখের পানি যেন থামতেই চায় না।

"খুদা আমার বিচার করাছে গো হাজি। বুলেন নালে ক্যানে গাছে পুকা লাগে?"

"পোকা!"

বিস্মিত ভয়ে হাজি চমকে ওঠেন, "পোকা!" ফের উচ্চারণ করেন কথাটা। তারই জের ধরেন, "কোথায়?"

"ভুঁইয়ে লেগাছে। আজই দেখনু।"

তোরাব হাতের পাতায় চোখের পানি মোছে। হাজিসাহেব ক্ষেতের দিকে তাকালেন, "কিছুই বুঝা যায় না বাপ।"

ভুঁইয়ের মাঝে কাকতাড়ুয়ার দিকে হাজিসাহেব তাকিয়ে থাকেন।

"কেয়ামত আসে গেল গো।"

তোরাবের গোঙানো স্বরে ফের চমকে ওঠেন হাজিসাহেব, "কেয়ামত!" তবে কী সত্যই লোকটা ইবলীশের দোস্ত। এমন করে কেয়ামতের খবর দেয়, বুঝি সত্যই ধ্বংসের অলামত তবে দেখা দিল পৃথিবীতে? হাজিসাহেব ভয় পান। অসহ্য মনে হয় চতুর্দিকের প্রাকৃতিক পরিবেশ। আর তাঁর সামনে কোনও ভাবুক বা সামান্য ছিটেল নয়। লোকটা সত্যই ইনসান নয়! হাজিসাহেব মনে মনে আল্লাকে ডাকেন, "বাঁচাও হে খোদা।" চোখ বুঁজে তিনি ইহজীবনের সকল গুণাহর জন্য আল্লার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তারপর ভয়চকিত পায়ে গাঁয়ের দিকে

হাঁটা দেন।

সবুজ বেগুনের ক্ষেত এখন মড়কভূমি। পাতাগুলির গা থেকে রস শুষে খায় পোকারা। সবুজে পাতায় এখন মাকড়সার জালের মতন তন্তু দেখা যায়। নিহরের কণাগুলি ধরে রাখতে পারে না পাতা।

তোরাবালি দেখে, মেহনতের ফসল পোকাদের দখলে। সমস্ত গাছের গায়ে কিলবিল করে কীট। অজস্র ক্ষুদে পোকা ধ্বংস করে মানুষের মেহনত। তোরাব ভাবে, কীভাবে রক্ষা করা যায় এমন সৃষ্টি।

সকালবেলা একে একে শুকিয়ে আসা গাছগুলো তুলে ফেলে তোরাবালি। শুকনো গাছগুলো সারাদিন আলের ওপর জড়ো করে। মাঝ রাতে জড়ো করা স্তূপাকার গাছগুলোতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। আগুনের তাপ পেয়ে এতদিন যে শরীর প্রবল জাড় সহ্য করেছে, সেই শরীরেই জাড় অনুভব করে তোরাব। হু হু বাতাসে আগুনের শিখাগুলো এলোমেলোভাবে কাঁপে। ঐ আগুন নিজের বুকেও টের পায় তোরাব। ভাবে, আল্লা এভাবেই শাস্তি দেন। এও কেয়ামতের এক আলামত। কিন্তু আল্লা কি এতই নিষ্ঠুর? কেঁদে ফেলে তোরাবালি।

আকাশে একটি রাতচরা পাখি উড়তে থাকে। পথ হারিয়ে ফেলা পাখি তোরাবের মাথার আকাশে আশ্রয়ের জন্য চক্কর দেয়।

খুব ভোরে নিভে যাওয়া আগুনের ছাইকুণ্ড থেকে ছাই তুলে যত্নে ক্ষেতের গাছগুলোর পাতায় ছড়িয়ে দেয় তোরাবালি।

(পাঁচ)

শীত শেষের মুখে এক নিহানে ক্ষেতে নেমে ফের অবাক হয়ে গেল তোরাবালি। দেখল, গাছগুলো আবার সবুজ হচ্ছে। একটি গাছেও আর পোকাদের দেখা মেলে না। আনন্দে চিৎকার করে ওঠে তোরাবালি। মনে হয় যেন অদিম কোনও মানুষ শব্দময় আনন্দধ্বনি জানাচ্ছে। ক্ষেতের চারপাশ ঘিরে ছুটে বেড়ায় তোরাব।

সারাদিন ক্ষেত নিয়ে মেতে থাকে ও। বেশ কিছু গাছে ফুল ধরেছে। আবার বেঁচে উঠেছে ক্ষেতটা।

সন্ধে নামে বিলপাড়ে। মিহিন ধোঁয়ার মতন কুয়াশা ঢেকে দেয় চারদিক।

তোরাব ভাবে, খবরটা হাজিসাহেবকে জানাতে হবে। গাঁয়ের দিকে হাঁটে তোরাব। কিন্তু টলমল করে পথ। মাথার ভিতর টিপটিপ ব্যথা। শরীরে প্রবল জ্বর। জাড়ে কুঁকড়ে যায় তোরাব। কাশি হয়। বুকে বড় টান লাগে।

হাজিসাহেবের খানাঘরে হাজির হয় তোরাব। হাজিসাহেব তখন সাঁঝবেলার নামাজ সেরে সবে ফিরেছেন। তোরাবকে দেখে চমকে ওঠেন। হেরিকেনের মৃদু আলোয় কঙ্কালসার তোরাবকে দেখে হাজিসাহেব ভয় পান, "কে রে তুই? তোরাবালি না?"

"জি।"

"কী চাস?"

"হাজিছাব, ক্ষ্যাত বুঝি ফার ফল দেয় গো।"

"অ্যাঁ!"

বিস্ময়ে হাজিসাহেবের গলা কেঁপে ওঠে।

"জি হাঁ। পুকাগুলান আর নাই গো।"

"পোকা নাই? কী খবর শুনাস বাছা, বড়ই আশ্চয্যি!"

"কাল বিয়ানবেলা যেয়েন। দেখভেন, আমি গেনু।"

তোরাব আর দাঁড়ায় না। শরীর ভেঙে পড়তে চায়। কাশিতে দমবন্ধ হয়ে আসে। ক্ষেতে তাকে ফিরতেই হবে।

বড় কষ্ট করে বিলপাড়ে ফিরে আসে তোরাব। জ্বরের ঘোরে শুয়ে পড়ে আলের ওপর।

শীতরাতের মধ্য আকাশে কুয়াশার লেবাস ছিঁড়ে গোল একখানা চাঁদ ওঠে। ফিকে জ্যোৎস্না আর কুয়াশায় সারা মাঠ মাখামাখি হয়ে যায়।

কাশিতে দম আটকে আসে তোরাবের। মুখ থেকে তরল কিছু উঠে আসে। হাতের চেটোয় ঠোঁট মোছে তোরাব। জ্যোৎস্নার আলোয় দেখে হাতের চেটো লাল হয়ে গেছে।

ঠিক তখন আলের ওপর এসে দাঁড়ান হাজিসাহেব। ডাক দেন, "কোথায় গেলা গো বাপ তোরাবালি?"

তোরাব সাড়া দিতে চায়। কিন্তু কাশির দমকে বুক থেকে শুধু রক্ত উঠে আসে। চোখ বুঁজে আসে। বড় ঘুম পায় ওর। ও ঘুমিয়ে পড়ে। মাঠের আকাশ থেকে ঝরে পড়ে নিহর। তোরাবের বুকের ভিতর জমে থাকা আগুন শীতল করে নিহরের জলকণাগুলি।

হাজিসাহেব কাছে আসেন। বলেন, "কিগো বাপ সাড়া দাওনা কেন?"

তবু সাড়া দেয় না তোরাবালি। হাজিসাহেব ওর গায়ে হাত দেন। ভয়ে পিছিয়ে যান। ঠাণ্ডা, শক্ত হয়ে গেছে তোরাবালির শরীর।

মাঠের পথে ফিরে চলেন হাজিসাহেব। মাঝপথে এসে তাঁর বুকের ভিতরটা ফাঁকা মনে হয়। হাজিসাহেব তখন চিৎকার করে ওঠেন, "কেয়ামতের দেরি আছে বাপ...."

হাজিসাহেবের দুই চোখ ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। তিনি কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না।

আধুনিক বাংলা গান : একটি পর্যালোচনা

সুভাষ বাগচী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

উপরোক্ত ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথই ছিলেন বাংলা আধুনিক গানের ক্ষেত্রে প্রথম কম্পোজার বা সঙ্গীতস্রষ্টা। তুলনামূলক বিচারে সলিল চৌধুরি, আমার মতে 'সুরস্রষ্টা' অর্থে অবশ্যই একজন কম্পোজার, কিন্তু তাঁকে সঙ্গীতস্রষ্টা' বলতে পারছি না। কারণ, গীতিকার হিসাবে, সামান্য কয়েকটি গান বাদ দিলে, আধুনিক গীতিকবিতাকে, তাঁর যুগ অনুযায়ী, প্রত্যাশিত মানে নিয়ে যেতে পারেননি। কিন্তু গীতিকবি হিসাবে সীমাবদ্ধতা থাকলেও, সুরের ক্ষেত্রে, রবীন্দ্রোত্তর যুগে, কাঠামো ও চলনগত একটি বাঁক এনেছেন নিঃসন্দেহে। 'সলিলীয়' সুরের একটি ধারা এনে বাংলা আধুনিক গানকে একধাপ এগিয়ে দিয়ে তাঁর সাঙ্গীতিক প্রতিভার অনন্যতা প্রমাণ করেছেন—সঙ্গীতের জগতে — ভারতীয় আধুনিক গানের জগতে। গীতিকার হিসাবেও, সমকালীন গীতিকারদের তুলনায় তিনি অনেক বেশি বাস্তব, প্রাসঙ্গিক ও যুগোপযোগী ছিলেন, আধুনিক ছিলেন। যদিও ভাবে যতটা, ভাষায় নয়। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যেমন —সলিলবাবুর সঙ্গীত জীবনের যে সময়টা গণনাটো কেটেছে বেশির ভাগ ব্যক্তিকমী গানগুলিই বলতে গেলে সে সময়েই তৈরি। এবং সে গানগুলি কথার বিচারেও দৃষ্টান্তমূলক। যেমন, 'কোন এক গাঁয়ের বধূ', 'ও আলোর পথযাত্রী' ইত্যাদি। 'কোন এক গাঁয়ের বধূ' গানটির কথা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে এই কারণে যে এই গানটিই বাংলা আধুনিক গানে 'সলিলীয়' বাঁকের প্রথম দিকচিহ্ন। কিন্তু গণনাটা ছেড়ে বেরোবার পর — যখন মতাদর্শগত অঙ্গীকারবদ্ধতার ঘোর কেটে গেছে এবং রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও দেশপ্রেমগত সমস্যা ও সঙ্কট অধ্যুষিত বিষয়বস্তু নিয়ে গানের কথা লেখার তাগিদ তিনি আর পাচ্ছেন না — 'প্রান্তরের গান আমার', 'যারে যারে উড়ে যারে পাখী', 'আমি ঝড়ের কাছে রেখে গেলাম আমার ঠিকানা' ইত্যাদি কয়েকটি খুব হাতে গোনা গান বাদ দিলে বাকি অধিকাংশ গানের কথাই তাঁর আগের গানগুলির তুলনায় যথেষ্ট দুর্বল, ভাবে ও ভাষায়। অর্থাৎ, সলিল যখন তাঁর রাজনৈতিক জীবনের গণ্ডী টপকে বৃহত্তর জীবনে এসে পড়লেন, জীবনের অনুষঙ্গ গেল বেড়ে — কি ব্যাপ্তিতে কি গভীরতায় — তখনই ধারাবাহিকতায় পড়ে ছেদ। আর ঠিক এই সময় থেকেই তাঁর মধ্যে এক দিশেহারা ভাব লক্ষ করা যায় যেটা তাঁর পরবর্তী গানগুলির কথার এলোমেলো ভাব ও ভাষায় পরিস্ফুট। সলিল বাবুর দোষ নয় এটা। কারণ, মূলত উনি কবি নন — সুরকার। অবশ্যই কবিমনস্ক; তাই, যখন তিনি লেখেন : 'ক্লান্ত ডানায় নীড় খুঁজি / অথৈ নদীর তীর খুঁজি / শুধুই আমার যায় বেলা / ভাসায়ে আশার ভেলা / অন্তর্হীন পথের পুঁজি / অন্তরেরই সান্ত্বনা' —তখন, এই গীতিকবিতার অনন্য বিষয় সুর বাতাসে ছড়িয়ে দেয় স্বপ্নভঙ্গের হাহাকার; শ্রোতার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে ওঠে। আর শেষের লাইন দুটিতে তো তিনি সত্যিই কবি, চিরায়ত এক সত্যের সফল উচ্চারণে। ভাষায় না হোক, ভাবে অনুভূতিতে সংবেদনশীলতায় যখন সলিল চরম আন্তরিক তখন তিনি লিখেন — 'ওগো, তুমি বুঝি মোর বাঙলা / আমরা জীবনধন সাধের সাধনা / তোমায় কে দিয়েছে বাথা আমায় বলোনা / সুনীল নয়ন কেন গো ছলোছল /' —'শ্যামলবরণী ওগো কন্যা' গানটির এই শেষ স্তবকটি দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের সেই সময়কার জলদ-বিষণ্ণ কণ্ঠে শুনে কার না চোখ ভেজে, ঠিক যেভাবে 'অপরাজিত' চলচ্চিত্রে ইন্দ্রুলে পড়া দ্বিতীয় অপুর কণ্ঠে 'এই আমাদের বাঙলা দেশ, আমাদেরই বাঙলা দেশ' পংক্তিগুলির আবৃত্তি এক স্নিগ্ধ বিষণ্ণতায় ভিজিয়ে দিয়েছিল জাঁদরেল ইন্স্পেক্টরের (মণি শ্রীমানি) চোখের পাতাজোড়া, ও সেইসঙ্গে আমাদেরও? এইভাবে দেখা যায়, ভাবে-ভাষায় আধুনিক গীতিকবিতার প্রয়োজনীয় শর্তগুলি পূরণে বহু খামতি নিয়েও তাঁর যুগে সলিল চৌধুরি অতুলনীয়। তাঁর কাব্যমনস্কতা, অন্তর্লীন সংস্কৃতি, রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও সংস্কৃতির রাজনীতির দ্বন্দ্ব ও সর্বোপরি, মানুষ ও কাব্যের প্রতি কোথায় যেন এক অঙ্গীকারবদ্ধতা, তাঁকে তাঁর আগের সমকালীন ও পরের প্রায় সমস্ত ফরমায়েশি গান লিখিয়েদের থেকে স্বতন্ত্র রেখেছে। সমকালীন গীতিকারোবার প্রশ্নে তাঁর কাব্যগুণের তুলনা করতে হলে আমাদের বেছে নিতে হয় তাঁরই লেখা আগের গানগুলো।

আধুনিক কবিতা নিয়ে আধুনিক বাংলা গান

এবার, একটা ঘটনা লক্ষ করা যাক। একজন মূলত কবির কবিতায় বা গীতিকবিতায় সুপ্রযুক্ত 'আধুনিক' সুর প্রয়োগ করে, হেমন্ত বা সন্ধ্যার মতন পূর্বাপরহীন অনন্য শিল্পী দিয়ে যদি

গাওয়ানো হয় তাহলে যে কি অমর সাঙ্গীতিক সৃষ্টি হয় তা এই চারটি গান দেখলেই, মানে শুনলেই, বোঝা যায়—১। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা 'পাল্কির গান', ২। সুকান্তের 'রানার', ৩। সুকান্তরই 'ঠিকানা', ৪। বিমলচন্দ্র ঘোষ ('মৌমাছি'-খ্যাত)-এর 'উজ্জ্বল একঝাঁক পায়রা'। প্রথম তিনটি কিন্তু কবিতা হিসাবেই কবিরা লিখেছেন। পরে গান হয়েছে। ছন্দের কবি নামে খ্যাত সত্যেন্দ্রনাথের কবিতাটিতে যে 'ছন্দ' আছে, গীতিকবিতার সেই অন্যতম উপাদানটিই সলিলবাবুর মতন ইনোভেটিভ সুরস্রষ্টার কাছে যথেষ্ট ছিল। তারপর যা ঘটল তা তো ইতিহাস। সলিলবাবুর অসাধারণ সুরপ্রয়োগে স্কুলপাঠ্য সুন্দর বর্ণনামূলক পদ্যটি 'পালকির গান' হয়ে আজও জীবন্ত প্রতিটি বাঙালির মনের মণিকোঠায়। এবং থাকবেও অনেকদিন। পরের দুটি — সুকান্তর লেখা, পুরোপুরি আধুনিক কবিতা। গানের কথা মাথায় রেখে কবিতা দুটি লেখা হয়নি। সলিলবাবুর অভিনব মাত্রা-নির্দেশে কবিতাগুলিতে এসেছে গানের ছন্দ। তারপর সেগুলিতে যুক্ত হয়েছে অনবদ্য সুর যা তার আগে কখনও শোনা যায়নি। নতুন ধরনের কথার সঙ্গে এক ক্লিশেমুক্ত 'অন্য' ধারার সুরের সংশ্লেষে আমরা দুটি আদ্যন্ত আধুনিক কবিতাকে রূপান্তরিত হতে দেখলাম আধুনিক গীতিকবিতায়, এবং নির্মিত হতে দেখলাম দুটি ঐতিহাসিক বাংলা আধুনিক গান। আর ঠিক এখানেই ঘটেছে সঙ্গীতেতিহাসের ঐতিহ্যে একটি নতুন ধারার সংযোজন যার চলা শুরু 'কোন এক গাঁয়ের বধূ' গানটি সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। একমাত্র চতুর্থ গানটিই গানের কথা মাথায় রেখে লেখা। লিখেছেন এমন একজন, যিনি প্রথম সারির না হলেও মূলত একজন কবি। আর, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের সুরোজ্জ্বল কণ্ঠের গাওয়া স্পন্দন-আবিষ্ট 'উজ্জ্বল একঝাঁক পায়রা'তো বিশ্বসঙ্গীতের দরবারে 'সলিলীয় সঙ্গীতের' দূতপক্ষী।

উপরোক্ত গান চারটির দৃষ্টান্তমূলক সাফল্য ও ব্যতিক্রমী হওয়ার পেছনে ভাব ও ভাষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। যথার্থ আধুনিক গানের স্রষ্টাকে, তিনি যত বড় মাপের সুরকারই হোন না কেন, একজন উন্নতমানের সফল আধুনিক কবিও হতে হবে তাঁর গানকে সর্বত্রগামী করতে গেলে। অন্যথায়, তিনি অন্য কোন কবির কবিতার সাহায্য নিতে পারেন ; যেমন আমরা পূর্বোল্লিখিত চারটি গানে দেখেছি। ঐ গানগুলির সাফল্য একটা জিনিস কিন্তু আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিল যে, সুকবি আর প্রতিভাবান আধুনিক সুরকারের পারস্পরিক সান্নিধ্য আধুনিক গানকে 'ভাবের কর্ষণ' করতে কতটা মনোযোগী ও উদ্যোগী করে তুলতে পারে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, ঘটনাগুলিকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবেই দেখা হয়েছে; দেখেছেন আমাদের বিশেষত তদানীন্তন কবি-সুরকাররা। অন্যথায়, যদি এই ঘটনাটি দুই পক্ষের উপলব্ধিজাত বোধ থেকে একটি সফল প্রক্রিয়া হিসাবে ধরা দিত, তাঁরা যদি বাংলা আধুনিক গানের ভাব-ভাষাগত দেউলিয়াপনায় উদ্বিগ্ন হতেন, বাংলা গানের ব্যাপারে একটু মনোযোগী হতেন, সমালোচকেরা একটু আধুনিকতায় শিক্ষিত ও দায়িত্বশীল হতেন, তাহলে আজ অজয় দাস-বাপী লাহিড়ী বা অনামী 'হরিপদ'-দের সুরাঘাতে আমাদের এভাবে বিপর্যস্ত হতে হত না।

অর্থপূর্ণ, তাৎপর্যময় ও ভাবযুক্ত আধুনিক কথাকে সুরে বাঁধার চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ না করলে সলিল চৌধুরি, এই প্রতিভা নিয়েও, সুরের ধারায় কাঠামোগত সেই পরিবর্তনটি আনতে পারতেন না যা আজ 'সলিলীয় ধারা' হিসেবে অনন্যতার স্বীকৃতি পেয়েছে সর্বস্তরের শ্রোতামানসে। কথার ওজনই তো সুরকে টানে তার ভরকেন্দ্রের দিকে। এই টান বিনা উচ্ছল প্রগল্ভ সুরকে সুরকার বাঁধবেন কীসের জোরে ? আর টানেই তো সুর বাঁক নেয় তার গতানুগতিক ঐতিহ্যবাহী খাত থেকে অন্য দিকে। বিহ্বল সেই সুরকে সুরস্রষ্টা তখন দেন সেই উপযুক্ত কাঠামো যা তাঁর বহু ভাবনায়, বহু কষ্টে অর্জিত; যা তাঁর অনেক-এক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় পাওয়া ফসল। শুনেছি, প্রতিভাবানরা প্রতিভার মাপের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁদের দুর্বলতা, সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধেও সচেতন থাকেন। কিন্তু সলিল চৌধুরি এ ব্যাপারেও ব্যতিক্রম ছিলেন। সত্যিই যদি তিনি 'জাইট্‌গিস্ট'কে তাঁর মননে উপলব্ধিতে ধরতে পারতেন তাহলে 'রানার'-এ সুর করার পর 'না, যেও না' আর 'মনের জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে গেছে'-এর মতন গান তৈরির দিকে না গিয়ে তাঁর সুরের যোগ্য কথা খুঁজতেন আধুনিক কবিদের কবিতায়। জীবনানন্দ-প্রেমেন্দ্র-সুভাষ প্রমুখ সে যুগের কবি থেকে শুরু করে শঙ্খ-সুনীল-শক্তি-শরৎ হয়ে আজকের নির্মল-জয় ইত্যাদি পর্যন্ত অনেকেরই কবিতার গীতিরূপ তিনি দিতে পারতেন। তাঁর প্যাশন তাঁকে দিয়ে দাবি পেশ করাতো বাংলার আধুনিক কবিদের কাছে গীতিকবিতা লেখার জন্য। সলিলবাবুর মতন অনন্য প্রতিভার সৃষ্ট গানের জন্য কথা লেখার দাবি, আমার আশা, সলিলদাকে যাঁরা ভালবাসেন তাঁদের বিশ্বাস, বাংলার কবিরা কেউ কেউ নিশ্চয়ই রাখতেন। দুঃখে-কষ্টে সেদিন বুক ফেটে যাচ্ছিল যেদিন দূরদর্শনে সাঁওতালি লোকগীতির ছাঁচটির মধ্যে শঙ্খ ঘোষের সেই বিখ্যাত 'যমুনাবতী' কবিতাটি ফেলে দিয়ে এক সুরকার কাম গায়ক তার অসংস্কৃত কণ্ঠে ওটিকে দুরমুশ-পেটা করছিলেন ; ভাবছিলাম, যে শহরে সলিল চৌধুরি থাকেন সেই শহরের বাসিন্দা হয়ে 'যমুনাবতী'র এই দুর্গতি আমাদের দেখতে হচ্ছে। 'নিভন্ত চুল্লীতে' আগুন দেবার লোক থাকতেও নেই। আগেও দেখতে, থুড়ি, শুনতে হয়েছে 'হায় চিল, সোনালী ডানার চিল'-এ মৃত জীবনানন্দের আত্মার কান্না। এ প্রসঙ্গে সুধীন দাসগুপ্তের সুরে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সাগর থেকে ফেরা' গ্রন্থের 'সবুজের ছোঁয়া কিনা তা বুঝিনা' কবিতাটির অনবদ্য সুরটি স্মর্তব্য। প্রতিভাবান

সুরকারের সুরে সুকবির কবিতা যে কীরকম অবিশ্বাস্যভাবে মূর্ত হয়ে উঠতে পারে তার আর একটি বিশ্বস্ত সাক্ষ্য এই গানটি। সলিল চৌধুরি কি পারতেন না শক্তির 'পিছনে জল অথৈ, আর সামনে আছে যারা' বা 'অবনী বাড়ি আছো'-র সুর করতে ? অবশ্যই পারতেন। কিন্তু অগণিত বাঙালি শ্রোতার সে সৌভাগ্যকে বানচাল করে বাংলা গানে 'কোন একগাঁয়ের বধূ', 'রানার', 'আমার প্রতিবাদের ভাষা', 'পালকির গান' ইত্যাদির সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে যে 'সলিলীয় ধারার' শুরু ও অগ্রগতি, যে কোন কারণেই হোক না কেন, পরবর্তীতে, 'মধুমতি' খ্যাত সলিল চৌধুরির সঙ্গীত সৃষ্টিতে সেই অনন্য অননুকরণীয় ধারার নিরন্তর বহমানতার অভাব দেখা গেছে।

সলিল চৌধুরির সমসাময়িক সুরকারগণ

সুরস্রষ্টা সলিল চৌধুরির সমসাময়িক নচিকেতা ঘোষ, রবীন চ্যাটার্জী, অনুপম ঘটক, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, সুধীন দাশগুপ্ত, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র — এঁরাও সুরকার হিসাবে অবশ্যই উল্লেখের দাবি রাখেন। পরিচিত কাঠামোর মধ্যে সুরের বিবিধতায় নচিকেতা ঘোষের নাম বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। সত্যিকথা বলতে কি এঁরা প্রত্যেকেই প্রতিভাবান সুরকার এবং স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। বাংলা আধুনিক গানের সুরের শরীরটি এঁরা সাজিয়েছেন বিবিধ রত্ন-খচিত অলঙ্কারে। তাতে সালঙ্কারা বাংলা গানের জৌলুস যে অনেকগুণ বেড়েছে সন্দেহ কি ? জৌলুসের ধার এতটাই যে আজও 'গানে মোর কোন ইন্দ্রধনু' বা 'মায়াবতী মেঘে এলো তন্দ্রা'—এসব গান শুনলে অদ্ভুত এক সুখানুভূতি মনকে আবিষ্ট করে — প্রাক্তন রূপসী প্রেমিকার সাক্ষাতে যেমন হয়। শ্রবণেন্দ্রিয়ে তা এখনও এত 'মিষ্ট শুনায়'। কিন্তু দামী গয়না পরা এ-গান আসলে যেন সেই সুন্দরী সালঙ্কারা মূর্খ জমিদার-রক্ষিতার মতন যার নারীসুলভ কমনীয়তা আর কপট-ব্রীড়ায় মাখা চাহনির তির্যক কটাক্ষের আয়ুধ সৃষ্টি করে ভালবাসার এক কাঙ্খিত বিভ্রম — আশপাশের পুরুষরা যাতে আচ্ছন্ন থাকে বহুকাল। প্রেম কপট জেনেও যারা তাতে আবিষ্ট থাকতে ভালবাসে। শরীরের নিয়ন্ত্রিত দোলায় কামনোদ্দীপক, ওষ্ঠের ঈষৎ কুঞ্চনে লোভনীয়, চাহনির তির্যক কটাক্ষে বিপজ্জনক, কৃত্রিম উচ্চারণের কপট সপ্রতিভতায় চকমকে সুন্দর মুখের 'ইন্দ্রানী' বা 'সাগরিকা'-র নায়িকার পরিবর্তে সঙ্কট-জর্জরিত বাঙালি মধ্যবিত্তের তখনই (আজ তো বটেই) প্রয়োজন ছিল 'মেঘে ঢাকা তারা'র সেই অর্ধেক আকাশ জুড়ে থাকা নারীকে যাকে কাছে পেলে, পাশে পেলে ভ্রম নয়, ভরসা হয় ; যে মানুষের মতনই ত্যাগ স্বীকার করে পাশের মানুষকে ভালবাসার জন্য — সন্ন্যাসীর মতন নয় ; ত্যাগ স্বীকার করেও বাঁচার সুতীব্র আকাঙ্ক্ষায় দর্শকদের অন্তরাত্মা বিদীর্ণ করে চিৎকার করে জানায় — 'দাদা, আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম।' এ চরিত্র ভিতর থেকে নাড়িয়ে দিয়ে আমাদের বোধের পুনর্বিন্যাস দাবি করে। মননে ঘটায় নিঃশব্দ রক্তক্ষরণ। নচিকেতা-রবীন-হেমন্তদের সুর করা আধুনিক গান ঐ 'ইন্দ্রানী'-'সাগরিকা'-র নায়িকার মতন প্রলুব্ধ করেছে, 'মেঘে ঢাকা তারা'-র নায়িকার মতন দিক্‌ভ্রান্ত বৃদ্ধ বা বেকার যুবকের পাশে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়নি ভরসার প্রতীক হয়ে। যেহেতু এঁরা কেউই গীতিকার নন তাই, হয়ত, সরাসরি এঁদের দায়ী করা যায় না। কিন্তু মৃণাল সেনের 'নীল আকাশের নীচে' ছবিটিতে 'নীল আকাশের নীচে এই পৃথিবী/আর পৃথিবীর পরে ঐ নীলাকাশ / তুমি দেখেছো কী ?' — এইরকম একটি ভাবপ্রধান ব্যতিক্রমী কথায় অসাধারণ বাঙ্ময় সুর দেবার পরিতৃপ্তি উনি (ঘটনাচক্রে যিনি 'কোন এক গাঁয়ের বধূ', 'রানার' ইত্যাদিরও বিকল্পহীন গায়ক) দ্বিতীয় বার কেন পেতে চাননি ? এই প্রশ্নের দ্ব্যর্থহীন সাহসী উত্তরের মধ্যেই নিহিত আছে নচিকেতা-রবীনদের মতন স্বনামধন্য সুরকারদের শূন্যগর্ভ কথামালাকে একের পর এক অবিস্মরণীয় সব সুরে গেঁথে ফুরিয়ে যাবার ইতিবৃত্ত। আধুনিক মানুষ ও সময়কে ধরার মতন আধুনিক গীতিকবিতার অন্বেষণ না করে অনাধুনিক ভাষায় লেখা ভাবহীন ভাবনাহীন কথাতে সুর বসিয়ে যে 'আধুনিক গান তাঁরা রচনা করেছেন, তার ঐতিহাসিক মূল্যায়ন, সময় আজ নয়ত কাল করবে। কথায় কথায় 'মেঘে ঢাকা তারা'-র মতন অনন্য একটি ছবির কথা চলে আসাতে একটি বিশেষ ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের উল্লেখ বোধহয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আধুনিক বাংলা গান 'ভাবের কর্ষণ'-এ বিমুখ বলেই বোধহয় আমাদের দুই অন্যতম আধুনিক বিশ্বমানের চলচ্চিত্র পরিচালক — সত্যজিৎ ও ঋত্বিক — তাঁদের ছবিগুলিতে ভরসা করে আধুনিক সুরকারদের ও আধুনিক গানকে আমন্ত্রণ জানাতে পারেননি। সত্যজিৎ তো নিজেই অসাধারণ কিছু সুর করেছেন নিজের কথায় ; এছাড়া, প্রয়োজনে — দুজনের চলচ্চিত্র, জীবনদর্শন ও জীবনচর্যা সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও — উভয়েই হাত বাড়িয়েছেন বাংলার সেই প্রথম আধুনিক গান রবীন্দ্রসঙ্গীতের দিকে। ঘটনাটি নিশ্চয়ই কাকতালীয় নয়।

যাই হোক, 'পাল্কির গান', 'রানার', 'ঠিকানা', 'উজ্জ্বল একঝাঁক পায়রা', 'সবুজের ছোঁয়া কিনা তা বুঝিনা' ইত্যাদি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তগুলি একথাই প্রমাণ করে যে, একমেবাদ্বিতীয়ম্ রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনন্য প্রতিভার দৌলতে একাই গীতিকার ও সুরকার হিসাবে যে কালোত্তীর্ণ সাফল্য পেয়েছেন, পরবর্তীকালে তার ধারাবাহিকতা কীর্তিমান কবি ও প্রতিভাবান সুরকার মিলে বজায় রাখতে পারতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা তা হয়নি। যা সামান্য হয়েছে সবই নেহাৎ ব্যতিক্রম হিসাবেই — কোন সুচিন্তিত সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া হিসাবে নয়। কারণ বোধহয় একটাই — আমাদের আধুনিক কবিরা যেমন একদিকে আধুনিক বাংলা

গানের কথার ব্যাপারে — হয়ত বাংলা গানের ব্যাপারেই — উদাসীন ছিলেন, অন্যদিকে, সুরকাররাও বাংলা কবিতা-টবিতা তেমন পড়তেন না। কেউ-কেউ পড়লেও, হয়ত, আধুনিক কবিতার ভাব ও ভাষার তুলনায় বাংলা গীতিকবিতার ভাব ও ভাষার অনাধুনিকতা ও দৈন্যে উদ্বিগ্ন বা বিচলিত হবার মতন কিছু পাননি।

শিল্পে ইন্টার ডিসিপ্লিনারি দৃষ্টিভঙ্গি

অথচ সেই সময়েই শিল্পে 'একলা চলো-রে'-র দিন প্রায় শেষ; ইউরোপীয় শিল্পে তো বটেই, ভারতীয় শিল্পেও 'ইন্টার-ডিসিপ্লিনারী' দৃষ্টিভঙ্গির প্রবেশ ঘটেছে। শিল্পের বিভিন্ন শাখা প্রয়োজন অনুসারে একে অন্যের উপাদান নিচ্ছে। এবং এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শিল্পের বিভিন্ন শাখা পরস্পরের কাছাকাছি আসছে, চিনছে, সময় ও সমসাময়িক জীবনকে শিল্পে-সাহিত্যে ধরার তাগিদে মাধ্যমগত শুদ্ধতা (যা একধরনের পিউরিটান্যিজম্ বা গোঁড়ামি) ত্যাগ করে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে এক 'মিশ্র-মাধ্যম' নির্মাণের দিকে যা শিল্পীর বিষয়গত ভাব, ভাবনার চরম উপলব্ধিকে প্রকাশ করবে এমন এক নতুন যুগোপযোগী ভাষায় যা তার গ্রহীতাকে শুধু জানানই দেবেনা, এক সম-তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অভিঘাতে নাড়া দেবে তার বোধের মূলকে, মননকে করবে সমাজমনস্ক, যুক্তিনির্ভর ও আধুনিক মূল্যবোধ-আশ্রিত। এবং এই প্রক্রিয়া-উদ্ভাত আরেকটি উপপ্রক্রিয়ায় ভিন্ন ভিন্ন শিল্প-শাখার শিল্পীরাও আসছেন পরস্পরের সান্নিধ্যে। জার্মানিতে, ব্রেটোল্ট ব্রেশ্ট গান লিখছেন, তার সুর তৈরি করছেন স্বনামধন্য হানস আইস্লার। সারা ইউরোপ জুড়ে সেই ত্রিশের দশক থেকেই শিল্পী সংহতির নতুন প্রক্রিয়াটির শুরু। হিটলারের ফ্যাসিবাদী সংস্কৃতিকে রুখতেই এই সংহতি — শুধু ইউরোপীয়রই নয়, এক বিশ্বজোড়া সংহতির চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন ইউরোপ ও বিশ্বের অন্যান্য অংশের বিখ্যাত স্বল্পখ্যাত শিল্পী সাহিত্যিকরা। আর এই সংহতিরই চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছিল একটি গানে; গানটি স্প্যানিশ ভাষায় লিখেছিলেন পাবলো নেরুদা, জার্মান ও ইংরেজি ভাষায় এর অনুবাদ করেছিলেন যথাক্রমে ব্রেশ্ট এবং এরিক্ বেন্টলে, সুর করেছিলেন সেই হানস্ আইস্লার। এই শান্তি-গীতটির ইংরেজি অনুবাদ এখানে তুলে দেবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না—

Peace to the house that is your house,
Peace to the house that is mine;
Peace to the peaceful neighbour,
Peace to both mine and thine.

Peace to the Korean Children
Peace to the workers on the Ruhr:
Peace to New York truck drivers
Peace to the coolies in Singapore.

Peace to the men, to the women
Peace to the old, to the small
Peace to the land, to the ocean
That they may serve us all.

গানের কথাগুলি আলাদাভাবে দেখলে একটি আধুনিক প্রার্থনা সঙ্গীত মনে হতে পারে। সেটাই স্বাভাবিক; কারণ নেরুদা তো তাঁর গানে আমার-তোমার, জড়-জঙ্গম, কোরীয়-আমেরিকান আবিশ্ব সকলের জন্যই শান্তি কামনা করেছেন। কামনা তো এক অর্থে প্রার্থনাই — তবে, এ প্রার্থনা কোন ঈশ্বরের কাছে নির্বাণ প্রাপ্তির আশায় নয়, মানুষের শান্তির জন্য মানুষেরই শুভ বুদ্ধির কাছে সরল এক আবেদন। আইস্লারের কণ্ঠা সুরটিও অবশ্যনীয় এক সারল্য, কোমলতা আর স্পর্শকাতরতার ছোঁয়াচ-লাগা; তাতে নেই কোন আদর্শ প্রার্থনা সঙ্গীতের গুরুগাম্ভীর্য বা সামগানের মন্ত্রমুগ্ধতা। যে কোন লোকের খালি গলায় বা একটি গিটার/একতারা নিয়ে গুনগুন করে গাইবার মতন সহজ সুর।

এবার ত্রিশ-চল্লিশ দশকের পশ্চিমবঙ্গ বনাম ইউরোপের কথা ভাবুন। সাহিত্যে তো ইউরোপের বিশেষত ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব গত শতাব্দী থেকেই ছিল। ঐ শতাব্দীতেও গোড়া থেকেই ছিল। মাইকেল ছিলেন মিল্টন-প্রভাবিত; রবীন্দ্রনাথের ওপর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রভাবও সুবিদিত। রবীন্দ্রোত্তর যুগে গদ্য সাহিত্যে তলস্তয়, গোর্কি, কাফ্‌কা, ক্যামু, সার্ত্র ইত্যাদি, কবিতায় এলিয়ট, মায়াকভ্স্কি, ইয়েট্‌স্; কবিতার দর্শন হিসাবে পরাবাস্তববাদ, নাটকে স্তানিস্লাভস্কি, ব্রেশ্ট, চিত্রকলায় একে-একে সুররিয়ালিজম, ইমপ্রেসনিজম, পিকাসো প্রবর্তিত কিউবিজম, পঞ্চাশের দশকে ডি-সিকা, রাজনীতিতে মার্কসবাদ — এসব কিছুর প্রভাব বাংলা শিল্প-সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পড়েছে। এবং তাতে আখেরে আমাদের লাভই হয়েছে। কিন্তু গান পুরো বাদ! অদ্ভুত না? গানের কথা, সুরের ধারা, গীতিকবিতার বিভিন্ন ধরন-ধারন — এসব না হয় বাদই দিলাম। কিন্তু 'ইন্টার-ডিসিপ্লিনারি' দৃষ্টিভঙ্গি-জাত সেই বিশেষ প্রক্রিয়াটির প্রভাবও তথাকথিত বাংলা আধুনিক গানের ওপর পড়ল না কার অভিশাপে?

অথচ, আমাদের জীবনানন্দ ছিলেন, হিমাংশু দত্তও ছিলেন। প্রথমজন গান নিয়ে ভাবতেন কিনা আর দ্বিতীয়জন গীতিকবিতার দৈন্যতা নিয়ে, এ অধমের তা জানা নেই। স্পষ্টই বলা ভাল — ভাবেননি তাঁরা। ছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও সলিল চৌধুরি — এঁরা তো আবার একই রাজনৈতিক শিবিরে ছিলেন অনেকদিন। কী পেলাম আমরা সলিলের হাফ-ডজন খানেক

ব্যতিক্রমী গান বাদে? ছিলেন সঙ্গীত বিশারদ (অবশ্যই পাশ্চাত্য) কবি বিষ্ণু দে ও শিক্ষিত সিরিয়াস সুরকার বটুকদা (জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র), প্রেমেন্দ্র মিত্র ও নচিকেতা ঘোষ। যাঁদের নাম উল্লেখ করলাম, তাঁদের এক জোড়াও যদি — বেশি নয়, বছর পাঁচেকও একসঙ্গে কাজ করতেন, আধুনিক বাংলা গানকে এভাবে লাঞ্ছিত হতে হত না রাম-শ্যাম-যদুদের কথা আর অজয় দাস-বাণী লাহিড়ী-দিলীপদিলীপ-দের সুরের দেউলিয়াপনার হাতে।

বাংলা গানের সমাজতত্ত্ব নিয়ে চর্চা নেই

সুরের প্রশ্রয়ে লালিতপালিত বাংলা গানের কথাকে যেহেতু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'ভাবের কর্ষণ করিতে হয় নাই' তাই, ভাব আহরণের তাগিদে সুরের দোরগোড়া পেরিয়ে রাস্তায় নামার, সময়ের স্পন্দনকে ধরার, সমাজমনস্ক হবার প্রয়োজনীয়তা সে দেখেনি। ফলে, বাংলা সাহিত্যের, নাটকের, চিত্রকলার, চলচ্চিত্রের নিজস্ব সমাজতত্ত্ব থাকা সত্ত্বেও বাংলা গানের কোন সমাজতত্ত্ব নেই। একটু ভুল হল — সমাজতত্ত্ব একটা আছে ঠিকই — কিন্তু সেটা কী, তার উপাদানগুলিই বা কী, চরিত্র কী ইত্যাদি নিয়ে কোন চর্চা, আলোচনা, ভাবনা, গবেষণা, যুক্তিনির্ভর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে-এর স্বরূপ উদ্ঘাটনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কোন মাথাব্যথা কারও মধ্যে — তিনি সমাজতত্ত্ববিদই হোন বা সঙ্গীতত্ত্ববিশারদই হোন — আজ অবধি দেখা যায়নি। যা কিছু আন্তরিকতাপূর্ণ চিন্তাশীল ভাবনা, যা আদতে আধুনিক বাংলা গানের দুরবস্থা নিয়ে একধরনের জরুরি উদ্বেগ, দেখা গেছে, গানের নয়, সাহিত্যের লোকেদের তরফ থেকে। যেমন, সমাজ ও সংস্কৃতি-বিষয়ক সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লেখক অধ্যাপক দীপেন্দু চক্রবর্তী। এই অগ্রগণ্য প্রাবন্ধিক তাঁর মার্চ, '৭৯-তে প্রকাশিত 'সংস্কৃতির ক্ষয়ক্ষতি' বইয়ের 'আধুনিক বাঙলা গান ও আধুনিক উদাসীনতা' প্রবন্ধটিতে সঠিক মন্তব্য করেছেন, "একটা জাতির সাংস্কৃতিক মানসের অনেক গোপন কথা যে তার গানের খাতায় পাওয়া যায় এ বিশ্বাস অমাদের সমাজতত্ত্ববিদদের তেমন আছে বলে মনে হয়না। লোকগীতি নিয়ে কিছু অধ্যাপকীয় থিসিস, রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে কিছু গায়ক-গায়িকার (সস্ত্রীক বা সস্বামী) আপ্তবাক্য উচ্চারণ, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ছাত্রপাঠ্য পুস্তক, খুব বেশি হলে, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আদি ইতিহাস নিয়ে নানান অনুমান ('দেশ' পত্রিকায়) — সঙ্গীত সম্বন্ধে আমাদের গবেষণার পরিধি এটুকুই। সঠিক সামাজিক প্রেক্ষিতে বিভিন্ন শ্রেণীর সঙ্গীতের স্থান নিরূপণ করার প্রশ্নটিকে গুরুত্ব দেওয়া তো দূরের কথা, আমাদের মাথাতেও আসেনি। তবু যতটুকু কাজ হয়েছে (কাজের কাজ না হলেও) তা শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, লোকগীতি ও রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়েই, উপেক্ষিত থেকে গেছে যাকে বলা হয়ে থাকে 'আধুনিক বাংলা গান'।" দীপেন্দু চক্রবর্তীর এই প্রবন্ধটি বাদে কবি-সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের হাল্কা চালে কিন্তু চিন্তার আধুনিকতায় সমৃদ্ধ একটি লেখা — 'কোন গান?' — পেলাম এক বন্ধুর ধার দেওয়া 'জার্নাল সত্তর' নামক একটি লিট্‌ল ম্যাগাজিনের ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত ভল্যুম ৪, নয় নম্বর সংখ্যায় (জানি না পত্রিকাটি এখনও টিকে আছে কিনা)। বলাই বাহুল্য, কোন সমাজতাত্ত্বিক বা সাঙ্গীতিক বিশ্লেষণে না গিয়ে, টিপিক্যাল সুনীলীয় স্টাইলে বিভিন্ন বাংলা গান সম্বন্ধে (আধুনিক সমেত) ব্যক্তিগত মতামত জানিয়েছেন সুনীল। তবে আধুনিক বাংলা গানের কথার দৈন্য, শূন্যগর্ভতা ও অনাধুনিকতা নিয়ে তাঁর আন্তরিক উদ্বেগ প্রবন্ধমূলক লেখাটিতে প্রকাশ পেয়েছে। দুটি মাত্র উদাহরণ দেব আমার এ কথা ভাববার পক্ষে। এক জায়গায়, বাংলা গানের কথার ভাবগত ও ভাষাগত আধুনিকতার একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা সেরে, উনি মন্তব্য করেছেন — "রবীন্দ্রনাথই এখন পর্যন্ত আমাদের শেষতম আধুনিক সঙ্গীতস্রষ্টা। এটা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে গৌরবের। কিন্তু আমাদের পক্ষে লজ্জার।" দ্বিতীয়টি, অন্য প্রসঙ্গে, "..... এই ভাবে তৈরী হয়, আধুনিক নাগরিক লোকসঙ্গীত।" বিশেষ করে এই দ্বিতীয় মন্তব্যটির জন্যই লেখাটি দামি হয়ে উঠেছে। 'টাউন-ফোক' কথাটি বা এই বিশেষ গান বিদেশে বেশ আগে এসে গেলেও গান নিয়ে বলতে গিয়ে ঐ শব্দটির বাংলা অনুবাদ করার মধ্য দিয়ে পাঠককে সুনীল দুটি কথা জানিয়ে দিলেন। প্রথমত, 'ভোলা মন' বা 'মাঝিরে-এ-এ'-মার্কা তথাকথিত লোকগীতির আজকের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে অপ্রাসঙ্গিকতা; দ্বিতীয়ত, লোকগীতির আঙ্গিকের ইমপোভাইজেশনের মাধ্যমে সুরের একটি নতুন ধারা আবিষ্কারের কথা যার সোফিস্টিকেটেড আঙ্গিক, আধুনিক সময়ের ও জীবনের প্রাসঙ্গিক চরিত্র ও বিষয়গুলি নিয়ে আধুনিক ভাষায় লেখা 'নাগরিক গীতিকবিতাকে' গানের রূপ দিতে সক্ষম হবে। এককথায়, গানের 'নাগরিকীকরণের' মাধ্যমে ঐ শুধুমাত্র 'শোনার' বস্তুটিকে প্রাসঙ্গিক ও নাগরিক করে যথার্থ আধুনিক করে তোলার জরুরি ইঙ্গিত — যা শ্রোতার কাছে 'ভাবনার' বস্তুও হয়ে উঠবে। 'সংগীত ও ভাবনা' শীর্ষক আরেকটি প্রবন্ধ খুব সম্ভবত আশি সালের প্রথমার্ধের 'দেশ' পত্রিকার একটি সংখ্যায় বেরিয়েছিল। লেখক ছিলেন সুমন চট্টোপাধ্যায়। তাঁর 'সংগীত ও ভাবনা'-শীর্ষক প্রবন্ধে প্রায় বছর বারো আগে আধুনিক বাংলা গান নিয়ে যেসব ভাবনা ভেবেছিলেন, প্রশ্ন তুলেছিলেন, সেসব ভাবনার সাঙ্গীতিক প্রকাশ তিনি ঘটিয়েছেন এবং প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন তাঁরই তৈরি 'সুমনের গান'-এ। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি।

এবার, বছর চুয়াল্লিশ পিছিয়ে ইউরোপের দিকে তাকানো যাক একটু। ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত 'Philosophy of modern music' গ্রন্থে 'কালচার ইন্ডাস্ট্রির' ভূমিকা সম্বন্ধে

বলতে গিয়ে আধুনিক পাশ্চাত্য সঙ্গীতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক থিওডোর আদোর্নো লিখলেন : ''Since the culture industry has educated its victims to avoid straining themselves during the free time alloted to them for intellectual consumption, they cling just that much more stubbornly to the external framework of a work of art which conceals its essence.'' পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাজাত 'ভোগবাদ' যে সে দেশের সংস্কৃতিকেও পণ্যে রূপান্তরিত করতে ছাড়ে না, গড়ে তোলে 'সংস্কৃতি-শিল্প' বা 'কালচার ইন্ডাস্ট্রি' এবং 'শিল্প' যে তার ক্রেতাবর্গকে শিক্ষিত করে তোলে ইন্দ্রিয়-সুখদায়ক সাংস্কৃতিক পণ্যটি কেনার জন্য — এ ঘটনাটি আজ আমাদের —শিক্ষিত সচেতন মানুষের — উপলব্ধিতে এমন স্বচ্ছতা নিয়ে অনুভূত যে ওপরের উদ্ধৃতিটি তেমন নতুন কোন কথা মনে হয় না। কিন্তু যে সময়ে কথাটি ঠিক এভাবে বলা হয়েছিল সেই সময় ও যুগের প্রেক্ষিতে সংস্কৃতির এই আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ ও তার ভিত্তিতে এর সঠিক সংজ্ঞা নিরূপণ যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক, যুগোপযোগী ও কাজের হয়েছিল তাতে আজ আর কোন সন্দেহ নেই। আর এই 'কালচার ইন্ডাস্ট্রি'-র দাস শিল্পীদের সামন্ততান্ত্রিক যুগে কী অবস্থা ছিল, The Sociology of literary taste' বইতে (১৯৩৩ সালে প্রকাশিত) Levin L. Scheuking সে সম্বন্ধে লিখলেন ''The singer goes with the king, not because both live 'auf der Monschheit Hohn'—'on the peaks of humanity' — but because the prince is the only person with the means to support the singer.' একই সালে অস্ট্রিয়ান সমালোচক Ernst Krenek সঙ্গীত-সমালোচনার সীমানা নির্ধারণ করলেন এই বলে : ''..... an art judgement which makes any claim to validity should steer clear of purely atmospheric mood-report and concentrate on examining the music. This sort of examination is less popular and indeed fairly rare, because it demands considerable knowledge and gifts other than purely journalistic ones.'' একই রচনায় আর এক জায়গায় উনি লিখছেন : ''.....one should avoid, above all, the useless and misleading quest, so dear to the so-called 'fundamental critics', after external similarities ; instead one should look for some sort of historico-philosophical interpretation. An analytical cticism of music along these lines would be thought of as an 'extension of reproduction' and as such would be more important and valuable to work which is venturing into the unknown than mere empty praise or blame that does not hit any real target because it starts out on a false premise.'' সঙ্গীত সমালোচনার সীমারেখা ও ভিত্তি সম্বন্ধে আজ থেকে প্রায় পাঁচ যুগ আগের ক্রেনেক সাহেবের কথা সমলোচনামূলক মন্তব্য আজও আমাদের বাংলা গানের —যে কোন ধরনের গান — সঙ্গীত সমালোচকদের ক্ষেত্রে কি দিকনির্দেশকের ভূমিকা পালন করে না ? এতগুলো লম্বা উদ্ধৃতি দেবার কারণ একটা বিশেষ প্রক্রিয়ার প্রতি আমাদের সঙ্গীতজ্ঞ, সঙ্গীততত্ত্বজ্ঞানী, সঙ্গীতশিল্পী, সুরস্রষ্টা, সুরকার, গীতিকার এবং সর্বোপরি সচেতন-অচেতন নির্বিশেষে সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। সেটি এই যে, সেই তিরিশের দশক থেকেই ইউরোপে আধুনিক সঙ্গীতের দর্শন, সাহিত্যে রুচিবোধের সমাজতত্ত্ব, আধুনিক সঙ্গীতের শিল্পতত্ত্ব, এমনকি সঙ্গীত সমালোচনার মতো নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে পর্যন্ত তাত্ত্বিক আলোচনা-সমালোচনা, বহু তর্ক-বিতর্ক, লেখালেখি চলছে। চলেছে নিরন্তর, দশকের পর দশক। এইরকম সামগ্রিক একটি তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে — যাতে লেভিন্ স্কিং, আর্নেস্ট ক্রেনেক, গিয়র্গ লুকাচ্, থিওডোর আদোর্নো বিশেষভাবে উল্লেখ্য — ক্রমবিকাশের পদ্ধতিতে রূপায়িত হয়েছে ইউরোপীয় আধুনিক গানের সমাজতত্ত্ব। এইভাবে, আগামীর গানের একটা তাত্ত্বিক পটভূমি তৈরি হয়েছে।

এরই পাশাপাশি ব্রেশ্ট-এর মত নাট্যকার ও কবি, হান্স্ আইস্লারের মতন সুরকারের সঙ্গে বেঁধেছেন গাঁটছড়া হিটলারের জার্মানিতে। হান্স্ আইসলারের পরিচালনায় তাঁরই হাতে গড়া 'ওয়াকার্স ক্যান্টার্স' — জার্মানির কম্যুনিস্ট সংগঠন ও আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারে যার বিরাট ভূমিকা ছিল — নানান ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ একটি পেশাদারি মনোবৃত্তি নিয়ে এগিয়ে চলেছে। পার্টির ইচ্ছামতন আদেশে নয় — একজন সম্পূর্ণ স্বাধীন কম্পোজার-এর নিজস্ব বোধ, শিক্ষা আর উপলব্ধির নির্দেশে। 'পীস টু দ্য হাউস দ্যাট ইজ ইওর হাউস'-এর মতন শান্তি-সঙ্গীতে যেমন সুর করছেন একদিকে, অন্য দিকে জার্মানির 'লেবারস্ ইউনাইটেড ফ্রন্ট'-এর জন্য ব্রেশ্টের লেখা গানেও সুরারোপ করছেন। ব্রেশ্টের লেখা সেই অত্যন্ত জনপ্রিয় গানটির কয়েকটি স্তবক এইরকম—

A man is always a man
He needs something to eat
Neither speeches nor talks
That's nothing for him to feed.

A man is always a man
He does not like boots on his face
No slave under him, no lord over him
He does not like any of these.

A worker is always a worker
He'll be liberated by no body else
The worker liberation must be
Done by the worker themselves.

গানটি, মনে রাখতে হবে, একটি শ্রমিক ফ্রন্টের শ্রমিকদের গাওয়ার জন্য লেখা। কথায় 'লাল-নিশান', 'কম্যুনিস্ট পার্টি', 'লেনিন', 'জয় পতাকা', 'রক্তে রাঙা পতাকা', 'হত্যার অভিসন্ধি', 'হোয়াংহো-ইয়াংসি-মেকং-রাইনে ইত্যাদি নদীর গান' জাতীয় একটিও শব্দ নেই ; নেই কোনরকম শ্লোগান মৎগারিং। শ্রমিক তার নিজের সমস্যা-সঙ্কটের কথা — সে অন্নসংক্রান্তই হোক আর সম্মানবোধ সংক্রান্তই হোক — নিজের সহজ সরল ভাষায় সোজাসুজি বলছে। এবং সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল, ব্রেশ্ট, একজন মানবিকতাবোধসম্পন্ন মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবি হিসাবে শ্রমিকের সংগ্রামের প্রতি তাঁর পূর্ণ সংহতি জানিয়েও, একজন নির্মম পর্যবেক্ষকের জায়গা থেকে তাঁদের জানিয়ে দিচ্ছেন তাঁদেরই বোধগম্য ভাষায় :

শ্রমিক তো আসলে সে শ্রমিক
তাকে মুক্ত করতে কে আর আসবে ?
শ্রমিক-শ্রেণীর মুক্তি
তাকেই আনতে হবে।

কথায় নেই কোন মধ্যবিত্ত রোমান্টিসিজম্, হৃদয়াবেগের অযথা উচ্ছ্বাস, কপট অঙ্গীকারবদ্ধতা, ব্যক্তিপূজা বা কোন পার্টির রাজনৈতিক মতবাদের প্রতিফলন। পরিষ্কার বলে দেওয়া কোন বিভ্রম অযথা সৃষ্টি না করে যে ''বাপু, তোমাদের মুক্তির সংগ্রাম বলো, লড়াই বলো, তোমাদেরই করতে হবে ; কেউ আসবে না।'' এমনকি ''আমিও'' না, এরকম একটা অকপট সত্যেরও ইঙ্গিত বেরিয়ে আসে যেন। গানের কথা শ্রমিকের মনের ভাব তারই মুখের ভাষায় যেন লেখা। এইভাবে গ্রামীণ লোকগীতির ভাব ও ভাষার 'ইম্প্রোভাইজেশানের' মধ্য দিয়ে তৈরি হয়েছে 'শ্রমিক লোকগীতির' নিজস্ব ভাষা। এ ভাষায় মধ্যবিত্তের চাপানো ভার নেই। অথচ গানটি লেখা কিন্তু একজন মধ্যবিত্তের। অবশ্যই তিনি শিক্ষিত, সচেতন, সমাজমনস্ক একজন বুদ্ধিজীবিও বটে। সুরকারও তাই। তাঁরা শহুরেও। ফলে, গানের কথায় ও সুরে নাগরিক পরিশীলন স্বাভাবিক ও কামাও বটে। পরিশীলন বা সোফিস্‌টিকেশন ছাড়া কোন ভাব, ভাবনা, বক্তব্য বা ঘটনাকেই শিল্পে রূপান্তরিত করা যায় না। এটা তাঁরা জানতেন। কিন্তু এ ব্যাপারেও তাঁরা যথেষ্ট মাত্রায় সচেতন ছিলেন যে এই সোফিস্‌টিকেশনের মাত্রা — কথা ও সুরের ক্ষেত্রে —এত বেশি বা সূক্ষ্ম না হয়ে যায় যা শুধু সমাজের আভা-গার্দ্‌দের কাছেই গ্রহণীয় হয়ে ওঠে।

দেখা যাচ্ছে, আগামীতে যে গান আসবে তার তাত্ত্বিক পটভূমি তৈরি হচ্ছিল ইউরোপে। সেইসঙ্গে, ইউরোপ ও আমেরিকা — দু-দেশেই আধুনিক গানের কথা ও সুর নিয়ে চলছিল নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা। লক্ষ্য এমন গান তৈরি করা যা মানুষের কথা ভাষায় মানুষেরই জীবনের কথা বলবে ; তার সুখ-দুঃখ, আশা-হতাশা, আপোষ-সংগ্রাম, সাজানো-চাপানো কথায় নয় — কোমমতি-মার্কা জটিল উচ্চাঙ্গ সুরে নয়, সহজ কথায় সহজ সুরে প্রকাশ করবে ; সঙ্গীত ভাবে, ভাবনায়, বিষয়ে, ভাষায়, সুরে, যন্ত্রানুষঙ্গে, পরিবেশন-ভঙ্গিমায় নেবে এক নতুন বাঁক।

আমেরিকার কালো মানুষরা অনেক দিনই নিয়ে এসেছিল একটি অসাধারণ সঙ্গীতের ধারা — ব্লু-গান। এ সুরধারার বিষয় রোম্যান্টিসিজম মানুষের দুঃখ আর ভালবাসার কথা যে গভীরতায় প্রকাশ করে তা আজও তুলনাহীন। আর অন্য কোন সুর বোধহয় এভাবে ছুঁতে পারে না আধুনিক মানুষের হৃদয়।

গানের ক্ষেত্রে আধুনিক সংস্কৃতির বিকাশ

যাই হোক, রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার ও প্রেক্ষাপটের ক্রমবিকাশমান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপ-আমেরিকায় কবেই শেষ হয়েছে ঘোড়ায় টানা লাঙলের যুগ। আদি গ্রাম ও গ্রামীণ সংস্কৃতির স্বাভাবিক অবলুপ্তির পাশাপাশি সেখানকার বহু যুগ ধরে আবহমান লোকসঙ্গীতের ধারাগুলিও আস্তে আস্তে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে হতে শুকিয়ে গেল একদিন। বলাই বাহুল্য, এসব ঘটল ইউরোপ-আমেরিকায় শিল্প-বিপ্লবের কারণেই। কিন্তু, সাধারণ খেটে খাওয়া গরীব মানুষগুলো, মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত এরা তো আর রাতারাতি আভা-গার্দ্ শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়ে পাশ্চাত্য উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বোদ্ধা শ্রোতা হয়ে গেল না। শহরের আদি অভিজাত শ্রেণীর ঠিক বিপরীত মেরুতে থাকা এই গৃহযুদ্ধ-দারিদ্র্যবিধ্বস্ত ছিন্নমূল মানুষরাই হলেন সেই নতুন নাগরিক যাঁদের টিকে থাকা, বেঁচে থাকার, কোনরকমে কিছু করে খাওয়ার, বড় হয়ে ওঠার, প্রতিষ্ঠিত হবার, আইডেন্‌টিটি-ক্রাইসিস থেকে মুক্তি পাবার নিরন্তর গুপ্ত ও প্রকাশ্য অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক মনস্তাত্ত্বিক আত্মিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে গড়ে উঠল এক নতুন নাগরিক সংস্কৃতি — আদি গ্রামীণ এবং অভিজাত সংস্কৃতি থেকে সমদূরত্বে থাকা এক জীবন্ত সচেতন আধুনিক সংস্কৃতি।

গানের ক্ষেত্রে — আধুনিক গানের ক্ষেত্রে — শ্রমিক-অধ্যুষিত-ম্যাঞ্চেস্টার-লিভারপুলের চারটি যুবক — জর্জ হ্যারিসন্, জন লেনন্, পল্ ম্যাকার্টনি ও রিঙ্গো স্টার, তাদের মধ্যবিত্ত নাগরিক অবস্থান থেকে পঞ্চাশ দশকের শেষ বা ষাটের প্রথম ভাগে লক্ষ করল খ্যাতির উদ্ভুঙ্গে থাকা প্যাট বুন বা জিম রিভস-এর চটুল প্রেমের গানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সঙ্কট-বিদীর্ণ সময় ও সমাজজীবনের কোন প্রতিফলন নেই।

'খ্যাতির উত্তুঙ্গে' কথাটা লেখায় এসে যাবার কারণেই দায়িত্ব এসে যায় পঞ্চাশের দশকে খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার শীর্ষে থাকা এলভিস্ প্রিসলে সম্বন্ধে কিছু বলার। অসাধারণ নাচতেন এই বিখ্যাত গায়ক গান গাইবার সময়। ঐ নাচ একমাত্র তিনিই নাচতে পারতেন। নাচ জিনিসটা কৃষ্ণাঙ্গদের — কি আমেরিকার কি আফ্রিকার — জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আজও লক্ষ মানুষের বিক্ষোভ সমাবেশে মঞ্চে দাঁড়িয়ে নেলসন ম্যান্ডেলা, ডেসমন্ড টুটুর মতন জননেতারা সমবেত মানুষদের সঙ্গে হাততালি দিয়ে সকলের সঙ্গে গানে গলা মিলিয়ে কোমর দুলিয়ে নেচে বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে সংহতি প্রকাশ করেন। আসলে এই নাচের মাধ্যমেই আইভরি কোস্ট থেকে বন্দী করে আনা কৃষ্ণাঙ্গ দাস শ্রমিকরা প্রথম প্রকাশ করেছিলেন তাঁদের ক্ষোভ, যন্ত্রণা, আনন্দ, ভালবাসা। এক কথায় নৃত্যই ছিল তাঁদের জীবনের অভিব্যক্তি। পোড় খাওয়া বিশাল পেটা চেহারার মানুষটি তার চাবুক-পীড়িত যে দুটি নিকষ কালো বিরাট পাঞ্জায় ধরেছিল বিশ্বের দুই গোলার্ধের গরলকে সেই দুটি করতল যখন হাততালি দিয়ে শুরু করেছিল তার প্রথম বডি-মুভমেন্ট — আদি নৃত্য — সে কি আসলে প্রকাশ করেনি অত্যাচারী শ্বেতাঙ্গের বিরুদ্ধে তার প্রথম বিদ্রোহ? অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাঁচতে চাওয়ার জীবনলীন জৈবিক আকাঙ্ক্ষার রাজনীতি কি নিজস্ব এক ভাষা পায়নি সেই কালো নরনারীর যৌথ উদ্দাম নৃত্যের ছন্দে? সেই নাচই — যা তাদের, সেই কৃষ্ণাঙ্গ দাসদের সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক-শারীরিক (এমনকি সেক্সুয়্যাল)-মনস্তাত্ত্বিক-আত্মিক উত্তরণের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে (আজও হয়) — পরবর্তী কালে নির্ধারণ করেছে ব্ল্যাক মিউজিকের ছন্দ, তাল, লয় এবং লিবারেট করেছে তাদের সার্বিক অস্তিত্বকেই। এই নাচেরই এক শহুরে সংস্করণ ছিল শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান এলভিসের নাচ। এলভিসের গানের সুরেও বন্দী-নিগ্রোদের সৃষ্ট 'ব্লুজ'-এর প্রভাব লক্ষণীয়। 'লাভ ইন লা-ভেগা' ছবির রোমান্টিক গায়ক-নায়ক 'এলভিস্ প্রিসলে ইন্ হাওয়াই' ছবিতে হঠাৎ যখন গেয়ে উঠছেন 'হাস্, লিট্‌ল বেবি ডোন্ট্ য়্যু ক্রাই, য়্যু নো ইওর মাদার ওয়াজ বর্ন টু ডাই' তিনি বোঝাচ্ছেন তিনি কনসার্নড। এইভাবে দেখা যায় মার্কিন সমাজে বর্ণবৈষম্যোদ্ভূত সামাজিক দ্বন্দ্ব রোমান্টিক পপ গায়ক এলভিস্‌কেও প্রভাবিত করেছিল বিভিন্নভাবে।

আবার ফিরে আসি 'বীটল্‌স্'-দের কথায়। জানি না তারা সেই সময়ে থিওডোর আদোর্নোর সেই ১৯৪৮ সালে 'কালচার ইন্ডাস্ট্রি'র ভূমিকা সম্বন্ধে লেখা কথাগুলি পড়েছিল কিনা। তবে ওরা, পড়ে হোক বা না পড়েই হোক, এক চরম উপলব্ধিজাত প্রেরণা থেকে ঠিক করল — "লেট আস মেক দোজ্ 'ভিকটিম্‌স্' স্ট্রেইন্ অ্য বিট"; কারণ তাদের নিজস্ব কিছু সমস্যা ছিল, সঙ্কট ছিল। শ্রেণীগত অবস্থান থেকে নিজস্ব সুখ-দুঃখ, আশা-হতাশা, ঘৃণা-ভালবাসা, যুদ্ধ-শান্তি, কোলাহল-একাকিত্ব, বেকারি, নস্ট্যালজিয়া ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়ে এক কথায়, আধুনিক নাগরিক সভ্যতার যাবতীয় সঙ্কটকে তারা তাদের গানের কথায় ও সুরে ধরার সাহস দেখাল। জন্ম নিল 'দি বীটল্‌স্'; চালু কালচার-ইন্ডাস্ট্রি প্রবর্তিত সুরসর্বস্ব তথাকথিত রোমান্টিক গানের সমস্ত কপটতা ও কৃত্রিমতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে 'নগর-সঙ্গীত'-এর বিক্ষিপ্ত ধারাটিকে প্রতিষ্ঠা দিল। 'আয়্যাম ফিক্সিং এ হোল', 'আই ওয়ানা হোল্ড ইয়োর হ্যান্ড' ধরনের অসাধারণ গান আমরা পেলাম। অভিজাতরা, কি বিদেশে কি এদেশে, নাক কোঁচকাল, কিন্তু বিশ্বের যুব সম্প্রদায় বুক পেতে বরণ করে নিল যথার্থ প্রতিষ্ঠানবিরোধী গানের অনন্য ধারাটি। ঘটনাটি ঘটল ষাটের দশকের গোড়ায়। পাশাপাশি — ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধ উত্তাল হয়ে উঠেছিল ছাত্র-যুব আন্দোলনের জোয়ারে। ইউরোপ, আমেরিকা, লাতিন আমেরিকা, এশিয়া — প্রায় সারা বিশ্বের সচেতন আবেগপ্রবণ ছাত্র-যুবসমাজ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এক সংগ্রামের ঢেউতে আন্দোলিত হচ্ছে তখন। ভিয়েতনামে আমেরিকার অন্যায় যুদ্ধের বিরুদ্ধে আমেরিকার ছাত্রসমাজ বিশাল বিশাল মিছিল-জমায়েতের মাধ্যমে তাদের বিক্ষোভ জানাচ্ছে। 'হাংরি জেনারেশানের' বিখ্যাত মার্কিন কবি অ্যালেন গিন্‌স্‌বার্গও তাঁর চূড়ান্ত ঘৃণা ব্যক্ত করলেন।

আর, এই বিক্ষুব্ধ যুগকে গানে ধরতে এগিয়ে এলেন পিট সিগার, বব ডিলান, জোন বায়েজ প্রমুখ গায়ক-গায়িকারা। 'নগর সঙ্গীত' বা 'নগর লোকসঙ্গীত' এগিয়ে গেল আরও একধাপ। পিট সিগার ভিয়েতনাম যুদ্ধ নিয়ে লিখলেন, সুর দিলেন এবং গাইলেন সেই অবিনশ্বর গান — 'লাস্ট ট্রেন টু নুরেম্‌বার্গ।' বব ডিলানের পৃথিবী কাঁপানো গান 'হাও মেনি রোড্‌স্ মাস্ট অ্য ম্যান ওয়াক্ ডাউন, বিফোর হি কল্‌স্ হিম অ্য ম্যান' তো আজ কিংবদন্তীর পর্যায়ে চলে গেছে। জোন বায়েজের 'প্রিজন্ টিলজি' আমাদের বুকের ভেতর ঘটায় এক নিঃশব্দ রক্তপাত। পিট সিগার একদিকে যেমন তাঁর 'লাস্ট ট্রেন টু নুরেমবার্গ' গানে গোটা মার্কিন দেশটাকেই দাঁড় করলেন আসামীর কাঠগড়ায়, অন্য দিকে বাউণ্ডুলে ভিখিরিদের নিয়ে গান বেঁধে শোনালেন, 'গো টু স্লীপ ইউ ওয়্যারি হোবো।' মধ্যবিত্তের বহুতলীয় ফ্ল্যাটবাড়ির ঘুপচি ঘুপচি দু'কামরার ফ্ল্যাটে নিজেকে সপরিবারে গুঁজে দেবার ঘটনা নিয়ে দারুণ মজা করে লিখলেন 'লিট্‌ল্ বক্সেস'-শীর্ষক বিখ্যাত গানটি। এইভাবে সমকালিন যুগ, সামগ্রিক জীবন তার সমস্ত সাম্প্রতিকতা নিয়ে, প্রাসঙ্গিক ছোট বড় ঘটনা ও বিষয়বস্তুর মাধ্যমে এসেছে এঁদের গানে; প্রকাশিত হয়েছে একজন নাগরিক ব্যক্তির কথা বলার ভাষায় আর যে-কেউ অন্তত গুনগুন করতে পারে এমন একটি 'লোক' সুরে। এসব গান বাঁধার জন্য তাঁদের কোন

'গৌরীপ্রসন্নীয়' বা 'পুলকীয়' কথা 'রচনা' করে সেগুলিতে 'বিউটিফুল' সুরের নকশাকাটা জামা চাপাতে হয়নি। বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা ও কথার (বা ভাষার) আধুনিকতাকে শ্রোতার কানে বিশ্বস্ত করে তোলার জন্য প্রথাবাহিত লোকগীতির বিশেষ একটি ধারাকে প্রয়োজন মতন ইমপ্রোভাইজেশনের মাধ্যমে দিয়েছেন 'নগর সঙ্গীতের' ন্যূনতম সেফিস্‌টিকেশন যা, যে কোনও আধুনিক শিল্পের অন্যতম প্রধান শর্ত। অন্যদিকে, লোকসঙ্গীতের ধর্মও বজায় থাকে — বাস্তব, প্রাসঙ্গিক, যুগোপযোগী — কিছুই বাদ যায় না। সেজন্য, বব ডিলান গরীব উদ্বাস্তুদের নিয়ে লেখেন, 'আই পিটি দ্য পুয়োর ইমিগ্র্যান্ট', আবার তিনিই পরে লেখেন, লিখতে পারেন, 'লাভ ইজ্ জাস্ট অফ্ ফোর লেটার ওয়ার্ড।' পাশ্চাত্য আধুনিক সঙ্গীতের এই ক্রমবিকাশে এবার যে সংযোজনটি হল সেটি এল লাতিন আমেরিকার 'নিউ সং মুভ্‌মেন্ট' থেকে। বাংলায় যার তর্জমা হতে পারে 'অন্য গান।'

সর্বত্র বিরাজমান 'সংকট'

আধুনিক সভ্যতা পৃথিবীর সর্বত্রই নগরকেন্দ্রিক। ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক, ধার্মিক এবং সর্বোপরি, অসম অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক বিকাশের কারণে এই সদ্যোজাত নাগরিক সভ্যতার রূপ ও গুণগত মান এক-এক দেশে এক-এক রকম; চরিত্র ও মাত্রারও ভিন্নতা আছে। আবার কোথাও প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক সংস্কার না ঘটার ফলে, কোথাও বা ধর্মের গোঁড়ামির কারণে, আধুনিকীকরণের এই প্রক্রিয়াটি আরম্ভই হয়নি। একদিকে সভ্যতার এই অসম বিকাশ ও আর এক দিকে একটি আদর্শ আধুনিক সভ্যতার সংজ্ঞা ও কাঙ্ক্ষিত রূপের বিচার নিয়ে জাতিগত, রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত উপলব্ধির প্রায় বিপরীত মেরুগত অবস্থান — এই দুইয়ের জটিল রসায়নে ও সেইসঙ্গে ভিন্ন-ভিন্ন সামাজিক রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে আধুনিক মানবসভ্যতার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক — সব ক্ষেত্রগুলিই, এই নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার জন্মলগ্ন থেকেই উপদ্রুত অঞ্চল হিসাবে বিরাজ করছে। তাই আজও এই আধুনিক সভ্যতার একটি আবিশ্ব গড় মান ও চরিত্র নির্দিষ্ট হয়নি। এক কথায় জন্মলগ্ন থেকেই এই সভ্যতা সংকটে আছে। এখনও চলছে। থাকবেও আরও বহুদিন।

এই সর্বত্রবিরাজমান (omnipresent) 'সংকট'ই — যুক্তি, নীতি ও মানবধর্ম অনুযায়ী — আধুনিক সভ্যতার মূল উপাদান ও সংস্কৃতির মূল বিষয় হিসাবে বিবেচিত হওয়া উচিত — ততদিন পর্যন্ত, যতদিন না এই সংকট থেকে সমগ্র মানবজাতি উদ্ধার পাচ্ছে বা আত্মসমর্পণের মাধ্যমে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আর, শিল্প-সাহিত্য যেহেতু সংস্কৃতির কেন্দ্রীয় দর্পণ সেহেতু আধুনিক শিল্প-সাহিত্যের প্রাথমিক বাধ্যতামূলক ও উদ্দেশ্যমূলক কাজ (business) হওয়া উচিত এক সামাজিক শল্যতন্ত্রের (social surgery) মাধ্যমে এই 'সংকটের' সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম থেকে স্থূলাতিস্থূল উপাদানগুলির এক গভীর ব্যাপক উন্মোচন। সদর্থে ও একমাত্র অর্থে আধুনিক শিল্পী-সাহিত্যিককে হতে হবে একজন সামাজিক প্রত্নতত্ত্ববিদও যিনি এক সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক খননের মাধ্যমে সমাজমানসের গভীর গহন অন্তঃস্থল থেকে তুলে আনবেন সেই কূটাভাস অসঙ্গতি অন্যায় দ্বেষ কপটতা-অধ্যুষিত বিক্ষুব্ধকারী উপাদানগুলি যেগুলির সহবাস দীর্ঘায়িত করছে এই সংকটের অস্তিত্বকে এবং সেই সঙ্গে আমাদের অস্তিত্ব-সংকটকে। শেষ কথায়, জীবনের সমসাময়িক অস্তিত্বই, তার কিছু ভাল ও বেশি মন্দ নিয়ে প্রতিসরিত হবে শিল্পীর কীর্তিতে — তার নিজস্ব এক হৃদয়গ্রাহী, মনন উদ্রেককারী সহজ কথ্য ভাষায়। আধুনিক গানের ক্ষেত্রে সেই 'আজকের জীবনের গান' — তোমার আমার গান — শিল্পী সৃষ্টি করবেন তোমার-আমার সেই কথা বলার ভাষায় যার সজীবতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা মূর্ত হয়ে উঠবে এমন 'লোক-সুরে' যা আমরা — যাদের হাতে উৎপাদন ব্যবস্থা নেই — নীরস একঘেঁয়ে খাটুনি খাটতে খাটতে গুনগুন করতে পারি।

নগর সঙ্গীত

ইউরোপ, মার্কিন ও লাতিন আমেরিকার আধুনিক গানের ক্ষেত্রে, তিরিশ থেকে ষাট ও তারপর সত্তর ও আশির দশক জুড়ে উপরোক্ত সৎ মানবিক সংস্কৃতিক প্রক্রিয়াটির একটি নিরবিচ্ছিন্ন ক্রমবিকাশ লক্ষ করি — তত্ত্বে ও প্রয়োগে। সুরের তথাকথিত শুদ্ধতা ও শিল্প সম্বন্ধীয় আবহমান যাবতীয় মতাদর্শগত গোঁড়ামিকে ছুঁড়ে ফেলে — গানের গান না, জীবনের গান বলার তাগিদে ঐসব দেশের সঙ্গীতশিল্পীরা তৈরি করেছেন নাগরিকের গান — 'নগর সঙ্গীত', যা আসলে এক 'অন্য গান'। এ তাগিদ তাঁদের অনুভূতিতে উপলব্ধিতে এসেছে একদিকে সত্যানুসন্ধানের এক চরম প্যাশন ও সেইসঙ্গে অন্যদিকে যাপিত জীবনের প্রতি গভীর আপসহীন এক ভালবাসার আবেগ থেকে। এই ভালবাসার আবেগ, এই মমত্ববোধ — জীবনের প্রতি, মানুষের প্রতি — বাউণ্ডুলে ভিখিরিকে নিয়ে লেখা পিট সিগারের গাওয়া গানে তখন এইভাবে আসে:

Go to sleep you weary Hobo
Let the towns drift slowly bye
Can't you hear the steel-raies humming
That's the Hobbo's lullabye
I know the Police cause you trouble
They cause you trouble everywhere
But when you die and I go to heaven
There will be no Policemen there.

তিরিশের গ্রেট ডিপ্রেশান, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, তেতাল্লিশের মানুষ-সৃষ্ট ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, স্বাধীনতা সংগ্রাম, দেশভাগ, নৌবিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন, একুশে ফেব্রুয়ারি, ঊনষাট-পঁয়ষট্টির খাদ্য আন্দোলন, নকশালবাড়ির বসন্ত নির্ঘোষ, এমারজেন্সি ও সবশেষে গত পনেরো বছরে তিনটি তথাকথিত গণতান্ত্রিক নির্বাচন — এতগুলি ঘটনাতাড়িত আমরা — পূবপশ্চিমের বাঙালিরা — শিল্পসংস্কৃতি সচেতন কলকাতা মহানগরীর আধুনিকমনস্ক নাগরিক বাঙালিরা কী করলাম ? কী গাইলাম ? আজও বা অধিকাংশ কী গাইছি ? শুনছিই বা কী ?

খালেদ চৌধুরির স্মৃতিচারণ

আমাদের সকলেরই পরিচিত এক প্রতিভাবান অভিজ্ঞ বয়ঃজ্যেষ্ঠ শিল্পীর একটি অকপট স্মৃতিচারণ শোনা যাক এবার : "তখন রণদিভের পিরিয়ড শুরু হয়ে গেছে। আমার সঙ্গে মতপার্থক্য হতে থাকলো। ১৯৪৮-৪৯ সাল থেকেই অল্প অল্প করে ডিফারেন্স শুরু হয়। গানগুলো কেমন যান্ত্রিক মনে হতো। কোথাও যেন পৌঁছচ্ছে না। একটা উদাহরণ দিয়ে বলি। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের একটি গান ছিলো : 'তোরা আয়, আয়রে ছুটে আয়, এই ভারতের হিন্দু-মুসলিম কে আছ কোথায়'। গানের সর্বশেষে ছিল : 'কৃষক সমিতি গড়িয়া তোলো দেশ রক্ষার দায়—' ইত্যাদি। সমবেত নৌকা বাইচের গ্রাম্য সুরে গান। এই গানের রিহার্সাল দিচ্ছি। নির্মল তখন ছিল না। হঠাৎ একজন ছাত্রনেতা বললেন, 'দেশে আন্দোলন ছাত্ররা কিছু করে না বুঝি ? আপনারা ছাত্রদের কথা কিছু বলছেন না কেন ?' হেমাঙ্গদা বললেন, 'হ্যাঁ, তাও তো ঠিক। ওই কথাও তুমি লাগাইয়া দিও : ছাত্র আন্দোলন গড়িয়া তোলো দেশ রক্ষার দায়।' আমরা সেভাবেই রিহার্সাল দিচ্ছি। এবারে মহিলা সমিতির এক মহিলা বললেন, 'আরে, মহিলারা বুঝি কিছু করে না ?' আমরাও গাইলাম : 'আত্মরক্ষা সমিতি গড়িয়া তোলো দেশ রক্ষার দায়।' সবশেষে এলেন — যিনি আমাকে দিয়ে স্তালিনের ছবি আঁকিয়েছিলেন সেই বিনোদবন্ধু দাস। উনি ধাঙর ইউনিয়ন করতেন। উনি বললেন, 'কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে পিজান্টস্ অ্যান্ড ওয়ার্কার্স পার্টি। সবার নামে গান আছে অথচ ওয়ার্কারদের নাম নেই। কী ধরনের গান গাইছেন আপনারা ?' অতএব শেষ লাইন যুক্ত হল : 'ধাঙর ইউনিয়ন গড়িয়া তোলো দেশ রক্ষার দায়।' ওখানে ধাঙররাই ছিলো ওয়ার্কার। আমরাও একটা 'সব দেবতার নাম' দিয়ে লিস্ট বানিয়ে নিয়েছি। মূল গানের তলায় লিস্টিটা রেখে দিয়েছি। শিলচরে অনুষ্ঠান চলছে। মূল গানের শেষ লাইন 'কৃষক সমিতি গড়িয়া তোলো....' গেয়ে নির্মল ছেড়ে দিচ্ছিল। আমি ওকে একটা ধাক্কা দিয়ে ইশারায় লিস্টটা দেখিয়ে দিলাম। নির্মল আমার দিকে একটু তাকাল, তারপর এক নম্বর দু-নম্বর করে আমার সঙ্গে গেয়ে চলল। পরে নির্মল বলল, 'এসব কবে থেকে হল ?' আমি বললাম, 'প্রত্যেকে এসে বলাতে হেমাঙ্গদাই এসব জুড়ে দিয়েছেন।' অন্যান্য অনেক গানেই এধরনের জিনিস ঘটতে থাকল। এইখান থেকেই আমার প্রথম প্রশ্ন জাগে। গানের মধ্যে যান্ত্রিকতা উপলব্ধি করতে শুরু করলেও সেটা ব্যাখ্যা করে কাউকে বুঝিয়ে বলার মতো বুদ্ধি তখন আমার নেই।" শ্রদ্ধেয় মঞ্চশিল্পী শ্রী খালেদ চৌধুরি উপরোক্ত স্মৃতিচারণটি করেছেন 'যোগসূত্র' পত্রিকার অক্টোবর-ডিসেম্বর, '৯২ সংখ্যায় প্রকাশিত 'শিল্পের শর্ত' শীর্ষক লেখাটিতে। '৪৮-৪৯ সালে, যখন আই. পি. টি.এ পুরোদমে কাজ করছে তখন একজন অগ্রণী সঙ্গীতশিল্পীর চিন্তা-ভাবনা কোন্ স্তরে ছিল তার পরিষ্কার চিত্রটি এখানে পাওয়া যায়। এবং সেইসঙ্গে পার্টি-রেজিমেন্টেশন-এর রূপটিও। ঠিক এই প্রসঙ্গে খালেদ বাবুর আরেকটি মন্তব্য : "আই. পি. টি.এ-তে আমরা সবাই একটা উদ্দেশ্যের দ্বারা চালিত হয়েছিলাম, ভাবিত হয়েছিলাম। কিন্তু ওই ভাবনার পেছনে কোথাও একটা শিল্পী-মন ছিল। চেয়েছিলাম আমাদের কাজ শিল্পায়িত হোক। কিন্তু রেজিমেন্টেশন, যান্ত্রিক চিন্তাধারা, স্লোগান-মংগারিং ইত্যাদিই মুখ্য হয়ে উঠল। আজ পর্যন্ত আই. পি. টি.এ-তে ওই ধারাই প্রবহমান। একই জায়গায় রয়েছে। এক ধরনের পুনরাবৃত্তির ছকে কাজ হয়ে চলেছে। সব কাজই ইস্যুভিত্তিক। কখনও হরতাল, কখনও সাম্প্রদায়িকতা, পার্টি-প্রোগ্রাম যেমন হয়ে থাকে।" আশা করি মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

নকশাল আন্দোলন

ভারতবর্ষের শাসক শ্রেণীরা জনগণকে শোষণ ও শাসন করার প্রক্রিয়াটিকে চিরায়ত করার জন্য তাদের প্রবর্তিত শাসন-ব্যবস্থাটিকে সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত ভাবে গণতন্ত্রের শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শুষ্কতাটুকুই যে এতদিন দিয়ে আসছিল তার অন্তর্নিহিত কপটতা, ভণ্ডামি ও অন্তঃসারশূন্যতা প্রথম নগ্ন ভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে নকশাল আন্দোলনের রাজনৈতিক চাপে। ষাটের দশকে বিশ্বজোড়া ছাত্র-যুব আন্দোলনে যৌবনের পুঞ্জীভূত ক্রোধের যে প্রকাশ ঘটেছিল, ভারতবর্ষ ও বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ তা থেকে বাদ ছিল না। এখানকার শিল্প-সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার প্রকাশও পরিলক্ষিত হয়েছে। চলচ্চিত্রে সত্যজিতের 'মহানগর', 'প্রতিদ্বন্দ্বী', 'সীমাবদ্ধ', 'জনঅরণ্য', 'হীরক রাজার দেশে', ঋত্বিকের 'যুক্তি তক্কো গপ্পো', মৃণালের 'ইন্টারভিউ', 'কলিকাতা-৭১' ছবিগুলি সেই ষাট ও সত্তর দশকের 'ক্রোধ' এবং তজ্জনিত রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বুর্জোয়া অ্যালিয়েনেশনের শৈল্পিক প্রতিফলনের সাক্ষ্য বহন করে। এই বিক্ষুব্ধ সময়টাকে শিল্পে ধরার একটা তাগিদ ও উদ্যোগ দেখা

গেছে সাহিত্য নাটক ইত্যাদির ক্ষেত্রেও। আর মজার ব্যাপার হল, বাংলা গানের ক্ষেত্রে, পরিমাণগত ভাবে, এই উদ্যোগের ব্যাপারটা একটু বেশি দেখা গেল। কিন্তু ঘটল এক অদ্ভুত ব্যাপার। সাময়িক এক উত্তেজনায় উদগ্র আবেগের বশবর্তী হয়ে সঙ্গীতের যাবতীয় শিল্পশর্তকে নস্যাৎ করে বাঁধা হতে লাগল একের পর এক স্লোগানধর্মী সব গান একদিকে। টিপিক্যাল এক গণসঙ্গীত-মার্কা সুরে বাঁধা ধাতব গানগুলো গলার শিরা যথাসম্ভব ফুলিয়ে বিভিন্ন দল সমবেত কণ্ঠে গাওয়া শুরু করল। একদল ফিরিয়ে নিয়ে এল গণনাট্যের পুরোনো কিছু গান। আর এক দলের হঠাৎ মনে হল, 'আমরা তো ওদের মতন গ্রামে গিয়ে গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার বিপ্লবী রাজনীতিতে সামিল হতে পারছি না, তাই প্রায়শ্চিত্ত করি যাবতীয় দিশি-বিদেশি লোকগীতির সুর-বেষ্টনী দিয়ে নাগরিক সংস্কৃতিকে ঘিরে ফেলে।' ব্যাস্, শুরু হয়ে গেল 'গান্' দিয়ে শহরের বুকে অ্যাকশন্। সাঁওতালি, বিহু, ভাটিয়ালি, সারি, জারি, চীনা, কিউবান, মেক্সিকান, হনুলুলুয়ান — যেখানে থেকে যা লোক-সুর বা 'ফোক' সুর পাওয়া গেল তার ছাঁচে শ্রেণী সংগ্রাম, সশস্ত্র বিপ্লব, চীন-রাশিয়া-ভিয়েতনামের বিপ্লব, লেনিন-স্তালিন-মাও-হো চি মিন-চে-ভ্যান ত্রয় ইত্যাদি শব্দ অধ্যুষিত রক্তিম বাণী বিপ্লবী কমরেড গীতিকাররা দিলেন পুরে। তৈরি হল গানের হাঁসজারু আর বকচ্ছপরা। সৌভাগ্যের কথা, খুব বেশি দিন সে সব গান টেকেনি। এ প্রসঙ্গে, অনামীদের কথা বাদ দিন, পরলোকগত শ্রদ্ধেয় শ্রী হেমাঙ্গ বিশ্বাসের লেখা ও সুর দেওয়া একটি গানের উল্লেখ এখানে খুবই জরুরি—

আরও বসন্ত, বহু বসন্ত
তোমার নামে আসুক
তুমি তো সূর্য অস্তবিহীন
চির জাগরূক।
ঝড়েরও রাতে তপ্ত বাতাসে
উঠুক ঢেউ যদি ওঠে
চলমান তব বিজয়ী সেনাদল
হাতে হাতে বন্দুক

কারাগারে বন্দীর বন্দনায়
গভীর অরণ্যে গেরিলার পথচলায়
আফ্রো-এশিয়ায়-লাতিন আমেরিকায়
দাবানল জ্বলে জ্বলুক
চলমান তব..........বন্দুক।

মন্তব্য, আশা করি নিষ্প্রয়োজন।

একদিকে এইসব গান, আর অন্য দিকে স্বনামধন্য বিখ্যাত জীবিত অবস্থাতেই কিংবদন্তি শিল্পীরা একের পর গেয়ে চলেছেন 'ললিতা, ওকে আজ চলে যেতে বল্ না', 'এক গোছা রজনীগন্ধা হাতে নিয়ে বললাম', 'ও কেন এ্যাতো সুন্দরী হলো', ইত্যাদি ধরনের আধুনিক গান।

অথচ, 'নগর সঙ্গীত' সৃষ্টি সমস্ত রকম উপাদানপুষ্ট পরিস্থিতি থেকে উঠেছিল ষাটের দশকে। কিন্তু হল না। কারণ অবশ্যই ছিল — না ছিল কোন তাত্ত্বিক পটভূমি, না সত্যিকারের শিক্ষিত সচেতন সমাজমনস্ক সঙ্গীত শিল্পী আর, না শ্রোতাদের চাহিদা।

সব বিচার করে এ কথা বলা বোধহয় আজ তাই অন্যায় হবে না যে গণনাট্য প্রতিষ্ঠা হবার সময় থেকে শুরু করে ষাটের দশকের শেষ পর্যন্ত সলিল চৌধুরি আর প্রবীর মজুমদারের পৃথক পৃথক একক চেষ্টায় কিছু বিক্ষিপ্ত (তুলনামূলকভাবে) 'ভাল গান' তৈ হলেও সে সব গান কোন অর্থেই 'নগর সঙ্গীত' বা 'অন্য গান'-এর উপাদানপুষ্ট ছিল না।

জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়

তবে সমাজবিজ্ঞানের নিজস্ব কিছু নিয়ম আছে। সেই নিয়মানুযায়ী কিছু প্রক্রিয়া ব্যক্তি, গোষ্ঠী, মতবাদ, মতাদর্শ ইত্যাদি নিরপেক্ষভাবে কাজ করে যায় সমাজ জীবনে সকলের অলক্ষ্যেই। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই একটি নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হলে সামন্ততন্ত্রের চরম বিকাশের মধ্যেই জন্ম নেয় তার বিনাশের বীজাণু এবং সেই ব্যবস্থাটি একদিন কর্কট রোগাক্রান্ত হয়ে নিশ্চিতভাবে এগিয়ে যায় তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে। শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও যেহেতু এই নিয়ম প্রযোজ্য তাই তার এই প্রক্রিয়ার গুপ্ত (Latent) দ্বন্দ্ব ও তজ্জনিত একটা চাপ যেন ভেতরে ভেতরে তৈরি হচ্ছিল। এবং সে চাপ কারও কারও অনুভূতিতে ধরাও দিচ্ছিল। সঙ্গীতের জগতে, বরং বলা ভাল আধুনিক বাংলা গানের জগতে, জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায় ঐ বিরল মুষ্টিমেয়র একজন। মূলত গীতিকার ও সুরকার জটিলেশ্বর মানুষ হিসাবে তাঁর সংবেদনশীলতা ও সচেতনতা এবং শিল্পী হিসাবে মননশীল সঙ্গীতমনস্কতা দিয়ে সেই 'চাপ'— যা আসলে সময়ের কাছে শিল্পের দাবি — অনুভব করতে পারলেন প্রথম সেই চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকের সলিল চৌধুরির যুগের পর। তাই তাঁর কলম থেকে একে একে বের হল 'এ কোন্ সকাল ? রাতের চেয়েও অন্ধকার ? একি সূর্য নাকি স্বপনের চিতা ? একি পাখির কূজন নাকি হাহাকার ?'/'তোমার সঙ্গে দেখা না হলে, ভালবাসার দেশটা আমার দেখা হতো না ; তুমি না হাত বাড়িয়ে দিলে, এমন একটি পথে আমার চলা হতো না'/'কেউ বলে ফাল্গুন, কেউ বলে পলাশের মাস, আমি বলি আমার সর্বনাশ ; কেউ বলে দখিনা, কেউ বলে মাতাল হাওয়া, আমি বলি আমার দীর্ঘশ্বাস', — এই রকম সব অসাধারণ গান। সত্যি কথা বলতেকি, বহুকাল পর আধুনিক বাংলা গানের জগতে এমন

এক গীতিকার সুরকার গায়ককে আমরা পেলাম যিনি গানের কথা সম্বন্ধে ধারাবাহিক ভাবে সচেতন। এবং এই সঙ্গে, ভাবের ক্ষেত্রে যথেষ্ট আধুনিক। ভাষায় ততটা না হলেও, ভাবের ক্ষেত্রে আধুনিকতার তিনটি মূল উপাদান — বাস্তবতা, প্রাসঙ্গিকতা, যুগোপযোগিতা — তাঁর গানে পাওয়া যায়। জটিলেশ্বরের গানগুলি শুনলে বোঝা যায় তিনি মননশীল ও সমাজমনস্ক। আর এই মননশীলতার ছাপ সুরের ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়। তাঁর কণ্ঠ আহামরি কিছু নয় ; আর এটাই, আমার মনে হয় আশীর্বাদ। জটিলেশ্বরের গলায় তাঁর তৈরি গান যাঁরা শুনেছেন, তাঁর গায়কীর সঙ্গে যাঁরা ভালমতন পরিচিত, তাঁরা এটা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছেন যে গান ব্যাপারটা শুধুমাত্র সুরেলা রেওয়াজি বা জলদগম্ভীর মেজাজী কণ্ঠে কিছু কথাকে মিষ্টি সুরে গেয়ে যাওয়াই নয়। অর্থ ও ভাবযুক্ত কথায় তৈরি গানকে শ্রোতার কাছে অর্থবহ করে তুলতে হলে, তার কাছে মননগ্রাহী করে তুলতে হলে গায়ককে তার উচ্চারণ ও স্বরপ্রক্ষেপে আনতে হয় এক বিশেষ মাত্রা, এবং তিনি উচ্চারণ করেন তাঁর গান। আর সেই বিশেষ ক্ষেত্রে গায়নের এই প্রক্রিয়াটি শুধুমাত্র গান গাইবার অতিরিক্ত কিছু হয় যা অনন্য এক অভিঘাত সৃষ্টি করে শ্রোতার মননের গভীরে। তিনি গান গান না, গান বলেন। আজ যেমন কবিতা আবৃত্তি করার বদলে শিল্পী পাঠ করেন। সুরের মূর্ছনায় হৃদয় ভাসানো নয়, নির্দিষ্ট স্বর-এবং শব্দের উচ্চারণে মননে কড়া নাড়ানোই হয় এই ধরনের মননশীল গায়কের অভীষ্ট। এবং জটিলেশ্বর, কণ্ঠশিল্পী হিসেবে তাঁর সীমাবদ্ধতা নিয়েও, এই অভীষ্টে সিদ্ধি পেয়েছেন তাঁর গায়কীতে নাটকের উপাদান সঠিক জায়গায় সঠিকভাবে নিয়ে এসে। তাই গীতিকার সুরকার হিসাবে এক অনন্যতার পরিচায়ক হওয়ার পাশাপাশি, গায়ক হিসাবেও স্বাতন্ত্র্যের ছাপ রেখেছেন এবং সফলও হয়েছেন।

আমি আগেই বলেছি আধুনিক বাংলা গানের কোন তাত্ত্বিক পটভূমি নেই। জটিলেশ্বর এ নিয়ে ভেবেছেন নিশ্চয়ই ; কিন্তু জানি না তাঁর নিজের গানের জন্য কোনও শিল্পতত্ত্ব বা নন্দনতত্ত্ব তৈরি করে নিয়েছেন কিনা। তবে গানের বিষয়বস্তু নির্বাচনের ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রেই যে যথেষ্ট সমাজমনস্কতার পরিচয় দেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সেইসঙ্গে, বিষয়বস্তুর বিন্যাস ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বিক বস্তুবাদের প্রয়োগও বেশ লক্ষণীয়। উদাহরণ হিসাবে, 'জোনাকির নাম না কি আঁধার মানিক, আমি তো দেখি আগুন জ্বলে ধিকিধিক্' বা 'খর বৈশাখে প্রথম যেদিন, মেঘের মিছিলে ঐ আকাশ রঙিন তৃষিত হৃদয়ে বাজে আনন্দ বীণ, আমি দেখি ঝড়ের পূর্বাভাস' — গানের অংশগুলি উল্লেখ করা যেতে পারে। লাইনগুলি জটিলেশ্বরের দৃষ্টিভঙ্গিগত বৈশিষ্ট্যেরই সাক্ষ্য বহন করে। আধুনিক গীতিকবিতায় তারল্যের যে জাড্য চলছিল (এবং এখনও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যা চলছে) তার বিপরীতে একটা অন্য ভাবনার দিকনির্দেশ জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায় দিয়েছেন যদিও ভাষাগত সীমাবদ্ধতা আছে। তা থাক। বস্তুত, আজও কার্যক্ষেত্রে আধুনিক বাংলা গানের আধুনিক গীতিকবিতার প্রয়োজনীয়তাটাই মূলত অস্বীকৃত। ব্যতিক্রম হিসাবে যা কিছু বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা হয়েছে ধারাবাহিকতার অভাবে তা আগামী প্রজন্মের কাছে সেভাবে পৌঁছে দিতে পারেনি সেরকম কোন জরুরি বার্তা যা পাথেয় করে কেউ সম্পূর্ণ বিপরীত একটি ধারা — অন্য গান — সৃষ্টির চেষ্টায় ব্রতী হতে পারত নিশ্চিতভাবে গ্রহণ করতে পারত সেই চ্যালেঞ্জ : জগতের যাবতীয় বিষয়, ভাব, ঘটনা, অনুষঙ্গ যা শিল্প-সাহিত্যের অন্যান্য মাধ্যমগুলির কথনে বা দৃশ্যায়নে রসোত্তীর্ণ সময়োত্তীর্ণ হয়ে স্রষ্টার চরম উপলব্ধিকে পাঠক বা দর্শকের উপলব্ধির অংশে পরিণত করতে পারে, তার কোনটাই গানের অগম্য নয়। বাংলা গীতিকবিতার চরম এই দুঃসময়ে জটিলেশ্বরের গান নিঃসন্দেহে একটি দিকনির্ণায়ক — তার অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতা নিয়েই। যে কোন ভাব ও বিষয়বস্তু — তা যত বিরাটত্ব বা (আপাত) তুচ্ছতা নিয়েই বিরাজমান হোক না কেন, তা তাৎক্ষণিক হোক আর চিরায়তই হোক, লৌকিক হোক বা লোকান্তরিক হোক — গান যে সর্বত্রগামী, এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার সাক্ষ্য জটিলেশ্বরের গান এখনও রাখতে পারেনি। তবে অবশ্যই অনস্বীকার্য একথা যে সর্বত্রগামী না হোক মননশীলতার পরিচায়ক তাঁর গান বিচিত্রগামী তো বটেই। শেষ বিচারে একটা কথাই বলা যায় যে আধুনিক বাংলা গানের ইতিহাসে জটিলেশ্বরের গানকে একটি বড় অর্ধচন্দ্রাকার বাঁক হিসাবে উল্লেখ করতেই হবে। বর্তমানে, পরবর্তী প্রজন্মের সুরকার বা সঙ্গীতস্রষ্টাদের কাছে জটিলবাবুর গান অবশ্যই দৃষ্টান্তমূলক।

সুমন চট্টোপাধ্যায়

এ পর্যন্ত আধুনিক বাংলা গান নিয়ে যে পর্যালোচনা করা হল তা থেকে এ কথা পরিষ্কার যে ধনী সুরের আস্কারা ও প্রশ্রয়ে বখাটে বা জোলো শূন্যগর্ভ কথার গানের মাথায় উঠে বসার ঘটনা — যা এখনও শতকরা প্রায় নিরানব্বই ভাগ ক্ষেত্রেই ঘটে চলেছে — বন্ধ করে, আধুনিক গীতিকবিতা (এবং তার যোগ্য সুর ও গায়কী নিয়ে আধুনিক গান) সৃষ্টি করার জন্য — আধুনিক কবিতার সমতুল্য গীতিকবিতা সৃষ্টি করার জন্য, এমন একজন ব্যক্তি শিল্পীর প্রয়োজন ছিল যিনি প্রথমত সুকবি ও শিক্ষিত সুরকার হবেন ; দ্বিতীয়ত হবেন সমাজমনস্ক, সুশিক্ষিত, মননশীল, প্রগতিবাদী, উদার ও সব অর্থে পূর্বধারণামুক্ত আপসহীন এক ব্যক্তিত্বের অধিকারী। সর্বোপরি, যাঁকে হতে হবে মূলত একজন কনসার্নড মানুষ। এবং সেই বহু কাঙ্ক্ষিত ও প্রতীক্ষিত ব্যক্তিটিকে আমরা আজ একটু একটু করে প্রতিভাত প্রকাশিত হতে দেখছি, একজন — শুধুমাত্র একজনের মধ্যেই, যাঁর নাম সুমন চট্টোপাধ্যায়।

সুমনের গানের দুটি ক্যাসেট রেকর্ড কোম্পানি প্রকাশ করেছে যার প্রথমটি বেরিয়েছে ১৯৯২-র প্রথমার্ধে, আর দ্বিতীয়টি ১৯৯৩-র ফেব্রুয়ারির শেষে। দুটি ক্যাসেটে মোট যে চব্বিশটি গান আছে তার বাইরেও বেশ কিছু অনন্যসাধারণ গান পশ্চিমবঙ্গের শ্রোতার একাংশ শুনেছেন, শুনছেন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যার সিংহভাগই একক অনুষ্ঠান। সুমনের গান যাঁরা শুনেছেন তাঁদের অধিকাংশই কয়েকটা ব্যাপারে আশা করি আমার সঙ্গে একমত হবেন : ১। সুমনের গান সর্বার্থে আধুনিক বাংলা গান, ২। রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভ : '....কবিতা ভাবপ্রকাশ সম্বন্ধে যতটা উন্নতি লাভ করিয়াছে, সংগীত ততখানি করে নাই।' এবং উদ্বেগ : 'উত্তরোত্তর আস্কারা পাইয়া সুর বিদ্রোহী হইয়া ভাবের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। এককালে যে দাস ছিলো আর এক কালে সেই প্রভু হইয়াছে। চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি সুখানিচ কিন্তু এই চক্র কি আর ফিরিবেনা ?' — এই দুটি জিনিসের অবসান ঘটতে চলেছে সুমনের গানের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে, ৩। এ গানের কোন পূর্বাপর নেই, এবং ৪। সুমন চাটুজ্জের গান সর্বত্রগামী।

সুমনের নির্মিত আধুনিক বাংলা গানগুলির প্রায় প্রত্যেকটিই আবেদনে অনন্য। তবুও, আমার মতে, অন্যান্য গান বাদ দিয়ে শুধুমাত্র এই চারটে গান — প্রথম ক্যাসেটের 'পাগল' আর 'তোমাকে চাই' এবং দ্বিতীয় ক্যাসেটের 'এক মুহূর্তে' ও 'চালসের গান' শীর্ষক গানগুলি — সঙ্গীত শিল্পের কাছে আধুনিক বাংলা গানের দীর্ঘকালের যা দেনা বাকি ছিল সব চুকিয়ে দিয়েও কিছু উদ্বৃত্ত জমা রাখতে পেরেছে আগামীর ঘরে। সুমনের গান একটা ফেনোমেনান্। রবীন্দ্রনাথের গানের পর এমন নির্দিষ্ট চরিত্রের গান এইরকম ধারাবাহিকতা নিয়ে আর আসেনি। সে হিসাবে এ গান আধুনিক বাংলা গানের বর্তমানের ও আগামীর শিল্পী, গীতিকার ও সুরকারদের কাছে দৃষ্টান্তমূলক।

তবে, এবার যেন সেই আগের ভুলটি কেউ ঘুণাক্ষরেও না করেন ; 'সুমনের গান', 'সুমন চাটুজ্জের গান' বা 'সুমনসঙ্গীত'- জাতীয় লেবেল এঁটে (কৌলীন্য রক্ষার্থে) এ গানের গোত্রান্তর ঘটিয়ে আধুনিক বাংলা গান থেকে এর পৃথকীকরণ না করেন। তাহলে, আধুনিক বাংলা গানেরই সমূহ ক্ষতি। আমি সুমনকেও এখানে অনুরোধ করব তিনি যেন 'আধুনিক বাংলা গানের' স্বার্থে এই ব্যাপারটায় জোর দেন যে তাঁর সৃষ্ট গান মূলত ও সর্বত আধুনিক বাংলা গান — যে গানের কথা ও সুর সুমন চট্টোপাধ্যায়ের। অনন্য হয়েও এ গানের মূল পরিচয় যেন হয় আধুনিক বাংলা গান, 'সুমনের গান' নয়। তাহলে যে আশঙ্কাটা থেকেই যায় সেটি হল — এক সময়ে যেমন 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' বা 'দ্বিজেন্দ্রগীতি' ইত্যাদি লেবেল এঁটে সেই সময়কার সঠিক অর্থের আধুনিক গানগুলোকে আধুনিকতার সংজ্ঞা আরোপ না করে পৃথক করে দেওয়া হয়েছিল ব্যক্তিবিশেষের গান হিসাবে একদিকে এবং অন্যদিকে মন ভোলানো সব অনবদ্য সুরের স্রোতে বয়ে যেতে দেওয়া হয়েছিল শূন্যগর্ভ ভাবহীন জীবনবিবিক্ত অপ্রাসঙ্গিক শব্দমালার জঞ্জালকে আধুনিক বাংলা গানের দৃষ্টান্তরহিত ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন এক মসৃণ খাত দিয়ে, সেই একই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি না ঘটে যায়। তাহলে, ইতিহাসের এবার যে পুনরাবৃত্তি ঘটবে তার ফল হবে মারাত্মক। কারণ, সে যুগে গানের কথা লেখার গতানুগতিক দায়সারা কাজটি অ-কবি ফরমাইশি গান লিখিয়েদের দ্বারা সম্পাদিত হলেও (প্রণব রায়ের মতন ব্যতিক্রম বাদে) সুরোরোপণের দায়িত্বশীল ক্রিয়াটি সম্পাদিত হয়েছে হিমাংশু দত্ত, পঙ্কজ মল্লিক, নচিকেতা ঘোষ, বিনোদ চট্টোপাধ্যায়, সুধীন দাসগুপ্ত, রবীন চট্টোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সঙ্গীতশিক্ষায় শিক্ষিত প্রতিভাবান নিষ্ঠাবান গিমিকে-অবিশ্বাসী সুরকারদের দ্বারা। স্বভাবতই সুরের দোলা বা মূর্চ্ছনা অনেক ক্ষেত্রেই ঢেকে দিয়েছে বাণীর অক্ষমণীয় দৈন্য। কথার দৈন্যে আহত হলেও সঙ্গে ছিল সুরের মলম। কিন্তু গত দশ-পনেরো বছর কি তারও কিছু বেশি সময় ধরে যা চলছে, কথার কথা তো ছেড়েই দিলাম —(সে যুগের কথায় সাহিত্যিক ও ভাষাগত দৈন্য থাকলেও সেই সঙ্গে একরকম অবোধ-সারল্য ও আপাতমাধুর্য কিন্তু ছিল) সুরাঘাতেই শ্রবণেন্দ্রিয় বিকল ও আত্মারাম প্রায় খাঁচা ছাড়ার জোগাড়। তাই আজ আধুনিক বাংলা গানের সচেতন শ্রোতার কাছে এই গানের একমাত্র সঠিক সংজ্ঞাটি প্রতিভাত হওয়া একান্তই জরুরি। বাংলা গানের এই 'জরুরি-অবস্থাকালীন' সংকটের মাঝে সুমনের লেখা সুর দেওয়া ও গাওয়া গানগুলি আজ আমাদের সামনে তুলে ধরেছে আধুনিক বাংলা গানের দীর্ঘ কাঙ্ক্ষিত রূপটি। এ অবস্থায় আমরা নিশ্চয়ই চাইব না এ গানকে 'সুমনের গান'-এর লেবেল এঁটে এক বিশেষ ধরনের গান হিসেবে চিহ্নিত করে 'আধুনিক বাংলা গান'-এর খাতটিকে ছেড়ে দিতে আজকালকার স্বঘোষিত গান-লিখিয়ে আর সুরকারদের হাতে— যে খাত দিয়ে ভেসে চলেছে সঙ্গীতের সেই পূতিগন্ধময় গলিত শব যাকে এখনও অধিকাংশ শ্রোতা আধুনিক বাংলা গান হিসাবে জানেন ও মানেনও। বরং দাবি করব এটাই, সঙ্গীতের যে খাতে বিশৃঙ্খল, মানবতাহীন, বাজারসর্বস্ব, সস্তা চটকদার বাংলা গানের বিনোদন তরীটি এখনও দিব্যি বয়ে চলেছে সেই খাতেই বিপরীত স্রোত সৃষ্টি করুক সুমন নির্মিত এই গান। চাইব, এ-গান চিহ্নিত হোক এক সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী বাংলা গান হিসাবে — যুগধর্মে দীক্ষিত আধুনিক বাংলা গান হিসাবে। এবং সর্বান্তকরণে আশা করব যে আজ নয় কাল এই উল্টো স্রোতের আঘাতে নিমজ্জিত হবে ঐ বিনোদন তরীটি আর সেই সঙ্গে পরিশ্রুত হবে বাংলা গানের চরিত্র, অন্তরাত্মা।

সুমন গান বাঁধেন না, নির্মাণ করেন ; গান না, উচ্চারণ করেন। তিনি আমাদের জীবনের বিষয়কে, জরুরি বিষয়গুলিকে,

মনের অন্তরঙ্গ ভাবগুলোকে, ভাষা দেন আধুনিক বাংলা গানের দেহে। তাঁর গান কখনও সমালোচনার হাতিয়ার, কখনও বা আবার সব বক্তব্যকে জানিয়ে দেবার মাধ্যম। তাই সব অর্থেই এ গান আমাদের কাঙ্ক্ষিত আধুনিক বাংলা গান — আমাদের গান — 'সুমনের গান' নয়।

বাংলা গানে আধুনিকতার যে ধারা রবীন্দ্রনাথের গান দিয়ে শুরু এবং বিক্ষিপ্তভাবে হলেও কিছুটা বহমানতা পেয়েছে সলিল চৌধুরি, প্রবীর মজুমদার আর জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের সৃষ্টিতে সেই ধারাটিতেই এসেছে আজ এক নতুন জোয়ার। এর তীব্রতা/ঝাঁঝ, যুগমানসের প্রস্তুতির তুলনায় হয়ত একটু বেশিই; তাই কোথাও কোথাও এ গানকে কেউ কেউ হয়ত ভুল বুঝতে পারেন। তবু বলা যায়, বলটা বোধহয় দরকারও যে এই প্রজন্ম ও পরবর্তী প্রজন্মের কাছে এই গান 'আধুনিক বাংলা গান'-এর সঠিক দৃষ্টান্ত। এই আধুনিকতা বাস্তব সত্য। তাই, এ গান যেন তার কৌলিন্য রক্ষার্থে 'সুমনের গান' হিসাবে আঁতাগার্দদের সাংস্কৃতিক'তাকে তোলা না থাকে, বরং বলা ভাল, সেরকম কোন চক্রান্তে না পড়ে; নেমে এসে যেন হাত ধরে সেইসব সাধারণ মানুষের যাঁরা তথাকথিত আধুনিক বাংলা গানের গড্ডালিকায় এখনও ভাসমান এবং একই সঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক, অর্থহীন, অশ্লীল, অবক্ষয়ী গানের নিষ্ঠাবান ধারক-বাহকদের চাতুরি ছলনা ও চক্রান্তে মুহ্যমান।

লেখাটি শেষ করার আগে পূর্বোল্লিখিত সুমনের চারটি গানের অংশ-বিশেষ বা পুরোটা এখানে তুলে দিচ্ছি সেইসমস্ত পাঠকদের জন্য যাঁরা এখনও তাঁর গান শোনেননি। এর ফলে আমার বক্তব্য যাচাই করে নিতে তাঁদের সুবিধা হবে।

'তোমাকে চাই'

প্রথমত আমি তোমাকে চাই/দ্বিতীয়ত আমি তোমাকে চাই
তৃতীয়ত আমি তোমাকে চাই/শেষ পর্যন্ত তোমাকে চাই
নিঝুম অন্ধকারে তোমাকে চাই/রাতভোর হলে আমি তোমাকে চাই
সকালের কৈশোরে তোমাকে চাই/সন্ধ্যের অবকাশে তোমাকে চাই
....
কবেকার কোলকাতা শহরের পথে/পুরনো নতুন মুখ ঘরে-ইমারতে
অগুণতি মানুষের ক্লান্ত মিছিলে/অচেনা ছুটির ছোঁয়া তুমি এনে দিলে
নাগরিক ক্লান্তিতে তোমাকে চাই/এক ফোঁটা শান্তিতে তোমাকে চাই
বহুদূর হেঁটে এসে তোমাকে চাই/এ জীবন ভালবেসে তোমাকে চাই
চৌরাস্তার মোড়ে পার্কে দোকানে/শহরে-গঞ্জে-গ্রামে এখানে-ওখানে
স্টেশনে টারমিনাস ঘাঁটি বন্দরে/অচেনা ড্রইংরুমে চেনা অন্দরে
বালিশ-তোষক-কাঁথা-পুরনো চাদরে/ঠাণ্ডা শীতের রাতে লেপের আদরে
কড়িকাঠে চৌকাঠে মাদুরে পাপোশে/হাসি-রাগ-অভিমান-ঝগড়া আপসে
তোমাকে চাই, তোমাকে চাই, তোমাকে চাই, তোমাকে চাই
এক কাপ চায়ে আমি তোমাকে চাই/ডাইনে ও বাঁয়ে আমি তোমাকে চাই
দেখা না দেখায় আমি তোমাকে চাই/না-বলা কথায় আমি তোমাকে চাই
....
সলিল চৌধুরির ফেলে আসা গানে/চৌরাসিয়ার বাঁশি মুখরিত প্রাণে
ভুলে যাওয়া হিমাংশু দত্তর সুরে/সেই কবেকার অনুরোধের আসরে
তোমাকে চাই.....
....
অধিকার বুঝে নেওয়া প্রখর দাবিতে/সারারাত জেগে আঁকা লড়াকু ছবিতে
ছিপছিপে কবিতার ছন্দে ভাষায়/গদ্যের যুক্তিতে বাঁচার আশায়
শ্রেণীহীন সমাজের চির বাসনায়/দিন-বদলের খিদে ভরা চেতনায়
দ্বিধা-দ্বন্দ্বের দিন ঘোচার স্বপ্নে/সাম্যবাদের ডাক ঘুমে-জাগরণে
বিক্ষোভে-বিপ্লবে তোমাকে চাই/ভীষণ অসম্ভবে তোমাকে চাই
শান্তি-অশান্তিতে তোমাকে চাই/এই দিগ্‌ভ্রান্তিতে তোমাকে চাই।

'পাগল'

একমুখ দাড়ি-গোঁফ/অনেক কালের কালো ছোপছোপ
জট পড়া চুলে তার/উকুনের পরিপাটি সংসার
পিচুটি চোখের কোণে, দৃষ্টি বিস্মরণে মগ্ন
বাবু হয়ে ফুটপাতে একাএকা দিনরাত রঙ্গে
পাগল, পাগল — সাপলুডো খেলছে বিধাতার সঙ্গে।
চাল-চুলো নেই তার/নেই তার চেনা বা অচেনা
আদমসুমারী হলে/তার মাথা কেউ গুনবে না
তার ভোট চাইবে না গণতান্ত্রিক কোন প্রার্থী
সরকারে দরকার নেই তাই নিজের সুড়ঙ্গে
পাগল, পাগল — সাপলুডো খেলছে বিধাতার সঙ্গে।
....
বটতলা-চুম্বনপদ্ধতি-পেটমোটা ব্যাকরণ বই

ধর্ম বা রাজনীতি ঠাকুরের ছবি থেকে হরিবোল খই
সারিবাদি-সালসা বা ভোগের লালসা আর আভোগীতে গান
হঠাৎ হাসপাতালে অকারণে ফাঁকতালে মহাপ্রয়াণ
ভিডিও ক্যাসেটে আর নীল সোফাসেটে বসে মিঠে খুনসুটি
লক-আউট কারখানায় তামাদি মজুরি আর কেড়ে নেওয়া রুটি
জগতে যা কিছু আছে
কিছু নেই তার অনুষঙ্গে
পাগল, পাগল সাপলুডো খেলছে বিধাতার সঙ্গে॥

'এক মুহূর্তে'

এক মুহূর্তে ফিরিয়ে দিলে/সহজ চোখে তাকিয়ে থাকা
ওইতো তোমার চোখেই আমার/সদ্য লেখা পদ্য রাখা
পদ্যটাকে সুর ছোঁয়ালে/গান হবে দুজন মিলে
সহজ কৌতূহলের অঙ্ক/চোখের ছোঁয়ায় মিলিয়ে দিলে
এক মুহূর্তে মিলিয়ে দিলে.....
বয়স বলে বাড়ছি দেখ/মৃত্যু বলে কাছেই আছি
জীবন বলে কোথায় জীবন/খেলছি শুধু কানামাছি
বুদ্ধি বলে গোছাও কিছু/আখের-মার্কা মরীচিকা
ফুরোবে সব চিতার কাঠে/এই তো জীবন ধ্যাৎতেরিকা
ধ্যাৎতেরি আর ধ্যাৎতেরিকা — বলতে বলতে সময় কাটে
বিরক্তিহীন বাঁচতে চাওয়ার/ইচ্ছে এখন ব্যাগার খাটে
বেদম বেহাল ইচ্ছেটাকে/চলতে-চলতে কুড়িয়ে নিলে
সহজ চোখের ছোঁয়ায় তুমি/আমার চোখে ফিরিয়ে দিলে
এক মুহূর্তে.....

'চালসের গান'

আজকে যে বেপরোয়া বিচ্ছু/শান্ত সুবোধ হবে কাল সে
চোখের সঙ্গী হবে চশমা/চল্লিশ পেরলেই চালসে
আজকে যে আড্ডায় মগ্নশুল/নির্ঘাদ্ধব হবে কাল সে
হরিহর-আত্মা শুধু চশমা/চল্লিশ পেরলেই চালসে
আজকে যে শিস দিয়ে গান গায় (২)/কোন্ গান শুনবে হে কাল সে
চোখ থেকে খুলে নিয়ে চশমা/ভুলে যাবে চোখে আছে চালসে
....
আজকে যে প্রতিবাদী কণ্ঠ/সর্বংসহা হবে কাল সে
সয়ে যাবে অসহ্য চশমা/চল্লিশ পেরলেই চালসে
অথবা যে আজ নিঃসঙ্গ/সশব্দে ফেটে যাবে কাল সে
ভুলে যাবে চোখে আছে চশমা/ভুলে যাবে চোখে আছে চালসে
আজকে যে শিস দিয়ে গান গায় (২)/যেন গান গেয়ে ওঠে কাল সে
চোখ থেকে খুলে নিয়ে চশমা/মন থেকে মুছে দিয়ে চালসে
কাল সে, কাল সে।

বাংলা ভাষা দীর্ঘজীবি হোক। দীর্ঘজীবি হোক আধুনিক বাংলা গান।

সংযোজন

এই প্রবন্ধটির প্রথম সংশোধিত খসড়াটি লেখা হয় '৯২-এর ডিসেম্বরে। তারপর মাস দুয়েকের বেশি সময় কেটে যায় বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকদের জবাবের প্রতীক্ষায়। অনামী প্রারব্ধিকের ভাগ্যের শিকে ছেঁড়ার ফাঁকতালে বেরিয়ে যায় সুমনের দ্বিতীয় ক্যাসেটটি। ফলে লেখার শেষ অংশে করতে হয় কিছু পরিবর্তন — সংযোজনের আকারে।

যাই হোক, লেখাটি এই পত্রিকায় দেবার কিছুদিন পর, পুজোর আগে, নচিকেতা চক্রবর্তীর একটি আধুনিক গানের ক্যাসেট (এই গীতিকার-সুরকার-গায়কের প্রথম) ও সুমনের 'ইচ্ছে হল' শীর্ষক তৃতীয় ক্যাসেটটি প্রকাশিত হয়। ফলত লেখাটিতে সুমনের কিছু আলোচনা অনুল্লিখিত রয়ে গেল। এককথায় আপাতত বলে রাখি, একত্রিশ বছরের আধুনিক বাংলা গানের কারিগর, নচিকেতা, ভাবের ও কিছুটা ভাষার পরিমার্জনা সাপেক্ষে, যথেষ্ট সম্ভাবনাময়। বারোটি গানের এই ক্যাসেটটিতে 'যখন সময় থমকে দাঁড়ায়' ও 'চোর' — এই গান দুটি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। যাই হোক, যেহেতু আজ সুমন ও নচিকেতা দুজনের গানই যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, উপরোক্ত অনুল্লেখ, '.....এই গান আধুনিক বাংলা গানের সঠিক দৃষ্টান্ত। এই আধুনিকতা বাস্তব।' — প্রবন্ধের এই উপসংহারের সাথে একমত (বা ভিন্নমত, অবশ্যই যুক্তি সাপেক্ষে) পোষণ করার ক্ষেত্রে আশা করি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে না।

গ্রন্থ সমালোচনা

সমকালের নামে একালের বিদ্যাসাগর বিচার

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়

একালের বিচার নয়, সমকালে বিদ্যাসাগরকে কী চোখে দেখা হত? খুবই কৌতূহলপ্রদ প্রসঙ্গ। 'সমকালে বিদ্যাসাগর' লিখে স্বপন বসু আমাদের পৌঁছে দিলেন সেকালে। গন্থটির পরিচিতিমূলক প্রচ্ছদ পত্রে বলা হয়েছে 'সমকালীন শতাধিক পত্র-পত্রিকা, প্রকাশিত অপ্রকাশিত সরকারি নথিপত্র, মিশনারি পুস্তক-পুস্তিকা অবলম্বনে সমকালের চোখে বিদ্যাসাগরকে তুলে ধরাই এ বইয়ের লক্ষ্য।' এতে রয়েছে মোট চারটি অধ্যায়। প্রথম তিনটি অধ্যায়ে সমকালের চোখে তিন বিদ্যাসাগরকে দেখে নেওয়া — সমাজ সংস্কারক, লেখক ও মানুষ। পরিশেষ অধ্যায়ে নিন্দা প্রশংসার নেপথ্য রহস্য ভেদ করার একটি একান্ত ব্যক্তিগত চেষ্টা। শ'দুই পৃষ্ঠার বই। গবেষণামূলক। কিন্তু সাগ্রহে পড়ে ফেলা যায়। বিদ্যাসারকে ঘিরে সমর্থন ও বিরোধিতার বৈপরীতাময় তথ্য দিয়ে সাজানো এক তর্জার লড়াই। কাসুন্দি পুরানো হলে বোধ হয় ঝাঁঝ বেশি হয়। অবিশ্বাস করার কিছু নেই। উদ্ধৃতি-উৎসসূত্র দুই-ই আছে। পেরিয়ে আসা শতকের কণ্ঠস্বর শোনার ব্যবস্থা করে দেবার জন্য প্রথমেই লেখককে সাধুবাদ জানাই।

বইটি পড়লে পাঠক জানতে পারবেন অনেক মজাদার ও বিতর্কিত তথ্য; বাল্যবিবাহ বিধবাবিবাহ বহুবিবাহ প্রভৃতি সমাজ-সংস্কারমূলক কর্মে বিদ্যাসাগরের উদ্যোগ উদ্যম নিয়ে তাৎকালিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ঘটনাগুলি। বিধবাবিবাহের পক্ষে আবেদন পেশ করার কিছুদিন পরে (২৫ নভেম্বর ১৮৫৫) রাধাকান্ত দেবের বাড়িতে রক্ষণশীল হিন্দুদের এক বিরাট সভা হয়। অনুষ্ঠানে ঘন ঘন 'হরিবোল' ধ্বনির মধ্যে বিধবাবিবাহ বিষয়ক আইনের বিরোধিতা করার জন্য 'হিন্দু ধর্ম রক্ষা সভা' প্রতিষ্ঠিত হয় (পৃ: ৩৫)। পক্ষে বিপক্ষে আবেদন নিবেদনের পালা শেষ হলে দেখা গেল বিধবাবিবাহ আইনের প্রতিকূলে স্বাক্ষরকারীর সংখ্যা ৫৫,৭৬৪, সমর্থনে স্বাক্ষরকারী ৫,১৯২ (পৃ: ৩৬)। প্রথম অধ্যায়টি পড়লে জানা যাবে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের মতো বুদ্ধিজীবীরা বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কার প্রয়াসের বিরোধিতাই করেছিলেন।

সমকালের চোখে লেখক বিদ্যাসাগর অংশটি গ্রন্থের আকর্ষণীয় অংশ। পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা হিসাবেই বিদ্যাসাগর আবির্ভূত হয়েছিলেন সাহিত্য ক্ষেত্রে। সেকালের বড়রা বিদ্যাসাগরকে পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা ও অ-মূলানুগ অনুবাদকের অতিরিক্ত সম্মান প্রায় কেউই দিতে চাননি। ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছিলেন,

> তোমার কি আছে পুঁজি? সকলেরই ধারো
> ধার করা ভাব লয়ে, যা করিতে পারো। (পৃ. ১২১)

'বেতাল পঞ্চবিংশতি' সম্পর্কে একটি পত্রিকা মন্তব্য করেছিল 'নেড়ির দলের গানের যোগ্য খেউড় গ্রন্থ।' অশ্লীলতার অভিযোগে বইটিকে হিন্দুকলেজের পাঠ্যসূচিতে ঢোকাতে চাননি রসময় দত্ত (পৃ. ১০০)। 'সীতার বনবাস' সম্পর্কে স্বয়ং বঙ্কিম বলেছিলেন, 'কান্নার জোলাপ'। মার্ডোক দীর্ঘ তেরো বছর ধরে ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন বিদ্যাসাগরের বই মিশনারি স্কুলের পাঠ্যসূচি থেকে যাতে বাদ দেওয়া যায়।

সমকালের চোখে মানুষ বিদ্যাসাগর অংশটি তুলনায় দুর্বল। কিছু চমকপ্রদ তথ্য অবশ্য আছে এখানে। যেমন উড্রো গরীব ছাত্রদের জন্য বিদ্যাসাগরকে তাঁর বইয়ের দাম কমাতে বললে বিদ্যাসাগর তাঁর মুনাফা কমাতে রাজি হননি। বা কালিদাস মৈত্রের লেখা ভূগোল বই সম্পর্কে তিনি আপত্তি জানিয়েছিলেন এইজন্য যে তাতে হিন্দুধর্ম বিরোধী কথা আছে। দেখানো হয়েছে একগুঁয়ে, অহংকারী এবং স্বার্থপর লোকটি বহু ব্যাপারেই ছিলেন সাধারণ পর্যায়ের।

পরিশেষে 'নিন্দা প্রশংসার নেপথ্যে' নামক অধ্যায়ে শ্রী বসু দেখাতে চেয়েছেন উনিশ শতকে বাংলার সমাজ জীবনে যে চারটি গোষ্ঠী ছিল: রক্ষণশীল, ব্রাহ্মসমাজী, ইয়াং বেঙ্গল, খ্রিস্টান মিশনারি — সবদলের মধ্যেই তাঁর নিন্দাকারী ও প্রশংসাকারীরা ছিলেন। তাঁর মতে 'বিদ্যাসাগরের নিন্দা-প্রশংসার গোটা ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে আছে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কের উপর।' (পৃ. ২০১)

একালের মানুষের অধিকারের বাইরে বিদ্যাসাগর বিষয়ক যে সব মতামত বা তথ্য পত্র-পত্রিকায়, নথিপত্রে, পুস্তক-পুস্তিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল সেগুলির কিছু কিছু তুলে এনে স্বপন বসু পত্র-পত্রিকা নির্ভর গবেষকের সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছেন। ডকুমেন্টেশনের দিক থেকে এ গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু গ্রন্থটিকে শুধু তথ্য সংকলন বললে ভুল হবে, গবেষক এটিকে মূল্যায়ন গ্রন্থে রূপান্তরিত করতে চেয়েছেন। প্রাপ্ত তথ্যগুলিকে তিনি যেভাবে পরিবেশন করেছেন, তথ্যবিশেষের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন নিজস্ব মন্তব্য বা ক্যাপশন তাতে এটি শুধু সমকালের চোখে বিদ্যাসাগর নামক নিরপেক্ষ নিস্পৃহ তথ্যগ্রন্থ হয়ে নেই, একালের গবেষকের চোখে বিদ্যাসাগরের মূল্যায়ন গ্রন্থও হয়ে উঠেছে। গবেষক তো সেকালের নন, তিনি

একালের মানুষ। কাজেই সেকালের তথ্য দিয়ে একালের মূল্যায়ন রচনা করতে গেলে যেমন দরকার তথ্যের সঙ্গে নির্লিপ্ত নিরাপদ দূরত্ব, তথ্যের ওজন যাচাই করার তীক্ষ্ণ বিচারবোধ তেমনই থাকা দরকার সময় ও ব্যক্তিত্বের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে একটি গভীর ইতিহাসবোধ। তথ্যময় সময় হচ্ছে একটা আদালত গৃহ। সেখানে বিচারকও আছেন, বিচার্য ব্যক্তিও আছেন। কার সামনে হাতুড়ি, টেবিল থাকবে, আর কার তিন পাশে থাকবে কাঠগড়ার ফ্রেম, সেটা ঠিক করে দেওয়ার দায়িত্ব সংকলক-সমালোচকের। গ্যালিলিও নিশ্চয়ই সমকালের কাঠগড়ায় আসামীই ছিলেন, বিচারকের আসনে ছিল পোপচালিত মধ্যযুগীয় মানসিকতা। এ-চিত্র যদি কোনো গবেষক খুঁটিয়ে তুলে আনতে চান.আপত্তির কি আছে? কিন্তু আপত্তি থাকবে তখনই যখন দেখা যাবে সেকালের বিচারকে নিরপেক্ষ ও তথ্যনিষ্ঠভাবে তুলে ধরার ভান করে একালের গবেষক তার সঙ্গে এমন সব মন্তব্য বা ক্যাপশন জুড়ে দিচ্ছেন গ্যালিলিও সম্পর্কে পোপ বা কার্ডিনালদের উত্থাপিত প্রশ্নটাই যেখানে বড় করে দেখানো হচ্ছে। গ্যালিলিওর সঙ্গে পোপতন্ত্রের সংঘাতের আসল জায়গাটাকে ঢেকে দিয়ে যদি সেটিকে দেখানো হয় ব্যক্তিগত স্বার্থদ্বন্দ্ব হিসাবে — তাহলে বুঝতে হবে ইতিহাসে গ্যালিলিওর অবস্থান বিন্দুটিই তিনি বোঝেননি বা বুঝতে চাননি। এই ধরনের গবেষণায় যত তথ্যই থাক, বিচার বা মূল্যায়নমূলক গ্রন্থ হিসাবে তা বিভ্রান্তিকর বা ব্যর্থই বলতে হবে। দুঃখজনক হলেও একথা না বলে পারছি না, বিদ্যাসাগর ও সমকালের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে স্বপন বসু 'সমকালে বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে এই মহৎ ভুলটিই করেছেন।

প্রসঙ্গ ও পরিস্থিতি বিচ্যুত করে এখানে কিছু তথ্য এমনভাবে ক্লোজ আপে তুলে আনা হয়েছে বা ভেরি ভেরি ইম্পরটেন্ট হিসেবে আন্ডারলাইন করে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে সচেতন পাঠক বুঝতেই পারবেন এর পিছনে তথ্য উদ্ধারের গবেষকোচিত নিরপেক্ষতার ভান থাকলেও নিরপেক্ষতা নেই। উৎকলিত তথ্যের এপাশে ওপাশে যে সব মন্তব্য রয়েছে তার অধিকাংশই যে সত্তর দশকের গর্ভজাত 'ডিবাঙ্কিং' মানসিকতা প্রণোদিত তাতে সন্দেহ নেই। উদাহরণ স্বরূপ দু'একটা উদ্ধার করি। উড্রো বিদ্যাসাগরকে বইয়ের দাম কমাতে বললে বিদ্যাসাগর রাজি হননি — এই তথ্যটির পর মন্তব্য করা হয়েছে 'এর মধ্যে দিয়ে বিদ্যাসাগর চরিত্রের স্ববিরোধ ফুটে উঠেছে। একদিকে তিনি শিক্ষাবিস্তারে আগ্রহী, অন্যদিকে শিক্ষাবিস্তারের প্রয়াস ব্যাহত হচ্ছে জেনেও মুনাফা কমাতে অনাগ্রহী' (পৃ. ১৭৮)। কে এই উড্রো? ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনযন্ত্রের শিক্ষাবিভাগের এক পদস্থ আমলা মাত্র। এদেশের দরিদ্র ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের মহান কাজটা কি তিনি বিদ্যাসাগর প্রণীত গ্রন্থের উচ্চমূল্যের জন্যই সম্পাদন করে যেতে পারেননি? দরিদ্র ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের কতটা আগ্রহ থেকে তিনি বিদ্যাসাগরকে বইয়ের দাম কমানোর কথা বলেছিলেন, কতটাই বা সরকারি টাকা সাশ্রয় করার মতলব বা বিদ্যাসাগরকে হেনস্থা করার উদ্দেশ্য নিয়ে পূর্ববর্তী অনুরোধ ও পরবর্তী মন্তব্য করেছিলেন তা উনিশ শতকের সচেতন গবেষকের না জানার কথা নয়। বিদ্যাসাগরের লড়াই একমাত্রিক ছিল না। বানিয়া ইংরেজ প্রশাসনের সাজানো কাঠামোর মধ্যে (দ্বারকানাথের মতো প্রিন্স যেখানে প্রায় ব্যর্থ) দাঁড়িয়ে হাঁটুর উপর কাপড় পরা এক পণ্ডিত চাকরির পাগড়ি খুলে মাথা উঁচু করে কলকাতার বুকে যেভাবে বাণিজ্য করে গেলেন দুর্ভাগ্যক্রমে তার তাৎপর্য বুঝতে ব্যর্থ হলেন আমাদের গবেষকরা। উড্রো এমন কিছু ফিতে নয় যা দিয়ে মাপা যাবে বিদ্যাসাগরের বহর। রেনেসাঁসের কথা বলা হয়, 'রিভাইভ্যাল অব লার্নিং'-এর যুগ হিসাবে। ইতালীয় রেনেসাঁস সম্পর্কে অল্পবিস্তর পড়াশুনার সূত্রে বলতে পারি বহু শিক্ষাদরদী শিক্ষক সে সময় আবির্ভূত হয়েছিলেন কিন্তু এমন কোন শিক্ষাদরদীকে সেখানেও দেখিনি, যিনি জুন-জুলাই মাসের প্রখর রোদ মাথায় করে গ্রামে-গ্রামান্তরে বিদ্যালয় স্থাপন করে বেড়িয়েছিলেন, সেখানে উড্রোস্য কা কথা।

সমাজ সংস্কারক, লেখক বিদ্যাসাগর, মানুষ বিদ্যাসাগর তিনটি অধ্যায়েই পাতায় পাতায় উৎকলিত তথ্যের ফাঁকে ফাঁকে এমন সব মন্তব্য গুঁজে দেওয়া হয়েছে যা শুধু হাস্যকর নয়, বিভ্রান্তিকরও। সব আলোচনা করা সম্ভব নয়। দু'একটা উদাহরণ দিই। সমাজ সংস্কারমূলক অধ্যায়ের শেষে একটি ছোট্ট মন্তব্য করা হয়েছে যে বহু বিবাহ আইনের দাবি বঙ্কিম বা বিদ্যাসাগর করে আসছিলেন স্বাধীন ভারতে সেই আইন হয়েছে, তাতে শ্রী বসু মন্তব্য করেছেন 'সমাজ সংস্কারক হিসাবে অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের দূরদৃষ্টির প্রশংসা করতেই হয়' (পৃ. ৮৯)। বিদ্যাসাগরের ভাগ্য।

সাহেব মুরুব্বির জোরে বিদ্যাসাগর নিজের ব্যবসায়িক স্বার্থরক্ষামূলক অনেক উদ্দেশ্য হাসিল করতেন এ বক্তব্য পরমেশ আচার্য 'ব্যবসায়ী বিদ্যাসাগর' নামক একটি ব্যাজস্তুতিমূলক রচনায় এনেছিলেন (অনুষ্টুপ, ১৯৮৬, ১ম সংখ্যা)। 'তারই পুনরুচ্চারণ এখানে পাওয়া যায়। শ্রী বসু লিখেছেন "বেতাল পঞ্চবিংশতি" সম্পর্কে সমকালের বিরূপ ধারণাকে দূর করার জন্য বিদ্যাসাগরকে বারবার বিদেশিদের শরণাপন্ন হতে হয়েছে। মার্শম্যান এবং মার্শালের অকুণ্ঠ সহযোগিতা না পেলে এটি পাঠ্যপুস্তক হিসাবে চালু হতে পারত কিনা সন্দেহ। বিনা কারণে বিদ্যাসাগর যে নিজের ঘরে মার্শালের প্রতিকৃতি রাখেননি, তা বোঝাই যাচ্ছে।' (পৃ. ১০১) — এই সরল সমীকরণটি পাঠ করে সাধারণ পাঠক মনে করতেই পারেন বিদ্যাসাগর আমাদের চারপাশে বিদ্যমান ধান্দাবাজ, তোষামুদে ব্যক্তিদেরই একজন মাত্র। বিদ্যাসাগর কি তাই ছিলেন? কী ভয়ঙ্কর আত্মমর্যাদা

সম্পন্ন মানুষ ছিলেন তিনি। কর্মহীন ও আর্থিক দিক থেকে সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত বিদ্যাসাগরকে সিসিলি বিডন একবার প্রেসিডেন্সি কলেজে সংস্কৃত অধ্যাপকের চাকরি দিতে চাইলে তদুত্তরে বিদ্যাসাগর লিখলেন, চাকরিটা তাঁর খুবই প্রয়োজন তবে ইউরোপীয় শিক্ষকদের তুলনায় দেশীয় অধ্যাপকদের কম বেতন দেওয়ার যে রীতি চালু আছে তাতে তাঁর পক্ষে সে চাকরি নেওয়া সম্ভব নয়। (.....'my vanity would not permit me to serve if the salary which European professors of the institution, is not allowed to me') অহংকারী ছিলেন বৈকি! ভয়ঙ্কর অহংকারী। বিডন যদি সেভাবে তাকে চিত্রিত করে থাকেন দোষের কিছু নেই। কিন্তু অহংকারের এই অলংকার যাঁর গলায় আমরা তাঁকে কী চোখে দেখব?

মাইকেল অ্যাঞ্জেলো সম্পর্কে আরেতিনো একবার বলেছিলেন, 'জগতে অনেক রাজা আছে কিন্তু মাইকেল অ্যাঞ্জেলো মাত্র একজন।' বিদ্যাসাগর সম্পর্কেও সেকথা বলা যেতে পারত। গোটা উনিশ শতক জুড়ে বিভিন্ন স্রোতের কাটাকুটি খেলা। বিদ্যাসাগর দাঁড়িয়েছিলেন তার মধ্যে 'প্রমিথিউস আনবাউন্ড'। সমকালের ঘষা দর্পণে তাঁর বাঁকাচোরা ছবি যেটুকু ধরা পড়েছে তাকে তির্যক মন্তব্যের ক্যাপশনে ফেলে আরো ঘুলিয়ে দিয়েছেন গবেষকবন্ধু। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সমকালের সংঘাত, সংগ্রামের নেপথ্য-রহস্য কি শুধু ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল? বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে স্বাক্ষর সংগ্রহের তুমুল অভিযানকে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কের রহস্যসূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে তো? ইতিহাস রুচিমাফিক কিছু তথ্যের যোগফল নয়; ছাপার অক্ষরও নয় ভগবানের সহোদর ভাই। সব মুদ্রিত তথ্যই কি ইতিহাস নির্মাণের উপাদান? বিশেষ করে সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রে কি না ছাপা হয়! যে যার পছন্দ মতো তথ্য সেখানে পেতে পারেন। কোন ঘটনা বা ব্যক্তিবিশেষকে নিয়ে চূড়ান্ত প্রশংসা বা চূড়ান্ত নেতিবাচক মতামত একই সঙ্গে মুদ্রিত হচ্ছে এতো আমরা অহরহ দেখছি। বিদ্যাসাগরের সময় সংবাদ বা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত মতামত শুদ্ধ তুলসী পাতা ছিল —এরকম মনে করার কোন কারণ নেই। বিধবা বিবাহের পক্ষে বিপক্ষে স্বাক্ষর সংখ্যার অনুপাতকে যদি মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করা হয় তাহলে দেখাই যায় সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকে বিদ্যাসাগরের সমর্থনের তুলনায় বিরোধিতা ছিল অন্তত এগারোগুণ বেশি। বিদ্যাসাগর সম্পর্কে প্রকাশিত বক্তব্যে বা মন্তব্যে তার ছাপ পড়বে না এটা হতে পারে না। সংবাদ বা সাময়িক পত্র নির্ভর গবেষণার অন্যতম ঋত্বিক যোগেশ বাগলের সংবাদপত্রের উপর একটা প্রশ্নহীন নির্ভরতা ছিল। বিনয় ঘোষের কাজকর্ম সে তুলনায় অনেক গভীর ও ভারসাম্যযুক্ত। সংবাদ ও সাময়িক পত্রের পাতায় পাতায় তিনি ঘুরতেন ঠিকই, কিন্তু বাঁশবনে ডোমকানা হননি। গভীর ও সমাজতাত্ত্বিক ইতিহাসবোধের অধিকারী ছিলেন বলে সাময়িক পত্রলব্ধ উপাদান দিয়ে সময় ও ব্যক্তির ইতিহাসসম্মত মূল্যায়নের কাজটিও তিনি দারুনভাবে করে গেছেন (দ্রঃ 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা' বা 'বিদ্রোহী ডিরোজিও' ইত্যাদি গ্রন্থ)। সত্তর দশকের পর সংবাদপত্র নির্ভর গবেষণার মান কিছুটা আলগা হয়ে গেছেই বলতে হবে। সব তথ্যকে সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা বা নিজের রুচিমাফিক তথ্যগুলিকে ক্লোজ-আপে দেখানো মূল্যায়নধর্মী গবেষণার কাজকে একান্তভাবে একপেশে করে দেয়। দ্বান্দ্বিক ইতিহাসবোধের প্রেক্ষিত না দিলে বিদ্যাসাগর হয়ে যান যে কোন মানুষ। সমকাল বিদ্যাসাগরকে কী চোখে দেখেছিল — গ্রন্থটি যদি সেই চিত্র তুলে ধরার কাজ করত বলার কিছু ছিল না। লেখক সমকালের নেতিবাদী মূল্যায়নগুলির সঙ্গে নিজের ডিবাঙ্কিংধর্মী মতামত ও মন্তব্য মিশিয়ে দিয়েছেন। ফলে এক হিসাবে এটি একালের বিচারগ্রন্থেও পরিণত হয়েছে। 'দয়া মায়া ভক্তি শ্রদ্ধার কুয়াশা'হীন নিরপেক্ষ বিদ্যাসাগর-গবেষণার সাজ পরিয়ে পাঠকের সভায় পাঠানো হয়েছে একে। এই ধরনের গ্রন্থ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ হয়ত কিছু বলতে পারতেন যেমন বলেছিলেন টলস্টয় সম্পর্কে লেখা একটি জীবনী গ্রন্থসম্পর্কে—

'ম্যাক্সিম গোর্কি টলস্টয়ের একটি জীবনচরিত লিখেছেন। বর্তমান কালের প্রখরবুদ্ধি পাঠকেরা বাহবা দিয়ে বলেছেন, এ লেখাটা আর্টিস্টের যোগ্য লেখা বটে। অর্থাৎ টলস্টয় দোষে গুণে ঠিক যেমনটি সেই ছবিতে তীক্ষ্ণ রেখায় তেমনটি আঁকা হয়েছে; এর মধ্যে দয়া মায়া ভক্তি শ্রদ্ধার কোন কুয়াশা নেই। পড়লে মনে হয় টলস্টয় যে সর্বসাধারণের চেয়ে বিশেষ কিছু বড় তা নয় এমনকি অনেক বিষয়ে হেয়।

'.....টলস্টয়ের কিছুই মন্দ ছিল না একথা বলাই চলে না; খুঁটিনাটি বিচার করলে তিনি অনেকবিষয়ে সাধারণ মানুষের মতোই এবং অনেক বিষয়ে তাদের চেয়েও দুর্বল, একথা স্বীকার করা যেতে পারে। কিন্তু যে সত্যের গুণে টলস্টয় বহু লোকের এবং বহু কালের, তাঁর ক্ষণিক মূর্তি যদি সেই সত্যকে আমাদের কাছ থেকে আচ্ছন্ন করে থাকে তাহলে এই আর্টিস্টের আশ্চর্য ছবি দিয়ে আমার লাভ হবে কী!'

সমকালে বিদ্যাসাগর—স্বপন বসু পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯/৬০ টাকা

পঞ্চান্ন জন লেখক-গবেষকের কলমে কলকাতা

সৌমিত্র লাহিড়ী

ছাত্রজীবনে একের মধ্যে দশ বা একের মধ্যে আট জাতীয় গ্রন্থগুলি যে আকৃতি ও বৈচিত্র্য নিয়ে উপস্থিত হত প্রাথমিক বিচারে, 'বিষয় কলকাতা' প্রবন্ধ সংকলনটি অনেকটা সে রকম অনুভূতিই এনে দিয়েছিল। কিন্তু সাত শতাধিক পৃষ্ঠার এই সুবৃহৎ প্রবন্ধ সংকলনটি একটু নিবিড় পাঠের সুযোগ করে নিলে যে কোন পাঠকই বিস্মিত হয়ে বলবেন 'বিষয় কলকাতা' আসলে কলকাতা সমগ্র। ইদানিং 'সমগ্র' গ্রন্থেও যে দুর্বলতা বা ঘাটতি লক্ষ করা যায়, আলোচ্য সংকলনেও তা অলক্ষণীয় নয়। সে প্রসঙ্গ পরে আলোচনা করা যাবে।

৫৫ জন লেখক-প্রাবন্ধিকের প্রবন্ধ-নিবন্ধ নিয়ে 'বিষয় কলকাতা' সংকলনটি প্রকাশ করেছে জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি। এই সমিতি ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্য কর্মতৎপরতার জন্য সারস্বত সমাজের স্বীকৃতি লাভ করেছে।

জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি রজতজয়ন্তী স্মরণিকা ছাড়াও জাতীয় গ্রন্থাগার প্লাটিনাম জুবিলি স্মরণিকা, Role of National Library of India, মে দিবস শতবর্ষ পূর্তি স্মরণিকা, Select bibliography on May Day, প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থগুলি প্রকাশ করেছে। এই তালিকা থেকেই কর্মী সমিতির যাত্রার উদ্দেশ্য ও দায়িত্বশীলতার প্রতিচ্ছবি স্পষ্ট হয়ে যায়। 'বিষয় কলকাতা' সংকলনের জন্মকাহিনী বিবৃতি করতে গিয়ে সমিতির সাধারণ সম্পাদক আশিস নিয়োগী বলেছেন, 'এ শহরের জনসংখ্যা; পথঘাট, যানবাহন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বেকারী ইত্যাদি নানা সমস্যা, দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত প্রতিদিনের দিনযাপনের গ্লানি সত্ত্বেও প্রতিটি মানুষের কলকাতা সম্পর্কে একটি যন্ত্রণাবোধ আছে। এ যন্ত্রণা ভালবাসার। যন্ত্রণা — ভালবাসার এই শহরের জন্য। কোন ভালবাসাই তো যন্ত্রণাহীন নয়। সেই ভালবাসার যন্ত্রণার তাগিদে 'বিষয় কলকাতা' প্রকাশের এই প্রয়াস।'

'বিষয় কলকাতা' গ্রন্থটি কলকাতার তিনশো বছর উপলক্ষে তিনশো তিন বছরের মাথায় প্রকাশিত হলেও, বিষয় বৈচিত্র্য ও লেখক সম্ভারে অনন্য। পঞ্চান্ন জনের রচনা সংকলিত করতে গেলে সম্পাদনার কাজে যুক্ত ব্যক্তিদের বিভ্রান্ত বোধ করা স্বাভাবিক। এক্ষেত্রেও তার কিছু রেখাপাত ঘটেছে। কিছু কিছু বিষয় সংকলনে বড় জায়গা জুড়ে থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল, কিন্তু তেমন গুরুত্ব পায়নি। আবার কিছু কিছু লেখায় গভীরতার পরিবর্তে সাদামাটা রূপটাই প্রকট হয়ে উঠেছে।

প্রবীণা লেখিকা ও এ শহরের অন্যতমা প্রবীণা কলকাতাবাসী শ্রীমতী লীলা মজুমদার অতি সংক্ষিপ্ত স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে লিখছেন '৬০ বছর আগে আমাদের বাগানওয়ালা ৫ ঘরের ফ্ল্যাটের ভাড়া ছিল ১৩০ টাকা মাসে। কয়লাওয়ালা $১\frac{১}{২}$ টাকায় মাসভর কয়লা যোগাত; গয়লা টাকায় $৪\frac{১}{২}$ সের দুধ সামনে দুয়ে দিত; তাঁতিনী বাকিতে ৩/৪ টাকায় একেকখানা ফরাসডাঙ্গার বাহারে ১১ হাত শাড়ি গছিয়ে দিয়ে যেত। পেট্রল ছিল একটাকা চার আনা গ্যালন অর্থাৎ ৫ লিটারের ওপর। ২,৫০০ টাকায় ছোট মরিস গাড়ি পাওয়া যেত। মাসে ৮০ টাকায় বিশ্বভারতীর কলেজে ইংরাজি পড়াতাম আমি। আর সোনা ছিল ৩২ টাকা, রুপো আট আনা ভরি। সে এক আলাদা কলকাতা।

'জগুবাবুর বাজার থেকে নিজে গিয়ে ছয় আনা দিয়ে একসেরি তাজা ইলিশ, বারো আনা দিয়ে একসের তাজা কাটা পাকা রুই, দেড় টাকা দিয়ে বড় বড় বাগদা চিংড়ি, চার টাকা শ' ল্যাংড়া আমও কিনেছি। আর বেশি বলব না, তাহলে তোমরা ভাববে আমি আরেকটা গল্প ফেঁদেছি।'

প্রবীণা লেখিকার স্মৃতি থেকে উঠে আসা 'আলাদা কলকাতা'র এ কাহিনী আজকের দিনে সত্যিই রূপকথা বলে মনে হয়। অথচ ষাট বছর আগের কাহিনী। তখন ইংরেজ শাসন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতিকাল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী ৫০ বছরে অন্যান্য শহরের মতো কলকাতার রূপও বদলে গেছে অতি দ্রুত। সামাজিক অবক্ষয়, রাজনৈতিক পটপরিবর্তন, উদ্বাস্তু সমস্যা, দাঙ্গা, অর্থনৈতিক সংকট এবং বিপুল জনসংখ্যার চাপে বিপর্যস্ত কলকাতার জীবন পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার কাহিনী অনেকের প্রবন্ধেই। মণি সান্যাল, বাসর সরকার, হীরেন দাশগুপ্ত, রবীন্দ্র গুপ্ত, বিজিত কুমার দত্ত, কানন কুমার মজুমদার, লাডলী মোহন রায়চৌধুরী, মালিনী ভট্টাচার্য, চিত্রা দেব, আবদুর রউফ, রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ তাঁদের প্রবন্ধে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কলকাতার মানসলোক স্পর্শ করার চেষ্টা করেছেন। কলকাতার সংস্কৃতি চর্চার প্রসঙ্গে প্রচলিত ধারণাগুলি বিশ্লেষণ করে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনে ব্রতী হয়েছেন বিশিষ্ট গবেষক-প্রাবন্ধিক রবীন্দ্র গুপ্ত। অধ্যাপক বিজিত কুমার দত্ত রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছে কলকাতার মধ্যবিত্ত জীবনের যে ছবি আমরা পাই তা সংক্ষিপ্ত পরিসরে বিধৃত করেছেন। মুসলমান সমাজ ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে বিশ্লেষণী দৃষ্টিকোণ থেকে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক আবদুর রউফ 'কলকাতার মুসলিম সম্প্রদায়' প্রবন্ধে। তিনি দেখিয়েছেন কলকাতা শহর হয়ে ওঠার আগে থেকেই মুসলমানরা কলকাতায় বসবাস করতেন; তালতলা, পার্ক সার্কাস অঞ্চলে এঁদের খোঁজ পাওয়া যায়। এঁদের কেউ কেউ বস্তীবাসী হলেও

অনেকেই ব্যবসা বাণিজ্য করে সচ্ছল জীবন যাপন করতেন। রউফ সাহেব কলকাতার বিভিন্ন ধরনের মুসলমানদের অবস্থান, তাঁদের আগমন ও জীবন যাপনের ইতিহাস, সংস্কৃতি চর্চা, ভাষা ব্যবহার, পেশা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ বছরের পর বছর পাশাপাশি বসবাস করেও আমরা অনেকেই তার কোন হদিশ রাখি না। বস্তুত দুই সম্প্রদায়ের মানসিক ব্যবধান এতো দুর্লঙ্ঘনীয় হয়ে উঠল কেন তা গভীরভাবে অনুসন্ধান করা হয় না বলেই পারস্পরিক বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব, সংঘাত প্রায়শই দাঙ্গায় রূপান্তরিত হয়। আর দাঙ্গা লাগানোর জন্য স্বার্থান্বেষী মহল সব সময়ই যে তৎপর এবং এই মানসিক বিচ্ছেদেকেই যে তারা হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে তাও আমরা অনেক সময় ভুলে যাই। রউফ সাহেবের এই প্রবন্ধ গভীর মনোযোগ দাবি করে এই কারণেই।

একই কারণে আরও কয়েকটি প্রবন্ধের উল্লেখ করতে হয়। কলকাতা সারা ভারতের এক ক্ষুদ্র ও সংহত রূপ বলে দীর্ঘকাল সম্মানের উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত। এখানে জাতি-ধর্ম-ভাষা-সম্প্রদায় নির্বিশেষে মানুষ এসেছেন এবং পারস্পরিক চেনা-অচেনার সূক্ষ্ম ব্যবধান নিয়েও পাশাপাশি বসবাস করেছেন। সমস্ত সম্প্রদায় ও ভাষাভাষী মানুষই কলকাতাকে তাঁদের নিজের শহর বলে মনে করেন। কলকাতার অবাঙালি সম্প্রদায়-এর মধ্যে গুজরাতি, পাঞ্জাবী, দক্ষিণ ভারতীয়, চীনা, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান, মারাঠি ও হিন্দুস্থানি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের অসংখ্য মানুষ দেখা যায়। শ্রমজীবী মানুষের এক বড় অংশই অবাঙালি ; আবার ব্যবসাদারদেরও বেশির ভাগই অবাঙালি। এঁরা ভিন্ প্রদেশের মানুষ, কেউ এসেছেন দুশো বছর আগে, কেউবা আরও আগে। বংশ পরম্পরায় কয়েকটি নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাস করছেন। কলকাতা তথা পশ্চিম বাংলার সামাজিক - অর্থনৈতিক- সাংস্কৃতিক বিকাশে এঁদেরও বিরাট অবদান আছে। অথচ এঁদের গোষ্ঠী জীবন আমাদের অনেকের কাছেই এখনও খুব স্পষ্ট নয়। বাংলা সাহিত্যে এই সব সম্প্রদায়ের মানুষের চরিত্র কটা খুঁজে পাওয়া যায়। প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক কোন লেখকই এঁদের জীবনকে সাহিত্যে তেমনভাবে স্থান দেননি। বাংলা সাহিত্যের এ এক বড় দুর্বলতা। এঁদের জীবন নিয়ে লিখেছেন পি. টি. নায়ার (কলকাতার দক্ষিণ ভারতীয় সম্প্রদায়), অলোক রায় (কলকাতায় বিদেশি বসতি), জন পরমানন্দ মিশ্র (কলকাতার খ্রীষ্টীয় সমাজ), মঞ্জুলা দত্ত পারেখ (কলকাতায় গুজরাতি সম্প্রদায়), দেবজ্যোতি গঙ্গোপাধ্যায় (কলকাতার চীনারা), জি. এ. উইলসন ডি'রোজ (অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সমাজের রাজনৈতিক উৎপত্তি)। বিস্ময়কর ব্যাপার হল, কলকাতার পাঞ্জাবী ও হিন্দুস্থানি সমাজ নিয়ে কোন প্রবন্ধ এই সংকলনে নেই। কিন্তু অন্য যাঁদের কথা বলা হয়েছে তাও কম প্রাপ্তি নয়। সকলের লেখাই যে সমান মানের তাও নয়, তবে মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায়। যাঁরা আগ্রহী হবেন তাঁরা প্রাসঙ্গিক অন্যান্য গ্রন্থপাঠেও উৎসাহ বোধ করতে পারেন। পি. টি. নায়ার কলকাতার সুপরিচিত গবেষক। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি গবেষণাধর্মী, স্বভাবতই কলকাতার দক্ষিণ ভারতীয় মানুষের জীবনযাপনের বিস্তৃত ছবি পাওয়া যায় তাঁর প্রবন্ধে। মঞ্জুলা দত্ত পারেখ গুজরাতি সম্প্রদায়ের মানুষের জীবন বিন্যাস বিবৃত করতে গিয়ে কিছুটা সংকুচিত পরিসরে পদচারণা করেছেন, ফলে অপ্রাপ্তির পরিমাণ বেড়েছে। তাছাড়া পশ্চিম বাংলার শিল্প-পরিবেশ প্রসঙ্গে কিছু আলগা মন্তব্য বিতর্ক সৃষ্টি করতে পারে। কলকাতার চীনাদের জীবন নিয়ে দেবজ্যোতি গঙ্গোপাধ্যায় যে আলোচনা করেছেন তা কৌতূহলোদ্দীপক কিন্তু বিশ্লেষণধর্মী নয়। সংস্কার-কুসংস্কারগুলিকে বিবৃতির ঢঙে তুলে এনেছেন, তেমন বিচার-বিবেচনা করেননি।

বিষয় কলকাতা সংকলনে কলকাতার সংগ্রাম ও অতীত ইতিহাস নিয়েও বেশ কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। প্রবীণ ইতিহাসবিদ অধ্যাপক নিশীথরঞ্জন রায় প্রাক্-স্বাধীনতাযুগের এক উত্তাল সময় (১৯৪৫-৪৬) বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর সংক্ষিপ্ত অথচ মূল্যবান প্রবন্ধে। কলকাতা প্রসঙ্গে অজস্র মূল্যবান তথ্যসম্বলিত গবেষণাধর্মী প্রবন্ধের লেখক রাধাপ্রসাদ গুপ্ত শুনিয়েছেন 'বাবু বৃত্তান্ত'। বাবু শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দিয়ে শুরু করে লেখক গভীর ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন 'পরোক্ষভাবে সাহিত্য ও শিল্প আর প্রত্যক্ষভাবে স্থাপত্যের কীর্তির কথা আমরা বাবুদের কেচ্ছা লেখার সময় অনেক সময়ই ভুলে যাই।' এ ছাড়াও বাঙালিদের পোষাক-আশাক, কেতা-কায়দা, বনেদি ভদ্রতা, বাংলা খাবারের অপূর্ব বৈচিত্র্য আর সূক্ষ্মতার প্রশ্নে 'বাবু সম্প্রদায়ের' অবদানও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা উচিত বলে তিনি যথার্থ মন্তব্য করেছেন। বাবু বৃত্তান্ত বলতেই মদ, মহিলা আর পায়রা ওড়ানোর কথা চলে আসে, কিন্তু তাঁদের অন্য কীর্তিগুলি আড়ালে চলে যায়। সেই কীর্তির প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছেন কলকাতা বিশেষজ্ঞ প্রবীণ রাধাপ্রসাদ গুপ্ত।

কলকাতার শিক্ষা ও শিক্ষক প্রসঙ্গে তিনশো বছরের ইতিহাস জরিপ করে এক মূল্যবান প্রবন্ধ উপহার দিয়েছেন অধ্যাপক জ্যোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। একই মর্যাদা দাবি করে তারকমোহন দাস রচিত কলকাতার বিজ্ঞান শিক্ষা ও চর্চা প্রবন্ধটি। 'বিষয় কলকাতা' অজস্র বিষয়ে ঠাসা বলেই সংক্ষিপ্ত পরিসরের আলোচনায় সমস্ত প্রবন্ধ উল্লেখ পর্যন্ত করা সম্ভব নয়। কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করলেই বিষয় বৈচিত্র্যের রূপটি স্পষ্ট হবে আরও। এই সংকলনে কলকাতার দাঙ্গা, ডক, শ্মশান ও কবরস্থান, পাখি, শ্রমিক, ফুটবল, শহীদ, গান, মঞ্চ, থিয়েটার, শিল্প আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন, শিল্প বাণিজ্য, মুদ্রণ ও মুদ্রণ শিল্প,

সংবাদ ও সাময়িক পত্র, পুলিশের সেকাল-একাল, বাজার, পুরোনো বাঙালি ডাক্তার, ডাকাতি ইত্যাদি নানা বিষয়ের পাশাপাশি বর্ণবৈষম্য বিরোধী আন্দোলন, ঔপনিবেশিক শহর কলকাতার উনিশ শতকের ধর্মভিত্তি ও আন্দোলন, কলকাতার মন-মেজাজ মজলিস, কলকাতার খালপথ — উনিশ শতকের ইতিহাস, বিতর্কের কেন্দ্রভূমি — উনিশ শতকের কলকাতার মতো ইতিহাসনির্ভর প্রবন্ধও আছে। বিষয়গুলি যাঁরা লিখেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে সুপরিচিত এবং যোগ্য বলে চিহ্নিত। কোন একটি সংকলনে এত ব্যাপক পরিসর ও বিস্তৃতি এবং বৈচিত্র্য সহজলভ্য নয়। তবুও বলা প্রয়োজন জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি এ রকম বৃহৎ পরিকল্পনায় নেমে আরও দু একটি বিষয়ে একটু বেশি নজর দিলে সংকলন পূর্ণাঙ্গ রূপ পেত। যেমন পাঞ্জাবী ও হিন্দিভাষাভাষী মানুষের জীবন বিশেষভাবে তুলে ধরা প্রয়োজন ছিল কলকাতার কবি-সাহিত্যিক, লিটল ম্যাগাজিন, কফি হাউস, মনীষীদের স্ট্যাচু, মেসজীবন, যানবাহন, বই মেলা, রাস্তার নামের বৈচিত্র্য চলচ্চিত্র চর্চা ও ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন, মিষ্টি ও অন্যান্য খাবার, বিভিন্ন প্রদেশের খাবার ইত্যাদি প্রসঙ্গগুলির অন্তর্ভুক্তি। কলকাতা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে কলকাতার এই বিশেষ অলংকারগুলি যোগ্য মর্যাদায় স্বীকৃতি আদায় করতে না পারলে খারাপ লাগে।

'বিষয় কলকাতা'র আলোচনা শেষ করব এই সংকলনের একটি লঘু রচনার শেষাংশ উদ্ধৃত করে। কলকাতার পানশালা প্রসঙ্গে লিখেছেন সদ্য প্রয়াত সাংবাদিক বুদ্ধিজীবী হামদি বে। তিনি লিখছেন "আমি যখন ম্যাক্সিমস-এ যাতায়াত শুরু করি তখন না বিদ্রেহী কবি (মাইকেল মধুসূদন দত্ত), না মাথা মোটা রাজপুত্তুর সেখানে আসেন। কিন্তু বার-এর কর্মীরা রয়ে গেছে পুরোনো কেতাদুরস্ত, পানীয় ও খাদ্য বাছার কাজে সহায়ক ও পিতৃতুল্য স্নেহপরায়ণ। এখন বহুদিন ম্যাক্সিমস-এ যাইনি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল অধিগ্রহণ করেছেন। লন্ডনের ফ্লীট স্ট্রীটে চার্লস ডিকেন্স যে বার-এ যেতেন সেখানে তাঁর দেয়া চেক বাঁধিয়ে রাখা আছে — বহুদিনের জমা ধার এক সঙ্গে শোধ করেছিলেন তিনি। ম্যাক্সিমস-এ মধুসূদনের একটা ছবি টাঙালে কেমন হয় ?"

মধুসূদনের ছবি টাঙানোর প্রস্তাবে যে ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর ইঙ্গিত আছে, সে সম্পর্কে সচেতন হওয়ার এক বিশেষ উপলক্ষ্য ছিল কলকাতার তিনশো বছর পূর্তি উৎসব। প্রকাশনা জগৎ তার অনেকটাই সদ্ব্যবহার করতে পেরেছে বলে মনে হয়।

বিষয় কলকাতা (কলকাতা বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন)/জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, বেলভেডিয়ার, কলকাতা-২৭/৯০ টাকা

যাঁরা তাঁর শান্তরসাম্পদ জীবনযাপনের দিশারী

সুধীর চক্রবর্তী

সব বই লেখার উদ্দেশ্য যে কেবল পাঠকতোষণ বা প্রকাশকমুখী এমন কোন কথা নেই। সবাই যে আবার লেখক হয়ে উঠে অর্থাৎ বহুদিনের চর্যার পর কলম ধরবেন একথানা ভাল বই লিখতে এমনও নয়। লেখার জগতে বরাবর ভারি দুটো বিপরীত জিনিস দেখি। অনেকে কম বয়স থেকে লিখে, অনেক বই প্রকাশ করে, তবু হয়ত প্রকৃত পক্ষে তেমন কিছু বলে উঠতে পারেন না যা বঁকে থাকবে। অথচ কখনও না লিখে, সম্পূর্ণ ভিন্ন ভূমিকায় জীবন কাটিয়ে, একথানা এমন বই লিখে গেলেন, যা অবিস্মরণীয়। এর থেকে মনে হয়, লেখার বিষয়বস্তু সম্পর্কে সঠিক ও গভীর অধিকার, স্বচ্ছন্দ প্রকাশক্ষমতা এবং অভিজ্ঞতাময় স্বচ্ছ জীবনদৃষ্টি যাঁর অর্জিত, তাঁর লেখা একটা উচ্চ মানে ও জীবনসত্যে পৌঁছতে পারে। সিতাংশু কুমার দাশগুপ্ত-র লেখা 'স্মরণীয় বরণীয় যাঁরা' বইটি পড়তে গিয়ে ওপরের কথাগুলি মনে হল। আমরা কোনদিন তাঁর লেখা পড়িনি, কারণ তিনি লেখেননি। কিন্তু সরকারি উচ্চ পদে (অর্থদপ্তরে ডেপুটি সেক্রেটারি এবং মণিপুরের প্রথম পে-কমিশনের মেম্বার-সেক্রেটারি) দীর্ঘদিন কাজ করে, বলতে অবসর জীবনের প্রান্তিক পর্যায়ে 'স্মরণীয় বরণীয় যাঁরা' বইটির অন্তর্গত লেখাগুলি লেখেন। বইটি কোন প্রকাশকের সাহায্যে তিনি ছাপেননি, নিজেই ছেপেছেন। যার ফলে বইখানি হাতে নিয়েই মন খুশি হয়। পড়তে পড়তে (সেটাও বেশ সহজে ঘটে, কারণ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ ভাষারীতি, উজ্জ্বল পাইকা টাইপ ও নির্ভুল মুদ্রণ) লেখকের আধুনিক সর্বগ্রহিষ্ণু মন, উন্নত জ্ঞানবুদ্ধির সমন্বয় এবং সাবলীল রচনাভঙ্গি খুব আনন্দ দেয়। মনেই হয় না যে মেধাবী ও বর্ষীয়ান লেখক মানুষটি জীবিকার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন মার্গের ছিলেন, যেন বহুদিন বাংলা গদ্য লিখছেন। অথচ বইয়ের ভূমিকা অংশ পড়ে জানা গেল লেখকের জীবনে শোকজর্জরতা এসেছে, শারীরিক অসুস্থতা ও নানা উত্থানপতন গেছে, জীবন সঙ্গিনীর সুদীর্ঘ ব্যাধিগ্রস্ততা তাঁকে বিহ্বল করেছে, কিন্তু লেখায় তার কোন ছাপ পড়েনি। যেন এক আনন্দময় পুরুষের মতো জ্ঞান ও কর্মের পথিক মানুষটি চমৎকার স্বাদু বইটি লিখেছেন।

'স্মরণীয় বরণীয় যাঁরা', সিতাংশু কুমার দাশগুপ্তের বইটি তাঁর স্মৃতিকথা নয়, তাঁর ধার্মিক ও শান্তরসাম্পদ জীবনযাপনের নির্ভুল দিশারী যে কটি চরিত্র তাঁকে প্রেরিত করেছে তিনি লিখেছেন তাঁদেরই কথা। বইয়ের আদিতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তে সাবিত্রী

দুটি পৌরাণিক কাহিনী, মাঝখানে ছয়জন ঐতিহাসিক পুরুষ বা মহাপুরুষের জীবনী (বুদ্ধদেব, শংকরাচার্য, শংকরদেব, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদাদেবী) সুন্দর বিন্যাসে সমুজ্জ্বল।

এতক্ষণ হয়ত পাঠকরা ভাবছেন, ভক্তিপথের একটি সন্দর্ভ সম্পর্কে এত কথা আমি সাজাচ্ছি। বইটি নিছক তা নয় বলেই বরং এতবড় পূর্বালাপ। সিতাংশুবাবুর পরিণত মনের অন্তর্দৃষ্টি ও প্রজ্ঞা আমাকে খুব আকৃষ্ট করেছে। বইয়ের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের তিনটি উদ্ধৃতি চয়ন থেকে লেখকের দৃষ্টিকোণ বোঝা যায়। 'তারা সত্যের পথিক জ্যোতির সাধক', 'এখানে আমার রক্তে বেঁচে আছে পূর্বপুরুষেরা', 'শিকড়ে আমার তাই অরণ্যের বিশাল চেতনা' এসব উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় লেখক পূর্বানুসারিতার গৌরবে অহংকৃত। যাঁরা স্মরণীয় ও বরণীয়, তাঁরা লেখকের জীবনে কাঙ্ক্ষণীয় কেবল সত্য বা ধর্মদৃষ্টির কারণে নয়, জীবনপ্রত্যয় ও যাপনের অস্মিতায়। এই দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে তিনি যেমন ভক্তপুরুষদের সান্নিধ্য মেনেছেন, ভ্রামণিক হয়েছেন বরণীয়দের সিদ্ধপীঠে, তেমনই পড়েছেন আবু সয়ীদ আইয়ুব ও শঙ্খ ঘোষের রচনা, মহেশ্বর নেওগ ও জগদীশচন্দ্র বসুর বিশ্লেষণ। স্থানীয় মন্দিরে শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যানও তাঁকে আলোকিত করেছে। এত সব পর্যায় পেরিয়ে অবশেষে তিনি লেখায় হাত দিয়েছেন। এখনকার দিনে বিস্ময় লাগে এটাতেও যে ২১২ পৃষ্ঠার বইটির কোথাও কোন ইংরেজি ভাষার উদ্ধৃতি নেই, অথচ অসমিয়া পণ্ডিতদের বাক্য-উদ্ধৃতি আছে। কাজেই কোনভাবে 'স্মরণীয় বরণীয় যাঁরা' গড়পড়তা হ্যাজিওলজির বই নয়।

এই দেশে জন্মেছেন যেসব মহামানব, তাঁদের বুঝতে চেয়েছেন সিতাংশুবাবু তাঁর মতো করে, হতে চেয়েছেন তাঁদের পুণ্যভাগী। এর জন্য ধর্মীয়তার কোন আবশ্যিক দায় নেই। মানুষ তার সমগ্রতার অভিমুখী হতে চায়, খুঁজতে চায় তার আত্মশক্তির উৎস। লেখক এমন একটা দৃষ্টিকোণ থেকে চালিত হয়েছেন। বাংলা-অসম-মণিপুরের বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের মধ্যে তিনি এক অন্তঃস্রোত লক্ষ করতে বারেবারে গেছেন অসম ও মণিপুরে, অবশ্য চাকরিসূত্র এক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে তাঁর অন্বেষণে। সিতাংশুবাবু খুব স্পষ্ট প্রত্যয়ে লিখেছেন:

> নারায়ণ চৌধুরীর কাছে আধুনিককালের ধর্মহীনতার মূলে সমস্যা ছিল গভীরতা না থাকায় ভাসা ভাসা ব্যাপ্তির। শঙ্খ ঘোষের কাছে সমস্যা হল ধ্যান ও ধ্যানহীনতার। উভয়ক্ষেত্রে বিষয়টি হলো আমি-স্বরূপের কেন্দ্র, আত্মশক্তিকে জানার। না জানলে সর্বত্র সংকট, যথার্থ আনন্দ উপলব্ধির বাধা।
>
> বুদ্ধদেব ও আচার্য শংকরের এটিই ছিল মূলকথা। আর, প্রতিটি মানুষের অন্তর সত্তায় এই যে আমি-তুমির টান, নিজের পূর্ণতার জন্য এই যে সর্বত্র আমি-তুমির মিলন-আকাঙ্ক্ষা, আর তার অনিবার্য অনুভব — এই হলো বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শনেরও মূলতত্ত্ব। এই আমি-তুমিই ভক্ত ও ভগবান।
>
> এটি যে শক্তিকে, যে তেজে ঘটে তাই হলো আত্মশক্তি বা সাবিত্রীশক্তি।

সিতাংশুবাবু এসব কথা তাঁর বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন। তার থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি এটা বোঝাতে যে সাধারণভাবে মহাপুরুষদের জীবনী লেখা তাঁর লক্ষ্য নয়। তিনি বরণীয় মানুষগুলির জীবনী অনুধাবনের মধ্য দিয়ে আসলে আত্মপ্রশ্নের সমাধান খুঁজেছেন, সেইজন্য আলৌকিকতার দিকে ঝোঁক বা ভক্তিমার্গ বিষয়ে বেহিসেবি উদ্বেলতা তাঁর চেতনায় নেই। তিনি যথার্থই বুঝেছেন:

> প্রতিটি মানুষের দেহ-প্রাণ-মন-বুদ্ধিতে আইয়ুব-কথিত প্রেমের বেদনা ও প্রকৃতির টান অবশ্যই আছে। তখন অনুভব করি ব্যক্তিগত আবেগ, সুখদুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা ও প্রাণচাঞ্চল্য। তাতে সবাই মুগ্ধ হই। চেতনশীল মানুষকে এই অভিজ্ঞতাও অর্জন করতে হয়। তারপরে জীবনপথে চলতে চলতে কখন যে আত্মপ্রজ্ঞার আলো এসে প্রাণচেতনাকে আরও ব্যাপ্ত ও গভীর করে, দেহের সীমানা ছাড়িয়ে ভালবাসাকে ক্রমশ বিশ্বের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়, সকলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে সকলের ভাবনা ভাবে, সবসময় তা টের না পেলেও অচিরেই আমরা তার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠি। তখন বুঝি এই আত্মপ্রজ্ঞাই সাবিত্রীশক্তি। .....এই সাবিত্রীশক্তি বা আত্মপ্রজ্ঞার আলো উচ্ছ্বসিত ও বিকীর্ণ হয় মহামানবদের জীবন ও বাণীতে। এক-একটি যুগসন্ধিক্ষণেই এটি বিশেষরূপে সক্রিয় হয়। এই যুগসন্ধিক্ষণের ইতিহাসকেও আমি বুঝতে চেষ্টা করেছি ও যথাসাধ্য তুলে ধরতে চেয়েছি — প্রত্যেকের জীবনীতে এবং প্রাক্ কথনে।

নির্দ্বিধায় বলব, লেখকের প্রয়াস আন্তরিক ও যথাযথ। যাঁরা এতসব দৃষ্টিভঙ্গিগত অনন্যতা বাদ দিয়ে মহাপুরুষদের জীবনী জানবার জন্যেই শুধু এ বইটি পড়বেন তাঁরাও কিছু পাবেন। লেখকের সুন্দর রচনাশৈলী, শাস্ত্রজ্ঞানের গভীরতা এবং ব্যক্তিগত অনুভব রচনাগুলিতে নিবেশিত হয়ে আছে। আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে শংকরাচার্য এবং শংকরদেব অধ্যায় দুটি। বিশেষত শংকরদেব সম্পর্কে কোন বাঙালি লেখকের এত বিস্তারিতভাবে লেখা আগে পড়িনি। 'স্মরণীয় বরণীয় যাঁরা' বইখানি গ্রন্থপ্রেমী বাঙালি পাঠকদের পক্ষে বরণীয় হবে কামনা করি।

স্মরণীয় বরণীয় যাঁরা — সিতাংশু কুমার দাশগুপ্ত/কাত্যায়নী প্রকাশনা/৪৫ টাকা

বিয়াল্লিশের আন্দোলনের খতিয়ান

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

"মূলতঃ ইতিহাসে দুধরনের ঐতিহাসিক কলম ধরেন। পুরাণের ভাষায় একদল বিশ্বামিত্রের মত শাপ দেন, আরেক দল শ্রীরামচন্দ্রের অহল্যাউদ্ধার করেন। আমি ঐতিহাসিক নই তাই সেধরনের কোন অভিপ্রায়ও নেই। ঘটনার পর্যবেক্ষণ এবং পর্যালোচনার মধ্যেই আমার লেখাকে সীমাবদ্ধ রেখেছি। চেষ্টা করেছি বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে সত্য-অসত্যের ধুলোয় চাপাপড়া তত্ত্ব ও ঘটনাকে ধুলো ঝেড়ে সামনে তুলে ধরার।" ১৯৪২ খ্রি আগস্ট আন্দোলনের পঞ্চাশবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে সঙ্গত কারণেই সে সম্বন্ধে যেসব আলোচনা হচ্ছে তার এক গ্রন্থের ভূমিকায় লেখকের পূর্বোক্ত বিনম্র উক্তি পড়ে সম্পূর্ণ রচনাটি পাঠ করার আগ্রহ জেগেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পাঠশেষে হতাশ হতে হল।

তবে এই পরিণতিতে উপনীত হবার কারণ ব্যাখ্যা করার পূর্বে কিঞ্চিৎ উপক্রমণিকা প্রয়োজন। ইতিহাস-পাঠক জানেন কংগ্রেসের 'আগস্ট' বা 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব নামে যা খ্যাত তা ঐ প্রতিষ্ঠানের ব্রিটিশবিরোধী মুক্তি সংগ্রামেরই একটি ধাপ। তবে ১৯৪২ খ্রি ৮ই আগস্ট রাতে কংগ্রেস কর্তৃক ঐ প্রস্তাব গৃহীত হবার পরই ভোরের মধ্যে প্রস্তাবিত আন্দোলনের নেতা গান্ধীজি সহ কংগ্রেসের সমস্ত প্রথম সারির নেতৃবর্গকে কারারুদ্ধ করা হয় এবং সাম্রাজ্যবাদী সরকার কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকেও বেআইনি ঘোষণা করে তার স্বাভাবিক কাজকর্ম বন্ধ করে দেয়। সুতরাং তার পর দেশবাসী যে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভে ফেটে পড়ে, তাতে কোথাও কোথাও আত্মগোপনকারী কংগ্রেস নেতাদের প্রেরণা ও নেতৃত্ব থাকলেও সামগ্রিক ভাবে তা কংগ্রেসের ৮ই আগস্টের প্রস্তাব অনুসারী আন্দোলন নয়। সঙ্গতভাবেই তাই পঞ্চাশ বছর পর ঐ প্রস্তাব বা তার পরবর্তী আন্দোলনের পুনর্মূল্যায়ন হতে পারে। প্রত্যুতঃ মূল প্রস্তাবের বিরোধী সেকালের কমিউনিস্টরা সহ মানবেন্দ্রনাথ রায় ও তাঁর অনুগামীরাও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মিত্রশক্তির ঐ জীবন-মরণ যুদ্ধের সময়ে ইংরেজ শক্তিকে ভারত ছাড়তে বলার রাজনৈতিক যৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলেন। আর সাম্রাজ্যবাদী সরকারও তখনকার ঐ আন্দোলনের বিরূপ সমালোচনা করেন। এসম্বন্ধে বহু তথ্য সহজলভ্য এবং বর্তমান লেখক তার অনেকগুলি ব্যবহারও করেছেন।

কিন্তু কেবল সেইগুলি উদ্ধৃত করার জন্যই কি নতুন একটি গ্রন্থরচনার আবশ্যকতা আছে? বিশেষ করে ভূমিকাতে "বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে সত্য-অসত্যের ধুলোয় চাপা পড়া তত্ত্ব ও ঘটনাকে ধুলো ঝেড়ে সামনে তুলে ধরার" প্রতিশ্রুতি দেবার পর? কারণ শেষ অবধি লেখক তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসের — যা আগস্ট প্রস্তাব ও তার পরবর্তী জনআন্দোলনের বিরোধী তদানীন্তন কমিউনিস্ট পার্টির লাইন — উর্ধ্বে উঠতে পারেননি। "জন্মসূত্রে মেদিনীপুরবাসী হওয়ায় ছোটবেলা থেকে" তাঁর ভিতর "অজয় মুখার্জী" ও "বিশ্বনাথ মুখার্জী" প্রমুখদের যে টানা-পোড়েন, তাতে বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ই জয়ী হয়েছেন। নচেৎ বর্তমানে যখন জ্যোতি বসু সহ একাধিক কমিউনিস্ট নেতা অন্তত প্রকাশ্যে কমিউনিস্ট পার্টির তখনকার ভূমিকার আর তেমন অন্ধ সমর্থক নন, তখন লেখক সেই "জনযুদ্ধের" থিসিসের গুণগান করতে পারতেন না। আর আগস্ট প্রস্তাবের পিছনে গান্ধীজির "নিজের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করা'-র অভিসন্ধি (পৃ. ৬৭ ও অন্যত্র) আবিষ্কার করতে পারতেন না। গান্ধী-অনুপ্রাণিত এবং আগস্ট আন্দোলনের এক দিক্‌চিহ্ন তমলুকের জাতীয় সরকারের প্রথম সারির নেতা লেখকের শ্রদ্ধাভাজন অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রতি অন্যদের সঙ্গে "এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের মাধ্যমে....সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ" করার তাঁর বাসনা যে কতটা পূর্ণ হয়েছে, তা তিনি শান্ত মস্তিষ্কে বিবেচনা করে দেখবেন।

কিঞ্চিদধিক একশত পৃষ্ঠার বইটিতে লেখকের বহুল অধ্যয়নের নিদর্শন আছে উদ্ধৃতিগুলির মাধ্যমে। কিন্তু মারাত্মক ভ্রান্তিও আছে অনেক, যার কয়েকটির উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তাঁর সব চেয়ে বড় ভ্রান্তি হল (যা কেতাবি মার্কসবাদীরা তাঁদের কিতাব-সর্বস্বতার জন্য প্রায়ই করেন) ১৯৪২ খ্রি গান্ধীজিকে দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়র যুদ্ধ বা প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে তাঁর ভূমিকার কাঠামোর মধ্যে বিচার করতে যাওয়া। গান্ধীজি বার বার বলেছেন যে তিনি বিবর্তনশীল ব্যক্তি, নিত্য নব অভিজ্ঞতার আলোকে সুদূরের নয়, কেবল পরবর্তী পদক্ষেপ স্থির করেন। তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অভিমতের মধ্যে বিরোধাভাস দেখলে পূর্ববর্তীটিকে বাতিল করে সাম্প্রতিকটিকে গ্রহণ করা উচিত। জওহরলালকে একাধিক স্থলে (পৃ. ২২ ও অন্যত্র) গান্ধীর "অনুগত শিষ্য" আখ্যা দেওয়াও এমনই একটি ভ্রান্তি। গান্ধী ও জওহরলাল উভয়েই জানতেন এবং একাধিক বার প্রকাশ্যে স্বীকারও করেছিলেন (সর্বশেষ উদাহরণ ১৯৪৪ খ্রি শেষ বার কারামুক্ত হবার পর ভারতের ভবিষ্যৎ পুনর্গঠনের রূপরেখা সম্বন্ধে উভয়ের মৌলিক মতভেদ ব্যক্তকারী তাঁদের তিনটি চিঠি) যে তাঁদের মত ও পথ ভিন্ন। তাঁর উদ্ধৃত (পৃ. ৩০) কমরেড সরোজ মুখোপাধ্যায়ের আত্মগরিমাসূচক উক্তির "বাংলা প্রদেশে কংগ্রেসের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টিই ছিল সব চেয়ে বড় দল" ভিত্তি কি? ৩৫ পৃষ্ঠায় লেখক বলছেন ১৯৩৯ খ্রি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বল্লভভাই "হুমকি দিয়েছিলেন পদত্যাগের।" কিন্তু বল্লভভাই তো সেসময়ে কোন সরকারি পদে ছিলেন না। তাহলে পদত্যাগের হুমকির কথা

ওঠে কি করে? লেখক যদি এই কথা বলতে চেয়ে থাকেন যে বল্লভভাই-এর হুমকি ছিল কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলীকে পদত্যাগের পরামর্শ দেবেন — তাহলে বলতে হবে যে তাঁর ভাষা অস্পষ্ট ও বিভ্রান্তিকর। ৪৪ পৃষ্ঠায় তিনি "কংগ্রেস পার্টি অ্যাসেম্বলীর" উল্লেখ করেছেন। এটা কি বস্তু? অ্যাসেম্বলি পার্টি নয় তো? ইউনাইটেড নেশনস অর্গানাইজেশন (U.N.O.) বা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয় ২য় মহাযুদ্ধের পরিণামে। মিত্র শক্তি (allied powers) শব্দটির স্থলে বার বার (পৃ. ৫২ ও অন্যত্র) যুদ্ধকালীন অবস্থায় ঐ ইউনাইটেড নেশনস শব্দটির প্রয়োগ তিনি কী করে করলেন? তিলকের তিরোধান ঘটে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হবার পূর্বমুহূর্তে। কিন্তু লেখকের মতে (পৃ. ৫৬) "অসহযোগ আন্দোলনে তিলক ছিলেন বয়ঃজ্যেষ্ঠ নেতা।" গান্ধীজির প্রতি লেখকের অসন্তোষের সীমা নেই। তার ফলে তাঁর যুক্তিবোধ এমন আবিল যে তিনি ঐ একই পৃষ্ঠায় অবলীলাক্রমে লিখেছেন, "ভারতে গান্ধীআন্দোলনের এটাই বৈশিষ্ট্য যে আন্দোলন করা বা না করা সব বিষয়েই তাঁর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত।" ব্যাপারটা যখন লেখকের মতে "গান্ধী আন্দোলন", তখন তা শুরু করা বা না করার ব্যাপারে গান্ধী ছাড়া আর কার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে? কিন্তু তালিকা আর দীর্ঘ করে লাভ নেই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ: বিয়াল্লিশের আন্দোলন: কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টি — ডঃ শ্যামাপ্রসাদ বসু/নবজাতক প্রকাশন, এ-৬৪ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলিকাতা ৭০০ ০০৭/৩০ টাকা

খাসি, জয়ন্তিয়া ও গারো সমাজের মেয়েরা

নিবেদিতা চক্রবর্তী

'Women in Meghalaya'—সংকলন গ্রন্থটির সম্পাদক ডঃ সৌমেন সেন মহাশয় অসামান্য নিষ্ঠা ধৈর্য অধ্যবসায় নিয়ে সুদীর্ঘকাল গবেষণা করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সমাজ সংস্কৃতি ও সাহিত্যের নানা দিগন্তের উন্মোচন করে চলেছেন।

এই গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত নিবন্ধগুলি মেঘালয়ের খাসি, জয়ন্তিয়া ও গারো সমাজে নারীর অবস্থান — প্রাচীন ও বর্তমানের প্রেক্ষিতে এই অবস্থান কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তার বিচিত্র দিক এখানে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। সম্পাদক গ্রন্থটির মুখপাতে তাঁর সুচিন্তিত স্পষ্ট ধ্যানধারণাকে প্রকাশ করেছেন, অন্যদিকে যোগ্য সম্পাদকের মতো প্রতিটি আলোচনার মর্মার্থ তাঁর সম্পাদনায় যথাযথ গুরুত্ব সহযোগে পরিবেশিত হয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় উপজাতি সমাজে নারীর স্থান নিরূপণ করা, তার প্রেক্ষিতে সেই সমাজ ও তার অর্থনৈতিক পারিবারিক বনিয়াদের পরিচয় দেওয়া এই সম্পাদিত গ্রন্থটির মূল উদ্দেশ্য। এই প্রসঙ্গে নিবন্ধকারগণ খাসি, জয়ন্তিয়া ও গারো সমাজে নারীর অবস্থান মোটামুটি স্পষ্টভাবেই তুলে ধরেছেন।

তৃতীয় বিশ্বে যেখানে নারী নির্যাতনের নিত্যনতুন ঘটনা ঘটে সেখানে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের খাসি উপজাতির নারীর ভূমিকা, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, পারিবারিক জীবন, সমাজজীবন, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা ও স্বাধীনতা সর্বস্তরেই এত উজ্জ্বল ও গৌরবের যে সমতল ভূমির সভ্য সমাজকে তা লজ্জিত করে। মাতৃতান্ত্রিক প্রথা খাসি সমাজে প্রচলিত। পরিবারে সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও মর্যাদা নারীর করায়ত্ত — এই সত্য, উপজাতি শাখাটির প্রতি আমাদের সম্ভ্রম জাগায়। এই সমাজে উত্তরাধিকার নেমে আসে মায়ের সূত্রে। কন্যা সন্তান, নাতনি সকলেই মায়ের সূত্রে পরিচিত হয়। বংশ তালিকায় তাই মাতৃধারারই পরিচয় মেলে। এঁরা মাতৃপদবী গ্রহণ করেন। এই সমাজ গঠনে মেয়েদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মেয়েরা সমাজে অত্যন্ত পবিত্র, সৎ ও সুন্দর হিসাবে আদরণীয় হয়ে থাকেন, পরিবারের নানা শাখা প্রশাখাকে নানা পরিচয়ে এঁরা ধারণ করে থাকেন। এই গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত দুটি নিবন্ধে খাসি সমাজের বহু কৌতূহল জাগানো তথ্য নিবন্ধ দুটিকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। এই সমাজের বিবাহপদ্ধতি, ধর্মাচরণ, পারিবারিক অনুষ্ঠানের বিচিত্র নিখুঁত বিবরণ যা ইতিপূর্বে সাধারণ মানুষের অজানা ছিল — এই লেখায় জানা যায়। কনিষ্ঠ কন্যার সম্পত্তি প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা, গৃহের বহু উৎসবে নেতৃত্ব দেওয়া, সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া ইত্যাদি বহু চমকপ্রদ বিবরণ এই লেখা দুটিকে সমৃদ্ধ করেছে। সাধারণত মেয়েরা মদ্যপান করেন না, সামাজিক নানা অনুষ্ঠানে সালঙ্কারে যোগদানের অবাধ অধিকার আছে। স্বামী নির্বাচনে স্বাধীনতা আছে, বিবাহ-বিচ্ছেদ নিন্দনীয় হলেও অপ্রচলিত নয়। মেয়েদের স্বয়ম্বরা হবার অধিকার আছে। সেক্ষেত্রে গুরুজনরা কঠোর অনুসন্ধান করে তবেই পাত্র নির্বাচন চূড়ান্ত করেন। ব্যভিচার এই সমাজে গুরুতর শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হয়। মেয়েরা তাঁতবোনা, পশুপালন, চাষবাস ইত্যাদি নানা স্বল্প শ্রমজাত বৃত্তিতে অর্থ উপার্জন করে। এত কিছু সত্ত্বেও রাজনীতি ও শাসনকার্য পরিচালনায় মেয়েদের ভূমিকা আশ্চর্যভাবে অনুপস্থিত। আজকাল এসব ক্ষেত্রে মেয়েদের অংশগ্রহণের খবর অল্পস্বল্প পাওয়া যাচ্ছে। তবে তা নারীসমাজের প্রবণতা হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না।

এর পাশাপাশি, জয়ন্তিয়া সমাজে নারীর ভূমিকা আরও উজ্জ্বল বলে মনে হয়। এই সমাজে মেয়েরা পরিবারের অর্থনৈতিক গুরুদায়িত্ব বহন করার ক্ষমতা রাখে। এঁদের শারীরিক ক্ষমতা বিস্ময়কর। পরিবারে সন্তানপালন, তাদের শিক্ষাদীক্ষার নজরদারি করা, চাষবাস, ব্যবসা-বাণিজ্য তদারক ও পরিচালনা — সবরকম লঘু-গুরু দায়িত্বের কাজই এঁরা অনায়াস দক্ষতায় সম্পন্ন করেন। জয়ন্তিয়া সমাজ মাতৃতান্ত্রিক হলেও স্ত্রী পুরুষের সমানতালে জীবনের সবক্ষেত্রে এগিয়ে যাবার বলিষ্ঠতা এই সমাজের উন্নতির বনিয়াদ বলা যায়।

পুরুষরা সাংসারিক নানা দায়িত্ব বহন করেন। কঠিন শ্রম করে এঁরা সংসারকে সচ্ছল রাখার চেষ্টা করেন। স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি কেনাবেচার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতামত দেন। সাংসারিক, সাধারণ সব ব্যাপারেই এঁরা নারীর প্রতি নির্ভরশীল। তুলনায় খাসি সমাজের পুরুষরা নিষ্ক্রিয় এবং খানিকটা অলস ও স্ত্রী-নির্ভর মনে হয়। এর পাশে জয়ন্তিয়া সমাজে পুরুষের সহযোগী মনোভাব স্ত্রীদের আরও কর্মময় করে তুলেছে। নারীর শ্রমনিষ্ঠা, দায়িত্ব বহনের ক্ষমতা অপরিমিত— মনে হয় এর মূল উৎস নারী-পুরুষের সমাজ ও পরিবার গঠনে সমান দায়িত্ব গ্রহণের প্রবণতা। অর্থাৎ জয়ন্তিয়া সমাজ গঠন অনেকবেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ — বলা যায় বাস্তবসম্মত এবং যথেষ্ট আধুনিক। আধুনিক যুগের মানুষ সমাজে নারীর ভূমিকা নিয়ে বিশেষ চিন্তাভাবনা করছেন। এই সমাজের আদর্শ স্ত্রী-পুরুষের ভূমিকাটি অনুধাবন ও অনুসরণ করলে হয়ত আধুনিক সমাজ লাভবান হবে।

কঠোর শ্রমের বিকল্প নেই — এই আধুনিক স্লোগান জয়ন্তিয়া নারী সমাজের মেরুদণ্ড বলা যায়। এমন চমৎকার নারী-পুরুষের সমঝোতা সত্ত্বেও এই সমাজে নারী-পুরুষ একই ধরনের কঠোর শ্রম করা সত্ত্বেও নারী সমান মজুরি পায় না। এই বৈপরীত্য রীতিমত অমর্যাদাকর। এই একটি দিক ছাড়া সব ক্ষেত্রেই স্ত্রী-পুরুষের মিলিত ভূমিকা প্রশংসা করার মতো। নারীর চোখে পুরুষ অত্যন্ত সম্মানীয়। স্বাভাবিক ভাবে দাম্পত্য জীবন এখানে অনেক বলিষ্ঠ।

অবিবাহিত নারী সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী, পরিবারের নানা ধর্মানুষ্ঠানে এঁরা পৌরোহিত্য করেন। খ্রিস্টধর্মের প্রসারে এই সমাজে অসম্ভব কোন পরিবর্তন ঘটেনি। স্বামীরা স্ত্রীর মায়ের সংসারে একজন স্থায়ী সদস্য হিসাবে গণ্য হয়েছেন মাত্র। তাও খুব ব্যাপকভাবে এটা গৃহীত হয়েছে—এমন বলা যায় না। চিরাচরিত প্রথানুসারে এখনও তাঁরা স্বামীকে ভক্তিশ্রদ্ধা করেন এবং ঘরগেরস্থালির কাজ বিশেষ করতে দেন না। বিবাহবিচ্ছেদে চার্চ এখনও উৎসাহ দেয় না বলে মেয়েরা সংসারে আরও বেশি নিরাপত্তা বোধ করেন। আধুনিক যুগে মেয়েরা অনেক বেশি স্বাধীনচেতা হয়েছেন। অনেকেই সুশিক্ষিত হয়ে বহু দায়িত্বপূর্ণ সরকারি চাকরি করছেন ফলে স্থায়ী রোজগারের পথ প্রশস্ত হয়ে অর্থনৈতিক বনিয়াদ দৃঢ় হয়েছে।

খাসি ও জয়ন্তিয়া উপজাতি সমাজে নারীর সক্রিয় উজ্জ্বল কর্মকাণ্ডের পাশে প্রতিবেশী গারো নারী সমাজ বর্তমানে যুগেও অনেকটা ম্লান অন্ধকারে ঢাকা। পুরাণকথিত প্রাচীন গারো সমাজে মেয়েরা অত্যন্ত সম্মানিত ছিলেন। নারীর অপমানে একটা যুদ্ধ পর্যন্ত সংঘটিত হতে পারত। নারীকে সে যুগে পুরুষরা সম্মান ও মর্যাদা দিত।

চিরায়ত গারো সমাজে পিতামাতা যে কোন একজন কন্যাসন্তানকে উত্তরাধিকারী নির্বাচন করেন। তাঁকে কনিষ্ঠ কন্যা হতেই হবে এমন কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। তবে উত্তরাধিকারী মেয়েটি বিবাহের পর স্বামীসহ পিতৃগৃহে বাস করতে বাধ্য থাকেন। পিতামাতার বার্ধক্যে দেখাশোনা করার দায় থাকে। স্ত্রীর গৃহে বসবাসকারী স্বামী সেই পরিবারের প্রধান কর্তা হন। তাই জামাতা নির্বাচনে সতর্কতার দরকার হয়। সাধারণত পিতার ভাগ্নেকেই নির্বাচিত করা হয়। পরবর্তীকালে এই দম্পতি সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। এই নিয়মে নারী পুরুষ উভয়েই নানা জটিল সমস্যার মুখোমুখি হন প্রায়শ। এই নিয়মের ফলে স্ত্রী বা পুরুষ যে কোন একজনের মৃত্যু হলে অসম বয়সের স্ত্রী বা পুরুষকে বিবাহ করতে এঁরা বাধ্য থাকেন। ফলে উভয়েই এই নিয়মের বলি হয় বিশেষ করে মেয়েরা অপরিসীম দুঃখে জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়। অনেক সময় স্ত্রী বা পুরুষ বেশি বয়স বা খুবই অল্পবয়সের পুরুষ বা স্ত্রীকে বিবাহ করতে বাধ্য থাকে। স্ত্রীলোকের জীবনে এতে মারাত্মক ফল হয়। বিধবা মেয়েটি কন্যাসন্তানের জননী হলে কন্যাটি ঐ বিবাহের ফলে পুরুষটির দ্বিতীয় স্ত্রী হিসাবে গণ্য হন। ফলে শিশু নিপীড়ন একটা ব্যভিচারের পর্যায়ে চলে যায়।

এই সমাজে নারী শারীরিক, মানসিক লাঞ্ছনা ও অর্থনৈতিক নিপীড়নের শিকার হন প্রায়ই। কঠোর পরিশ্রম করতে হয় অথচ মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা হয় না। ক্ষেত-মজুরের কাজ, সংসারের সব কাজ, এই মেয়েরা করে। পুরুষ মানুষও পরিশ্রম করেন কিন্তু তাঁদের বিশ্রামের সময় অনেক বেশি। ক্ষেতে-খামারে, রাস্তায়-হাটে মেয়েরা সন্তান প্রসব করে থাকে। এই ঘটনাই ইঙ্গিত করে মেয়েদের সামাজিক মান। এদের মধ্যে কন্যা শিশুমৃত্যুর হার খুব বেশি। ব্যভিচার, কঠোর পরিশ্রম নারী নির্যাতনেরই নামান্তর বলা যায়। মেয়েরা রাজনীতিতে অংশ নিতে পারেন না, প্রকাশ্য ধর্মানুষ্ঠানেও মেয়েরা যোগ দিতে পারেন না। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের চেয়ে গারো সমাজের মেয়েদের অবস্থা আদৌ সুখকর নয় এসব বিবরণ পড়ে সেটাই মনে আসে।

খ্রিস্টান সমাজের প্রভাব এই সমাজকে অনেকটা উন্নত ও কুসংস্কার মুক্ত করলেও বহুগামিতা থেকে এদের সর্বাংশে মুক্ত

করা যায়নি। মেয়েরা শিক্ষার আলো পেলেও তা পর্যাপ্ত বলা যায় না। বিবাহ পরবর্তীকালে পঠন-পাঠনের কোন সুযোগই প্রায় থাকে না।

গত দু'দশক গারো সমাজে নারী জাগরণ এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। আধুনিক মনস্ক মেয়েরা আর্থ-সমাজ গঠনে এক নতুন ভূমিকা নিচ্ছে। শুধু ঘাম ঝরানো রুটি সংগ্রহ নয়, রীতিমত জীবনের সবক্ষেত্রে নারী নিজেকে বিকশিত করে সংসারের কঠিন দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেবার যোগ্যতা অর্জন করছে।

মাতৃতান্ত্রিক খাসি-জয়ন্তিয়া-গারো — তিন উপজাতি সমাজে আধুনিক নারীজাগরণের ঢেউ লেগেছে। কুসংস্কারের বেড়াজাল ভেদ করে নারীজীবনে আশার সূর্যোদয় ঘটছে।

সবশেষে বলা যায় সম্পাদক এমন একটি সুদৃশ্য ও মূল্যবান বই উপহার দেবার জন্যে সকলের ধন্যবাদভাজন হবেন।

Women in Meghalaya — (Ed) Soumen Sen / Daya Publishing House, Delhi-110035 / Rs. 100

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্প

শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তিতে প্রকাশিত 'গল্প সংগ্রহ' বস্তুত তাঁর আগের চারটি গল্পগ্রন্থের ('অন্য ঘরে অন্য স্বর', 'খোঁয়ারি', 'দুধভাতে উৎপাত' এবং 'দোজখের ওম') এক সুনির্বাচিত সংকলন। 'সুনির্বাচিত' এইজন্যই যে এর অন্তর্গত ন'টি গল্প পাঠ করার পর গল্পকার ইলিয়াসের চারিত্র ও চেতনাজগৎ — দুয়েরই এক স্পষ্ট রূপরেখা আমাদের সামনে ভেসে ওঠে। একটি গ্রন্থের পক্ষে এটা খুব বড় কথা — তার অন্তর্ভূক্ত রচনাগুলি একজন পাঠকের কাছে ভিন্ন ভিন্নভাবে কতদূর গ্রাহ্য হল, তার চেয়েও জরুরি সামগ্রিকতার বিচারে কীরকম হল তার অভিঘাত। একজন ঔপন্যাসিকের পক্ষে বোধহয় কাজটি সহজতর, যেহেতু উপন্যাসে খণ্ডচিত্রের কোনও অবকাশ নেই। ঔপন্যাসিককে পাঠকের কাছে পৌঁছতেই হয় সামগ্রিকতার বিচারে। কিন্তু যেখানে একাধিক ছোট গল্প গ্রন্থিত হচ্ছে, সেখানেই গল্পকারের পক্ষে দুরূহ হয়ে ওঠে আপন সত্তাকে প্রতিফলিত করা : তখন সামনে প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায় — আমি কি কয়েকটি খণ্ডচিত্র প্রকাশ করেই বিরত থাকব নাকি খণ্ডচিত্রগুলির মাধ্যমে এমন এক স্তরে উপনীত হব যেখানে শিল্পী হিসাবে আমার গোত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এই গোত্র প্রতিষ্ঠা করা নিছক অহংবোধের তাড়নায় নয়, একজন শিল্পীর পক্ষে তা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মতোই জরুরি।

ইলিয়াসের ন'টি গল্পের একটিকেও তাত্ত্বিকভাবে 'আর্বান' বা 'রুরাল' শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাবে না। কোনও কোনও কাহিনীর প্রেক্ষাপট হিসাবে শহর উপস্থিত হলেও ('উৎসব', 'যুগলবন্দি') শহর গৌণ থাকে, যেমনভাবে গৌণ হয়ে পড়ে গ্রাম ('পিতৃবিয়োগ', 'পায়ের নিচে জল')। এবং বাকিগুলিতেও প্রেক্ষাপট কখনই তুমুলভাবে উপস্থিত হয় না। এটাকে কেউ সীমাবদ্ধতা হিসাবে মনে করতে পারেন; কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে এই বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে ঘোষিত হচ্ছে 'স্থান'-এর সীমানা পেরিয়ে যাবার আকাঙ্ক্ষা, যা যে কোনও সার্থক কথাশিল্পীরই অন্যতম প্রধান লক্ষণ। একইভাবে ইলিয়াসের গল্পে কালের স্পর্শ থাকলেও তা কখনই কাল দ্বারা অধিকৃত নয়। অর্থাৎ 'উৎসব'-এ আনোয়ার আলির ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্তসুলভ যৌন আকুতি, 'খোঁয়ারি'-তে কয়েকজন যুবকের হতাশ হাহাকার, 'পিতৃবিয়োগ'-এ আশরাফ আলির দ্বৈতসত্তা, 'যুগলবন্দি'-তে নির্লজ্জ দাসমনোবৃত্তি কিংবা 'দোজখের ওম'-এ ঐকান্তিক জীবনস্পৃহা — দেশকালের গণ্ডি পেরিয়ে, তথাকথিত গরীব বড়লোকের শ্রেণী বিভাজন মুছে ফেলে সামগ্রিকভাবে মানুষের কথা হয়ে ওঠে, মানবপ্রবাহের কথা হয়ে ওঠে, যেখানে লেগে থাকে চিরন্তনতার স্পর্শ।

কিন্তু তবু ইলিয়াসকে একজন মহৎ সাহিত্যিক বলতে পারছি না। প্রথমত, আলোচ্য গ্রন্থে একটি গল্পও সার্থকভাবে 'গল্প' হয়ে ওঠেনি। একটি গল্পের প্রাথমিক সার্থকতা এখানেই যে গল্পটিকে 'গল্প' হয়ে উঠতে হবে। গল্পত্ব বর্জন করে শুধু বিবৃতিধর্মী রচনার আশ্রয় নিলে সেখানে কায়ক্লেশে একটি কাহিনীর আবছা অবয়ব ফুটে ওঠে বটে, কিন্তু তাকে কখনই 'গল্প' বলা যায় না। 'গল্পহীনতার গল্প' নিয়ে ঝুড়িঝুড়ি লেখা হচ্ছে ঠিক কথা, কিন্তু তার বেশিরভাগই কালস্রোতে ভেসে যাবার জন্যই। লক্ষ করলে দেখা যাবে, বিশ্বসাহিত্যে যে সব গল্পকে আজও আমরা শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা দিয়ে থাকি, তাদের প্রতিটিই গল্পের উপাদানে পূর্ণ — অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট কাহিনীকে কেন্দ্র করে একটি নির্দিষ্ট সূচনা আছে, মধ্যভাগ আছে এবং অনিবার্যভাবে সমাপ্তিও আছে।

এ ক্ষেত্রে কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, তা বলে কোনও 'গল্পহীনতার গল্প'-ই কি টিকে নেই, কিংবা কোনও ক্ষীণ কাহিনী নির্ভর গল্প। উত্তরে বলব, হ্যাঁ, অবশ্যই আছে। কিন্তু তারা টিকে আছে তাদের কাহিনীর অস্পষ্টতার জন্যে বা গল্পহীনতার জন্য নয়, তাদের অনবদ্য রচনাশৈলীর গুণে। একটি গল্পকে 'দাঁড় করানোর জন্যে' রচনাশৈলীর চমৎকারিত্বও প্রয়োজন। এবং রচনাশৈলীর চমৎকারিত্ব মানেই 'শিথিলতা, ফাঁকফোকড়, উচ্ছ্বাস-প্রবণতা, ওপরচালাকি, অস্বচ্ছতা' না। কিংবা 'চিত্তবিনোদনের উপযোগী' হলেই যে রচনাটি সাহিত্যগুণ বর্জিত, এমন কথা বলা যাবে না। এই সূত্র ধরেই এসে পড়ে

ইলিয়াসের রচনাশৈলীর কথা। এই গল্পগ্রন্থে শিবনারায়ণ রায়ের ভূমিকাটি পড়ে জানলাম ইলিয়াসের 'অন্য ঘরে অন্য স্বর' গল্পগ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে বাংলাদেশের আর এক কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক লিখেছিলেন : "শ্মশানের মড়া পুড়িয়ে পুড়িয়ে চণ্ডালের যে অবস্থা ইলিয়াসেরও তাই। ......এই বইয়ের গদ্য শুকনো খটখটে, প্রায় সবটাই ডাঙা ; ডাঙার উপরে কচি নরম গাছপালা জন্মেছে এমনও মনে হয় না। কোথাও একটু দয়া নেই, জল দাঁড়ায় না — বাস্তব ঠিক যেমনটি, তেমনটি আঁকা। ....ইলিয়াসের খোলা চোখের দৃষ্টি সমকালীনতার মূলটুকু দেখে নেয়, দাঁত নখ সবই বাজপাখির মতো তড়িঘড়ি ও সোজাসুজি, আর ঠিক সেইটুকুই তিনি লিখতে বসে যান।" সন্দেহ নেই কথাগুলি এক শৈল্পিক গুণে ভরপুর। কিন্তু এর দ্বারা প্ররোচিত হয়ে কেউ যদি ইলিয়াসের গল্প পড়তে বসেন, তবে আশাহত হবেন। ইলিয়াসের শৈলী বিশুষ্ক — কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এই বিশুষ্কতার সীমাবদ্ধতা এখানেই যে তা ক্ষেত্রবিশেষে শুধু ক্লান্তিকরই নয়, তাঁর কাহিনীতে কোনও নবতর মাত্রা যোগ করে না, পাঠককে জাগরিত করে না কোনও মহত্তর বোধে। ঠিক যে পর্দায় কাহিনীর শুরু, শেষও হয় সেখানেই। না কাহিনীবিন্যাসে, না চরিত্রের বিকাশে, কোথাওই নির্দিষ্ট পরিণতির চিহ্ন দেখি না। এক অদ্ভুত 'মোনোটনি' জড়িয়ে থাকে কাহিনীর সর্বাঙ্গে, যা এক সময় পাঠকের স্ফূর্তি ও উদ্যম নষ্ট করে দেয়। এক শ্রেণীর গল্পে এই ধরনের শৈলী কাম্য, যেখানে লেখকের উদ্দেশ্যই থাকে চরিত্রের ব্যক্তিগত উপলব্ধি বা তার চেতনাজগৎ দ্বারা পাঠককে অবসন্ন করে ফেলতে এবং সেই অবসাদের মাধ্যমে এক বিশেষ লক্ষ্যে পৌঁছনো। কিন্তু ইলিয়াসের গল্পগুলির ক্ষেত্রে মনে হয় না এহেন কোনও বিশেষ লক্ষ্য কাজ করছে। লেখক যেখানে গল্পের মধ্যে সর্বসাধারণের প্রসঙ্গ আনছেন, সেখানে তাঁর ভাষাও সর্বজনগ্রাহ্য হওয়া প্রয়োজন। লেখক কি প্রত্যয়ের সঙ্গে এ কথা বলতে পারেন যেসব দারিদ্র্যক্লিষ্ট, নিরন্ন, রোগজীর্ণ মানুষের ছবি একাধিক কাহিনীতে তুলে ধরেছেন, সেই স্তরের মানুষদের কাছে এ'হেন বিশুষ্ক ভাষা-সম্বলিত কথাসাহিত্য কখনও পৌঁছবে? তা'হলে কাদের জন্য তিনি লিখছেন? সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য? সেখানেও কি প্রতিহত হবার সম্ভাবনা থাকে না? তবে কি লেখক বলবেন পাঠকের কথা ভেবে লেখেন না তিনি? তাহলে প্রশ্ন করতে হয়, সেক্ষেত্রে কি লেখক নিজেকে 'এলিট' শ্রেণীভূক্ত করছেন? গোটা ব্যাপারটাই কি বড় বেশি দ্বন্দ্বদীর্ণ নয়? 'বাস্তব ঠিক যেমনটি, তেমনটি আঁকা' হলেই সাহিত্যের দাবি মিটবে, তা কখনই বলা যায় না। তাহলে সাহিত্যরচনার প্রয়োজন কী? কী'ই বা প্রয়োজন সাহিত্যপাঠে? নিষ্পলক দৃষ্টিতে বাস্তবকে দেখে গেলেই তো হল। এবং তবে তো বলতে হয় ফোটোগ্রাফিই সর্বোত্তম শিল্প। কিন্তু একজন প্রকৃত সাহিত্যিকের দায়িত্ব বোধহয় সেটা নয়। বাস্তবকে অবলম্বন করে তার এমন কিছু সৃষ্টি করা প্রয়োজন (নির্মাণ নয়), যা বাস্তবের থেকে 'অধিকতর সত্য' হয়ে ওঠে। দুর্ভাগ্যবশত, ইলিয়াসের একটি গল্পেও সেই 'অধিকতর সত্য' খুঁজে পাই না। যা পাই তা শুধুই তদ্গতভাবে বাস্তবকে অনুসরণ, বাস্তবের সানুপুঙ্খ বর্ণনা, কখনও কখনও প্রায় ছাত্রমনোচিতভাবে বাস্তবের ক্লাসঘরে বন্দী থাকা। অথচ আমাদের পক্ষে কতখানি সৌভাগ্যের হত যদি দেখতাম ইলিয়াসের রচনাশৈলী শুধুই নির্মেদ, নির্বহুল ও নিরলংকার, কিন্তু কখনওই বিশুষ্ক নয়। কত ভাল হত আমাদের পক্ষে যদি দেখতাম গল্পগুলির আড়ালে লুকিয়ে আছে লেখকের 'দ্রষ্টা'-সুলভ নৈর্ব্যক্তিকতা, যদি একজন সার্থক স্রষ্টার মতোই তিনি তাঁর কাহিনীর যাবতীয় ঘটনাপ্রবাহ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতেন। আমাদের পক্ষে অনেক আশাপ্রদ হত যদি দেখতুম, যে জীবনভূমিতে ব্যক্তিমানব হিসাবে তিনি বিচরণশীল, সাহিত্যের ক্ষেত্রে সেই জীবন তাঁর কাছে হয়ে উঠেছে অনিবার্য উপকরণমাত্র, কিন্তু কখনওই একমাত্র অবলম্বন নয়। তা হলেই গল্পগুলিকে আস্বাদন করতে পারতুম এক-একটি অমূল্য হীরকবিন্দু রূপে, প্রতিটি চরিত্রই তখন হয়ে উঠত আপন প্রাণের বেগে গতিশীল, প্রতিটি কাহিনীর শেষে শুনতে পেতুম অমলিন জীবনসঙ্গীত। এ'প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ আশা করি দেওয়া যেতে পারে। 'যুগলবন্দি'-র মতো একটি প্রোজ্জ্বল গল্পে (যেখানে কর্তাব্যক্তির বশংবদ আসগর এবং কর্তার পোষা কুকুর আরগসের নামের আপাত-সাদৃশ্য চমকপ্রদ ও অর্থবহ) সরোয়ার কবিরকে যখন জনৈক বন্ধু জিজ্ঞেস করে, "বৃষ্টি টিষ্টি হলে জগিং করো কি করে?....", তার উত্তরে কবির বলেন, "ঘুম ভাঙলে বিছানায় শুয়ে শর্ট একটা ইন্টারকোর্স সলভস ইয়োর প্রবলেম। কয়েকটা স্ট্রোক দিলেই তলপেটে চাপ পড়বে, এরপর রেগুলার ডোজ অফ থ্রি সিগারেটস এ্যাণ্ড ইউ গেট ইওর বাউয়েলস ক্লিয়ার।" এই কৌতুকমুখর অংশটি পাঠ্য হিসাবে মনোরঞ্জক, এবং সমাজের প্রভাবশালী, বিত্তবান পুরুষ সরোয়ার কবিরের মুখে হয়তো মানিয়েও যায় ঠিক, কিন্তু সাহিত্যের বিচারে মনে হয় যে লেখক একটু ইচ্ছাকৃতভাবেই চড়া সুরে কথা বলে ফেললেন সাদা কালো রঙের পোঁচ লাগানোর জন্যে।

ইলিয়াসের গল্পের গুণগুলি একবারও অস্বীকার করছি না। তাঁর গল্পে সমকালীন সমাজের অবক্ষয়, শূন্যগর্ভতা — সবই আন্তরিকভাবে বর্ণিত। পরিবেশ-নির্মাণেও তিনি দক্ষ। তাঁর মতো ক্ষমতাধর লেখক দুই বাংলাতেই এখন দুর্লভ। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই তিনি একজন নিষ্ঠাবান নির্মাতা, উচ্ছ্বাসহীন কারিগর, কখনই হৃদয়গ্রাহ্য স্রষ্টা নন। আক্ষেপ এখানেই যে তিনি কোথাও কোথাও একজন হৃদয়সংবেদী স্রষ্টার স্বাক্ষর রেখেও সর্বত্র তা' রক্ষা করতে পারেননি। তা না হলে

'পিতৃবিযোগ'-এ আশরাফ আলি কিংবা 'দোজখের ওম'-এ কামালুদ্দিনের মতো চরিত্রচিত্রণ সম্ভব হত না, যেমনভাবে সম্ভব হত না 'অন্য ঘরে অন্য স্বর' গল্পে স্বপ্নমেদুর পরিবেশ রচনা।

এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে ইদানিং রিয়্যালিজমের দোহাই পেড়ে এক শ্রেণীর লেখক উঠেছেন যারা নেহাতই বিবরণধর্মী রচনা উৎপাদন করেই ক্ষান্ত থাকেন। শোষক শোষিত শ্রেণী নিয়ে সাতবাসি ক্লিশে বিষয়বস্তুর চর্বিতচর্বণ, বিহঙ্গ দৃষ্টিতে দেখা গ্রামীণ চিত্র ও দেশজ ভাষার গুঁড়োমশলা ছড়িয়ে এরা ভাবেন যে সর্বসাধারণের সাহিত্য রচনা করছেন। নিজেদের সমাজমুখী, কালসচেতন লেখক হিসাবে কল্পনা করে আত্মতৃপ্ত থাকেন এরা। কিন্তু নীট ফল দাঁড়ায় এই যে পাঠকের সঙ্গে এদের থেকে যায় এক অসেতুসম্ভব ব্যবধান। আশার কথা, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এঁ'দের কোনও মিথ্যাচারণ করেননি। তিনি যে প্রকৃতপক্ষে একজন সৎ এবং আত্মনিষ্ঠ লেখক, এই কথাটুকু তাঁর সুমুদ্রিত ও সুপরিবেশিত 'গল্পসংগ্রহ'-র মাধ্যমে পাঠকের কাছে পৌঁছে যায়। এবং সেই সঙ্গে আমাদের মনে জন্মায় তাঁর কাছ থেকে মহৎ সাহিত্য লাভের প্রত্যাশা।

গল্পসংগ্রহ—আখতারুজ্জামান ইলিয়াস / একশে ১৩/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩ / ৩৫ টাকা

দু'ধরনের কবিতা

হাসির মল্লিক

অন্নদাশঙ্কর রায়কে ভালবেসে, স্বামীপ্রদত্ত নামে লীলা রায় হয়ে তিনি বিয়ের পর বাষট্টি বছর এদেশে কাটিয়ে এখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অভ্যস্ত হলেন বাঙালিয়ানায়। বিয়ের পর এই দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে লীলা রায় আর স্বদেশে যাননি। তিনি নিরন্তর চেষ্টা করে গেছেন বাঙালি ঘরের গৃহিণী হয়ে উঠতে। বাঙালি মেয়েদের চেয়েও সুন্দর শাড়ি পড়তেন। স্বামী ও শাড়ির সঙ্গে ভালোবেসে ফেলেন বাংলার ফুল, পাখি, ভোর, ভোরের কোকিল। আপ্রাণ চেষ্টায় শেখেন ভাষা। যদিও লেখক স্বামীর পেছনে থাকতে ভালবাসতেন। লীলা রায় লিখছেন "আমি পেছনেই থাকতে ভালোবাসি। ঘরের কোণে বসে থাকতে ভালোবাসি। আমি লেখকের স্ত্রী। তাঁকে কথা বলতে দিই।" স্বামীর পেছনে থাকলেও সাহিত্য অঙ্গনের সামনে লীলা রায় বারে বারে এসেছেন নিজ প্রতিভায় ও বহুভাষা চর্চার গুণে। নিজেকে বাঙালি-এদেশীয় ভেবেছেন বারে বারে। যদিও কোন কোন সময় নিজেকে বিদেশিনীও ভেবেছেন—প্রচণ্ড খেদ ও বেদনায়। তিনি লিখছেন "একষট্টি বছর হলো আমি আছি এইখানে। এখনো বিদেশিনী — একটা দিন তো বিদেশে ছিলাম না, নিজেকে কোনদিন বিদেশী মনে করিনি। বিদেশীরা কোথায় হয়? সেইখানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুধু লাগে। সেসব রূপ ভয়ঙ্কর, ভয়ঙ্কর রূপ যখন ধরে মানব-সমাজে। তখন আমার মনে হয় — হ্যাঁ, আমি বিদেশিনী সেখানে।" তিনি বাংলা শিখেছেন যত্ন করে এবং তেমনই কবিতা, বাংলা কবিতাকে ভালবেসেছেন। বাংলা কবিতা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য আলোচ্য গ্রন্থের সংযোজনে লেখেন— "কবিতা আমার ছোটবেলা থেকে খুব প্রিয়। বাংলাভাষা প্রথম থেকে বুঝলাম যে, কবিতার ভাষা এমন এক ভাষা যেইখানে মেয়েদের নামও হয় কবিতা।" বিভিন্ন সাহিত্য কর্মের সঙ্গে সঙ্গে লীলা রায় গোপনে বাংলায় কবিতা লেখেন। অন্নদাশঙ্কর রায় ভূমিকায় জানাচ্ছেন— "১৩৮৮ সালে প্রকাশিত 'তবে' কবিতাটি পড়ে আমি আবিষ্কার করি যে লীলা রায় বাংলা ভাষাতেও কবিতা লিখতেন"। স্বামীকে দেখাতেন না। কেননা "আমাকে দেখালেই আমি ভুল ধরতাম।" এ গ্রন্থে অতিসংযত ভূমিকা আমাদের অবাক করে। স্ত্রী গুণী হলে আমরা প্রায়শ যেরকম প্রচারমুখর হয়ে উঠি তা কতটুকু নয়। কিন্তু অন্নদাশঙ্কর লিখছেন "বিবাহের পর বাষট্টি বছর তিনি অবিভক্ত বঙ্গে ও পশ্চিমবঙ্গে বাস করেছেন। বাংলা ভাষা তিনি যত্ন করে শিখেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর বাংলা নিখুঁত ছিল না।"

'একদা' লীলা রায়ের প্রথম ও শেষ কাব্যগ্রন্থ। প্রিয় কবিতার গ্রন্থিতরূপ তিনি চাক্ষুষ করে যেতে পারেননি। 'একদা' কাব্য গ্রন্থে ফুটে উঠেছে তাঁর নরম রমণীয় মন; বাংলার রূপকে ভালবাসার টুকরো টুকরো ছবি। কবিতাগুলি কতটা আধুনিক রীতিনীতির কাছাকাছি এসেছে সে কূট তর্ক ও প্রশ্নে আমরা না গিয়ে ভাবতে ভালবাসি যদি একজন বিদেশিনী কেমন বাংলা কবিতায় শব্দ শব্দ খেলেছেন, মজা পাব তাহলে। ছোট ছোট কবিতায়, কাব্যমুহূর্ত সৃষ্টি, শান্ত মেজাজ এসব মিলিয়ে নিজের মতো করে বাংলা কবিতা তিনি লিখেছেন, কবিতা না হলেও তাঁর বাংলায় উপলব্ধির, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার বিবরণ যেন এসব সৃষ্টি। কখনও বা দিনযাপনের মন্ত্রচারণা — "আনন্দের আলোয়/অন্তর উদ্ভাসিত/দীপান্বিত হয়ে/ধ্যানে বসি/অসীমের সুখে/রূপ তুলে বুকে।" নিজেকে সাধারণ করে লুকিয়ে রাখতে ভালবাসেন যেন। বলেন "হেলেন আমি নই — নই দিও টাঁমা/বাসন মাজি কাপড় কাচি/ঘরে ঝাঁট দিয়ে থাকি...."

তবে তাঁর সাধারণ উচ্চারণের পাশে দু একটি চিত্রকল্পের বুদ্বুদে চমকে উঠি, মজাও পাই — "সন্ধ্যা নামলে/গ্রহের গোয়াল ঘরে/আকাশ বাঁধা হয়।"..... "আকাশ হাল্কা করলে/চাষা কবি জাগে" বা "সূর্যের হব জেলে/যেথা মাছ মেলে"। বাংলার গ্রাম, কোকিল, ভোর বার বার তাঁর কবিতায়

ফুটে উঠেছে। কোকিলের ডাক বোধহয় প্রিয় ছিল, অনেক কবিতায় ঘুরে ফিরে এসেছে। লেখেন "গ্রামের ভোর/কাকের নয়/কোকিলের", "পাশ ফিরে মাথায় টানে/অন্ধকারের চাদরটা/লাঠি ঠুকে শিষ দেয়/চৌকিদার। ডাকে/প্রথম পাখিটি/কোকিল ডেকে/", "কাক ভোরে/উঠে পড়ি/কিন্তু/কোকিল জাগে আগে।"

'সাহিত্যতীর্থ' বইটি আরও যত্ন নিয়ে ছাপতে পারতেন। অজস্র ছাপার ভুল যেমন, তেমনই বারে বারে একই কবিতার পুনর্মুদ্রণ হয়েছে — সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। সংযোজন অংশে লীলা রায়ের ভাষণ ও তাঁর সাহিত্য, জীবন কবিতা নিয়ে আলোচনাটি মূল্যবান।

আধুনিক কবিতার জগতে সজল বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচিত নাম। তাঁর ছোটছোট কবিতার গুণে তিনি নিজস্ব একটা স্টাইল তৈরি করতে সফল হয়েছেন। সেই সিদ্ধিতে আমরা অনায়াসে তাঁর কবিতাকে ভিড় থেকে পৃথক করতে পারি। এভাবে অজস্র আধুনিক কবিতার ধারা থেকে নিজেকে পৃথক করাতে সফল হওয়া মানে — পাঠকের মনে স্থায়ী আসনে বসে থাকা। কিন্তু আমার আলোচ্য 'ভ্রমণ' কবিতার বইটিতে সজল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবই বড় কবিতা। এবং বড় কবিতা লেখার সপক্ষে কবি কৈফিয়তে স্বীকার করেছেন ছোট কবিতা লেখেন এটা শুনতে হয় তাই তিনি বিভিন্ন সময়ে যে বড় কবিতা লিখেছেন তার পরিচয় একত্রে তুলে ধরতে ষষ্ঠ বই 'ভ্রমণ' প্রকাশ করছেন। ১২টি কবিতা আছে। অধিকাংশ কবিতা গদ্যের আকারে। গদ্য হলেও যেহেতু কবির হাতে গদ্য ও অনুভবে যে কাব্যিক মেজাজ থাকে সেই গুণে এই গদ্য-আয়তনিক রচনাগুলিও কবিতাই। তবে কবিতাগুলি আধুনিকতার তকতকে, বিক্ষুব্ধ সময়ের চিত্রে, গদগদ মেজাজ মর্জিতে ভরপুর। সময়ের টেনশন ও জটিলতাও থাকে। সজল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা মাথার মধ্যে কাজ করে। আমরা যেহেতু তাঁর ছোট কবিতা পড়তে অভ্যস্ত এবং লাইনের পর লাইন পড়ে গেলাম কবিতা শেষ হল অথচ কাব্যানুভূতি, চমক শেষ হল না — এই বোধে চমকে চমকে উঠতাম। বড় আয়তনের কবিতায় তেমনটা পেলাম না। তবে মাথার মধ্যে কাজ করে। চট করে পড়ে গেলে স্বাদ পাওয়া যায় না। ধীরে এবং একান্তে শুধু ভিন্ন ধরনের কবিতা পড়ব — এমন প্রস্তুতি নিয়ে পড়লে — তখন টের পাই মনের মধ্যে সজলের সৃষ্ট লাইনগুলি মাথা বেয়ে নেমে আসছে। টেনশনে ব্যাপিত হয়ে শেষে একটা আচ্ছন্নতা গ্রাস করছে — আমার তা হয়েছে। ঝরঝরে ভাষায়, টুকরো টুকরো ছবির পর ছবি দিয়ে বড় কোলাজ তৈরির প্রয়াস আছে বড় কবিতাগুলিতে। তবে অভ্যস্ত পাঠকের যে দোষ সেই দোষে আমিও দুষ্ট — তাই বলতে হচ্ছে — ছোট কবিতায় কবি সজল বন্দ্যোপাধ্যায়কে যেভাবে পাই, তিনি যে ভাবে সিদ্ধ — নিজের একান্ত যে পথ, পথ পরিবর্তে এই ভিন্ন পথে 'ভ্রমণে' বেমানান লাগে। কিছুটা ধাক্কাও লাগে। আমার ভালো লেগেছে "জ্যোৎস্নায় নিরুদ্দেশ", "ভ্রমণ", "দোঁয়ার মধ্যে নিরুদ্দিষ্ট মানুষ", "আমার মুখ আমার শহর" কবিতাগুলি।

এ বইও মুদ্রণ প্রমাদ এড়াতে পারেনি। বোধহয় নির্ভুল মুদ্রণে বই প্রকাশ পৃথিবীতে অসম্ভব।

একদা — লীলা রায়/সাহিত্যতীর্থ, ৬৭ পাথুরিয়া ঘাট, কল-৬/১০ টাকা

ভ্রমণ — সজল বন্দ্যোপাধ্যায়/মহাদিগন্ত, বারুইপুর, ২৪ পরগণা/৭ টাকা

বাংলাদেশে চতুরঙ্গের পরিবেশক

পাঠক সমাবেশ

১৭/এ, আজিজ মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা

কাজী আবদুল ওদুদ থেকে (শাশ্বত বঙ্গ)

জ্যোতির্ময়ী দেবী

বহুদিন আগের কথা। তখন আমার বয়স কত তা মনে পড়ে না। লেখাটা কোন সালের 'ভারতী'তে বেরিয়েছিল তাও মনে নেই। লেখাটা — বঙ্কিমচন্দ্রের ও কিছু অন্য লেখকের সম্পর্কে রচিত। বিষয় তাঁদের উপন্যাসের চরিত্র। লেখকের নাম কাজী ইম্‌দাদুল হক।

তখন আমাদের সাহিত্যের জগতে মুসলিম সমাজের লেখক হাতে গোনা যায়। তাই আর ওই সব লেখকদের সম্পর্কে ক্ষোভময় লেখা বলে ভাবটাই মনে আছে। আর কিছু কথাই মনে নেই।

পরে যেদিন 'আনন্দমঠ' 'শ্রী ও পদ্ম' বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক নিয়ে বিক্ষোভ দেখা গেল, সে সময়ে দু'একজন তেজস্বী মুসলমান কলম ধরেছিলেন, তাঁদের একজনের নাম শ্রীযুক্ত রেজাউল করিম সাহেব। এবং তাঁর সঙ্গে ছিলেন যিনি তাঁর নাম ছিল কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব। ('বঙ্কিম চন্দ্র' প্রবন্ধের বই)।

কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব, কোরান শরীফ হজরতের জীবনীকার, রবীন্দ্র কাব্যের আলোচক ('বিচিত্রা'), মহাকবি গেটের জীবনচরিতের অনুবাদক, বাংলার জাগরণ ও নানা প্রবন্ধ সাময়িক পত্রে, শরৎ সাহিত্যের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতাও দিয়েছিলেন। প্রথমে তাঁর লেখা মহাকবি গেটের জীবনচরিত চোখে পড়েছিল বইয়ের দোকানে। পরে চোখে পড়ে 'শাশ্বত বঙ্গের' সমালোচনা। (যার কথা সেদিন বলেছি।)

আজকে তাঁর ঐ শাশ্বত বঙ্গেরই কয়েকটি লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি। যা পড়লে ভাষা ও ভাবনায়, চিন্তার ধারাতে মনে পড়ে যায় 'বঙ্কিমচন্দ্রের' বিবিধ প্রবন্ধগুলি এবং ভূদেব প্রবন্ধাবলী। বইয়ের বিজ্ঞাপনে দেখতে পাচ্ছি, উপন্যাস ও গল্পও আছে, নাটকও আছে। কিন্তু লেখক ঔপন্যাসিক বা নাট্যকার বলে সাহিত্য জগতে প্রখ্যাত হননি। হয়ত স্ব-সমাজে হয়েছেন। কিন্তু তাঁর সমাজে, আজ থেকে ৪০/৫০ বছর আগে যখন বাংলাদেশ বিভক্ত হয়নি, তখনও কি গল্পকার নাট্যকার নামে পরিচিত ছিলেন? আমার চোখে কিন্তু গল্প, নাটক পড়েনি। 'মোস্‌লেম ভারত' পত্রিকাগুলি দেখেছিলাম; তাতে কাজী সাহেবের লেখা ছিল বলে মনে পড়ে না। তখন কাজী নজরুল ইসলাম নামই বেশি চোখে পড়েছে।

আজকে ওদুদ সাহেবের কথা লিখতে বসে সর্বপ্রথমেই মনে হচ্ছে তাঁর সঙ্গে পরিচয় তো বেশ কিছুদিন আগে হয়েছিল। লেখাও পড়তে দিয়েছিলেন 'শরৎ বক্তৃতা' ও 'বাংলার জাগরণ'। গেটে তো আগেই কিনেছিলাম। কিন্তু তখন কেন তাঁর সাহিত্যের মনোহরিতা নিয়ে কিছু শিখিনি? তখন দেশে জীবিত লেখককে প্রশস্তি জ্ঞাপন, আনন্দময় স্বীকৃতি জানানোর প্রথা তো চলেছিল। যা' সেকালে মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র পাননি। রবীন্দ্রনাথ পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে (১৩১১?) পেয়েছিলেন। সাহিত্য পরিষদ থেকে। পরেও সত্তর বর্ষ পূর্ণ হলে পেয়েছেন। একালের ছোট বড় সাহিত্যিকেরাও মাঝে মাঝে দলের মাঝ থেকে ঐ আনন্দিত সম্বর্ধনা পেয়ে থাকেন।

রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখিকা জ্যোতির্ময়ী দেবীর জন্মশতবর্ষ পূর্তি হয়েছে জানুয়ারি, ১৯৯৪-তে। রাজস্থানের অন্তঃপুরে কেটেছে তাঁর জীবনের কিছুটা সময়, পাঞ্জাবে বহুদিন থেকেছেন।

বাংলা সাহিত্যে লেখিকার প্রথম প্রবেশ কবিরূপেই। তাঁর রচিত গল্প ও উপন্যাসের আড়ালে সাধারণ পাঠকের কাছে তাঁর কবিমানসের পরিচয় অজ্ঞাত রয়ে গেছে হয়ত। তাঁর কবিতাগুচ্ছ 'চক্রবাল' ও অন্যান্য ব্যঙ্গ কবিতা আধুনিক কবিতার পর্যায়ে পড়ে।

শুধু রাজস্থানের ও পাঞ্জাবের কথা-কাহিনীই নয়, নারীর চিরন্তন সমস্যা নিয়ে নানাদিক থেকে তিনি ভেবেছেন এবং তাকে রূপ দিয়েছেন ঐকান্তিক নিষ্ঠায়, তাই একটি দীর্ঘ যুগের অন্তরঙ্গ ছবির সত্য পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর রচনার ছত্রে ছত্রে। সমগ্র রচনায় সারা ভারতের সমাজচিত্র রূপায়িত হয়েছে নানাভাবে। গল্প, উপন্যাস, কবিতা এবং প্রবন্ধও লিখেছেন, এ পর্যন্ত তাঁর বহু রচনাই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

বর্তমান অপ্রকাশিত রচনাটি জ্যোতির্ময়ী দেবীর কৃতী পুত্র রসায়নবিদ শ্রী অমিতাভ সেন-এর সৌজন্যে পাওয়া। জন্মের সন তারিখ দেখে অনুমান হয় জ্যোতির্ময়ী দেবী এবং কাজী আবদুল ওদুদ প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। কাজী আবদুল ওদুদের জন্মশতবর্ষপূর্তি (এপ্রিল, ১৯৯৪) উপলক্ষে এই রচনাটি প্রকাশ করা হল।

কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবও তো দীর্ঘায়ু মানুষ। দেশি-বিদেশি নানা ভাষায় ও শাস্ত্রে, সুপণ্ডিত, রসিক সাহিত্যিক ছিলেন। আমরা কেউ কি তাঁকে দেখতে পাইনি? আমাদের মেয়েদের তো দৌড় — যাদের পদক্ষেপ যেন 'মোল্লার দৌড় মসজিদ অবধি' — 'ঘর থেকে আঙিনা বিদেশ' বলা যায়। কিন্তু পুরুষ সাহিত্যিকদের, তাঁর বন্ধু, রসিক সজ্জন পাঠকদেরও কি একবারও মনে হয়নি; তাঁর পার্কস্ট্রিটের কর্মময় শেষদিকে অসুস্থদেহে কর্মসাধনাময় বাড়িতে জড়ো হয়ে শধু জানানো, আমরা তাঁর লেখা পড়েছি। পড়ে ভাল লেগেছে। যা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক মাত্রেরই প্রাপ্য। মালা নয়, চন্দন নয়, জনতা নয়, সমারোহও নয়, শুধু আনন্দ-জ্ঞাপন। শুধু বলা আমরা সাধারণরা তাঁকে তাঁর লেখার মধ্যে দেখতে পেয়েছি।

আজ তাঁর লেখার উদ্ধৃতি দিতে বসে ক্ষোভের সঙ্গে মনে হচ্ছে নিজের দীর্ঘসূত্রিতার কথা। দীর্ঘসূত্রী মানুষকে মেয়েলি কথায় বলে 'ওর আঠারো মাসে বছর'। এ আঠারো মাসটার দীর্ঘসূত্রিতাটা যদি তাঁর জীবিত কালটা আবৃত করে নিতে পারত!

এই উদ্ধৃতিগুলিতে পাঠক দেখতে পাবেন সেকালে আমাদের বাংলা সাহিত্যের নবজাগরণের সময়ের ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখের মত ওদুদ সাহেবের সমগ্রভাবে স্বদেশ-চিন্তা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এবং পৃথকভাবে স্বমতি, স্বধর্মীয়দের জন্য আবার পৃথক করেই নানা চিন্তা, আলোচনা দিকদর্শন, অসাম্প্রদায়িক ভাবে ও সমগ্রভাবে ইতিহাস চিন্তা, জাতির কল্যাণ ভাবনায় উদ্বেলিত একটি চিত্তকেও দেখতে পাওয়া যাবে।

যা হয়ত আর কোনও ওই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। উভয় সম্প্রদায়েই যাতে হজরৎ মহম্মদ, মামুদ গজনী, আল বেরুনী প্রমুখ থেকে রামমোহন, শেষে রবীন্দ্রনাথও আছেন। সাধারণ সাহিত্যিকও আছেন। এই চিন্তা-সংগ্রহ থেকে উদ্ধৃতি কণিকা তুলে দেওয়ার আমার উদ্দেশ্য তাঁর, আমরা যারা তাঁর স্বদেশবাসী এবং তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের কাছে তাঁকে তুলে ধরা ও মনে করিয়ে দেওয়া। তাঁর প্রবন্ধ ও রচনাগুলি পড়তে প্ররোচিত করা। কেননা মীর মশারফ হোসেনের "বিষাদ-সিন্ধু", রেজাউল করিম সাহেবের "বঙ্কিমচন্দ্র", নানা সুচিন্তিত বিক্ষিপ্ত রচনাবলী, কাজী নজরুলের কবিতাবলী, পণ্ডিত মুহম্মদ শহীদুল্লা সাহেবের অসংখ্য রচনাখণ্ড ও মুজাফফর আহম্মদ, আজহার উদ্দীন সাহেবের নানা ধরনের রচনা চোখে পড়েছে; সরস সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলি সাহেবও আছেন। কিন্তু সেই সব বইগুলি সব সময়ে সন্নদ্ধভাবে গেঁথে সামনে আসেনি। সে হিসাবে কাজী আব্দুল ওদুদ সাহেবই 'শাশ্বত বঙ্গে" বাঙালি জাতির (অসাম্প্রদায়িক) সাহিত্য চিন্তা, সমাজ চিন্তা, ধর্ম এবং সম্প্রদায়চিন্তা ও রাজনীতিচিন্তাকে স্পষ্ট ও আশ্চর্য ভাবে আমাদের সামনে ধরে দিয়েছেন।

চলার কথা। (শাশ্বত বঙ্গ — পৃ: ৩৫৪)

"ওঠো। জাগো, হায় ইসলাম — হায় মুসলিম — জামালউদ্দীন, স্যার সৈয়দ আমির আলি থেকে আজ পর্যন্ত অন্তহীন বক্তৃতায় উপদেশে সাহিত্যের প্রচেষ্টায়, কত কষ্টে কত সুরেই তো এ কান্না শোনা গেল। আর কত?....... প্রশ্ন এই, একটা জাতি বা সম্প্রদায়ের জাগার অর্থ কি? কিই বা সঙ্কেত?

এ প্রশ্নের উত্তর কেউ যদি বলেন জাগার অর্থ জাগা! ঘুমভাঙার অর্থ যেমন চোখ খুলে চাওয়া। ......একটি জাতির বা সম্প্রদায়ের জাগার অর্থ, তেমনি, অপর দশটি জাতি কেমন করে খেয়ে পরে বেঁচে আছে, তা দেখা আর নিজেদের জন্য সচেষ্ট হওয়া। তাহলে এই প্রশ্নের একটা উত্তর দেওয়া হল না কি?

কিন্তু উত্তরটা এত সোজাসুজি ও নিরাভরণ যে অনেকের তাতে মনের খুঁত খুঁত যেতে চায়না.........। একটা জবরদস্ত হিং টিং ছটের মত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা না হলে মন ওঠে না।

কিন্তু আসলে জাগার এই অর্থ খাদ্যান্বেষণে সচেষ্ট হওয়া। যাঁরা বলেছেন 'Man shall not live by bread alone' তাঁরা একটা কিছু বলতে চেয়েছেন নিশ্চয়ই। কিন্তু "ব্রেড" কথাটির একটা সঙ্কীর্ণ অর্থ দিয়েছেন। যা না দিলেই ভালো হত......।

ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য, রাষ্ট্র সবই তো খাদ্যান্বেষণের বিচিত্র ভঙ্গিমা......... অভীত আহারপুষ্ট মানবতার জয় যাত্রার ইতিহাস।......

অনেক সভায় ইসলামের অতীত ইতিহাসের গৌরবপূর্ণ কাহিনীর বর্ণনা শুনেছি.....। শুনে হাসি পেয়েছে। যেন বালকের মুখে যৌবনের প্রেম কাহিনীর বর্ণনা। তাতে নেশা ধরবে কেন?

"কদরে মও হয়্ শাহ বেদানিদ্ ইয়া বেদাস্ত পওহ্‌রী...." (অর্থাৎ) উৎসবের আনন্দ যে কি তা উৎসব শেষের এঁটো পাতার পরিমাণে বুঝতে পারা যায়! উৎসবের আনন্দ বুঝতে চাও? তাহলে আয়োজন কর নব উৎসবের। যে আয়োজনের যোগ্যতা আছে তার — যে হতাশাচ্ছন্ন দেউলিয়া নয় .... যে প্রসন্ন সমৃদ্ধ....।

তুমি বুদ্ধিমান, কর্মানুরত, সমাজধর্মী মানুষ হও। পূর্ণাঙ্গ মানুষের বিকাশ তোমার ভিতরে ব্যাহত না হোক...... এসবের মধ্যেই মুসলমানত্ব, হিন্দুত্ব, খৃষ্টানত্ব এসবের রূপ ফুটবে তোমারই ভিতরে।"

সংস্কৃতির কথা (শাশ্বত বঙ্গ পৃ: ৬১)

"মনে হয় মানুষ স্বভাবত পৌত্তলিক। কোনো বিশেষ প্রতিমা বিশেষ তত্ত্ব, বিশেষ আচার.....না হলে যেন তার চলে না।

তার সঙ্গে পরিবর্তনপ্রিয়তা তাই ক্রমাগত তার তত্ত্ব, আচার, প্রতিমার ধরন বদলায়...। ভারতবর্ষ চিন্তার দিক থেকে য়ুরোপের প্রায় পঞ্চাশ বছর পিছনে পড়ে আছে...।

ভারতবর্ষের একালের সাংস্কৃতিক চিন্তায়, ইতিহাসে দুজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একজন বাংলার বঙ্কিমচন্দ্র, অন্যজন পাঞ্জাবের ইকবাল।..... মানুষ বিশেষভাবে সামাজিক জীব....। সেকালের ধর্মের মত একালের সংস্কৃতির মূল কথা হওয়া চাই সামাজিক উৎকর্ষলাভ। আর যেহেতু সমাজের অর্থ, একদিকে বিশ্বমানবসমাজ অন্যদিকে বিশেষ বিশেষ দেশগত ও রাষ্ট্রগত সমাজ....।

এই দিক দিয়ে দেখলে হিন্দু সংস্কৃতি, মুসলিম সংস্কৃতি, আর্য সংস্কৃতি, দেশীয় সংস্কৃতি ইত্যাদি যে কথা দেশে উঠেছে সে সবের মূলে সূচিন্তা যে কার্যকরী হচ্ছে না তা বোঝা যায়। ....সংস্কৃতির প্রধান লক্ষ্য একটি, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উৎকর্ষ লাভ, তাতে বিচ্ছিন্নতা অগ্রগামী হতে পারে না....।"

(১৩৪৮, ব্যক্তির স্বাধীনতা পৃঃ ১৭)

"সেদিন একজন মনস্বিনী য়ুরোপীয় মহিলার (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যক্ষ এ. জি. স্টক) সঙ্গে আলাপ হচ্ছিল। তিনি বলেছিলেন "ব্যক্তি আজ একান্ত অসহায়, তার সাধুতা, দক্ষতা, বিদ্যা সবই অর্থশূন্য যতক্ষণ না সে কোনো শক্তিশালী সংঘে যোগ দিচ্ছে।"

কথাটা খুব সত্য ও চমকপ্রদও সেজন্য। সাম্প্রদায়িকতা আজ আকাশে বাতাসে। গঠন আর ধ্বংসের দুয়েরই বিপুল আয়োজন আজ মানুষের সামনে....। কিন্তু এ সমস্যা কি শুধু আজকের? অসত্য, অর্দ্ধসত্য, ধর্মতান্ত্রিক সামন্ততান্ত্রিক যুগ, কোন যুগে ব্যক্তি নগণ্য ছিল না? অবশ্য বহু অতিমানব জন্মেছিলেন। বিস্ময়কর তাঁদের প্রভাব।..... কিন্তু তা ব্যক্তির প্রভাব নয়, বিশেষ বিশেষ ভাবের প্রভাব....। তাঁদের সাধারণতঃ মানুষ ভাবা হয়নি।.....

যে যুগে অতিমানবরা সেই অতিমানবত্ব হারালেন তা অষ্টাদশ উনিশ শতকে যা এক হিসাবে ব্যক্তিস্বাধীনতারই যুগ। তাও অচিরে কলুষিত হল স্বেচ্ছাচারে ও কাঞ্চনকৌলীনো। সেই.....স্বেচ্ছাচারের প্রতিক্রিয়াই জন্ম হয়েছে একালের নির্ধনদের সামগ্রিকতা আর জাতীয় সামগ্রিকতার.....।

সেকালের সামগ্রিকতা একালের সামগ্রিকতায় একটা বড় পার্থক্য এই যে, সেকালে ধর্ম কর্মফল আদি অদৃশ্য শক্তির ভয় মানুষের ছিল। একালে আর সে ভয় তাদের নেই। ...এক কথায় মানুষ প্রকৃতির অধিকার একদিন লাভ করবে এ সাহস করে (রাখে)। যাতে খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য আর দুঃসাধ্য কাজ মনে করে না.....। কিন্তু সে যেন আনন্দের সম্পদে বঞ্চিত হচ্ছে। যিশু বলেছিলেন, "শুধু খাদ্যেই মানুষ বাঁচতে পারে না...."... একালের মানুষ যেন বলছে খাদ্যের সংস্থান করতে গিয়ে যদি আনন্দ, সখ্য, প্রেম ছাড়তে হয় তাতে সঙ্কুচিত হওয়া চলবে না।....

আর কিন্তু সেকালেও ব্যক্তির স্বাধীনতা তেমন ছিল না যখন — তখন একালেও যদি না থাকে মানুষ কেমন করে আফ্‌শোষ করবে?.....

কিন্তু মাঝখানে কিছু দিন যে ব্যক্তিস্বাধীনতার স্বাদ তারা পেয়েছিল তা তারা ভুলতে পারছে না।

অর্থাৎ যেদিক দিয়েই যাওয়া যায়, সামগ্রিকতার হাত এড়াবার উপায় নেই। খাদ্য ও অন্যান্য প্রাচুর্যের আশ্বাস সে পেয়েছে সেজন্য সামগ্রিকতার দিকে না ঝুঁকলে আর সে কি করবে!

কিন্তু "শুধু খাদ্যে মানুষ বাঁচবে না" একথাও তো অতি সত্য?.....

মহাত্মা গান্ধী যে ভাবে এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন তা বেশ কাজের।

তাঁর মতে — ব্যক্তি তার নিজের ভরণপোষণের জন্য অজটিল জীবিকার ওপর নির্ভর করবে আর বিশেষভাবে সত্যাগ্রহের উপর নির্ভর করবে ব্যক্তিস্বাধীনতা হারাবার সঙ্কটে.....।

সামগ্রিকতা এ যুগে চাইই লোকরক্ষণ লোকপালনের জন্য। কিন্তু তাতে ব্যক্তিস্বাধীনতার সমস্যার সমাধান হয় না। অবশ্য এখন স্বাধীনতা ব্যক্তির — সবাই দাবী করতে পারবে না। যারা করবে এটি তারা ভোগ করবে আত্মোৎসর্গের মত মহৎ মূলাদানের সংকল্পে।

সেই মনস্বিনীকে এই কথা বলেছিলাম। তিনি জোর দিয়েছিলেন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের উপরে.....।

কিন্তু ধ্বংসের আয়োজন এযুগে মানুষ যেমন বিরাটভাবে করেছে, তাতে মানবসভ্যতার বাঁচা কঠিন.....।

বাঁচার একমাত্র উপায় অহিংস সত্যাগ্রহই মনে হয়....। কেন না যে ভীত নয়, সে মরেও বেঁচে থাকে। যেমন সক্রেটিস্ — বিষপায়ী সক্রেটিস্ বেঁচে আছেন।

তাঁদের বাদ দিয়ে মানব সভ্যতা অর্থশূন্য।

সার্থক সভ্যতা তা-ই যা বস্তুতে আর মানস চেতনায় বিশেষভাবে সমৃদ্ধ।"

(১৩৪৮) মহৎ সংবাদ।

"আজ বেতার ঘোষণা করছিল পূর্ববঙ্গে অনেক জায়গায় তরুণ মুসলিম দেশরক্ষীদল তাঁদের অঞ্চলের হিন্দুদের দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জনে রক্ষীরূপে কাজ করেছেন।....

এমন মহৎ সংবাদ জীবনে খুব কমই শুনেছি। আমার সম্প্রদায়

সম্পর্কে এই প্রথম শুনলাম।.....জয় হোক তোমাদের, হে বিবেচক তরুণদল।

আমি সাহিত্যিক। থাকি জনতা থেকে দূরে। কিন্তু তাকিয়ে থাকি জনতার দিকে, কেননা মানুষকে ভালোবাসা আমার ধর্ম। .....দেখছি জনতা খানিকটা দিশা পেয়েছে। দেখেছে দেশের সঙ্কটকালে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব তাদের। যারা অকুতোভয় অপাপবিদ্ধ।...

হ্যাঁ চমৎকার (শুভ) সূচনা হয়েছে।

হে আমার তরুণ বন্ধুগণ, বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, সম্পদ সবের চাইতেও বেশী মূল্য চরিত্রের। আর চরিত্রের ভিত্তি ন্যায় বিচার, ইন্‌সাফ।

...ইন্‌সাফই ইসলাম।

আজকের শুভদিনে গ্রহণ করো কোরআন হাদিসের ও উপনিষদের বাণীর উপহার।

"পাল্লা ঠিক রাখো। যখন কথা বলো হক কথা বলো, আত্মীয়ের বিরুদ্ধে হলেও"।

"সে মুসলমান নয়, সে মুসলমান নয়, মুসলমান নয় — যার আঘাত থেকে প্রতিবেশী নিরাপদ নয়"।

"বিশ্বজাতি আল্লার পরিবার। সেই আল্লার কাছে ভালো যে তাঁর পরিবারের প্রতি ভালো...." (কোরআন শরীফ)

"কারো ধনে লোভ কোরো না"।

"তা নিয়ে আমি কি করব যা আমাকে অমৃতত্ব না দেবে" (উপনিষদ)।

বাংলার খ্যাতি আছে সে আগে চলে....।

তোমাদের মহৎ জয় লাভ হোক।"

২৯ পৃঃ (শাঃ বঙ্গ) (১৯৪৭) (শাঃ বঃ) পৃঃ ৩১

ইসলামে রাষ্ট্রের ভিত্তি

দেশ বিভক্ত হল। ভারতের পূর্বে ও পশ্চিমে মুসলমানদের স্বাধীন ভূখণ্ড লাভ হল।

খবর কাগজে দেখা যাচ্ছে, পূর্ব পশ্চিম দু'ভাগেই কথা উঠেছে এই নূতন রাষ্ট্র 'শরীয়ৎ' অর্থাৎ কোরআন হাদিস অনুসারে শাসিত হওয়া উচিত। কিন্তু এ যুগে এই সব পুনঃপ্রবর্তনায় বাধাও কম নেই। প্রথমতঃ শরীয়তের ও একালের বিধি বিধানে পার্থক্য। দ্বিতীয়তঃ এই নূতন রাষ্ট্রে অমুসলিম জনসংখ্যাও কম নয়। তারা ঐ নীতি অনুসারে শাসিত হতে রাজী হবে কিনা?

প্রথম শ্রেণীর কথাই ভাবা যাক। শরীয়তে আছে কোনো কোনো অপরাধীর হাত পা কেটে ফেলার এবং পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলার বিধান। নূতন রাষ্ট্রে সে সবের পুনঃপ্রবর্তন হবে?

বাস্তবিক মুসলমানের ধর্মগত সমস্যা যত সহজ ভাবা হয় তা তত সহজ নয়। মুসলমানদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ হল 'কোরআন'। তার নিচে হজরতের জীবন ও বাণী 'হাদিসের' স্থান।

কোরআন বলেন 'তিনি যাকে জ্ঞান দেন, সে মহাসম্পদ পায় — জ্ঞানী ভিন্ন আর কেউ বিচার করে দেখে না'।

ধর্মের মূল কথা মনুষ্যত্বসাধন, এই ব্যাপারটি না বুঝে ধর্মের ব্যাখ্যা বা প্রয়োগ করতে গেলে নিতান্ত কাঁচা বনিয়াদের ওপর ইমারত তোলার চেষ্টা হয়, সে বিষয়ে একালের মুসলমান সমাজ শরীয়তপন্থীদের মুশিয়ার হওয়ার প্রয়োজন করছে।

কোরআনের একটি বাণীর মর্ম এই, আল্লা যদি চাইতেন তাহলে সবাইকে এক জাতীয় লোক করতেন.....। কিন্তু তিনি কল্যাণের পথে মানুষ পরস্পরের প্রতিযোগিতা করুক এই চান.....।

এ কালের মহাপ্রাণ স্যার সৈয়দ ইসলাম সম্বন্ধে বলেছেন "যা সত্য নয়, তা ইসলাম নয়" অর্থাৎ "যা সার্থক নয় তা ধর্ম বা আদর্শ হবার যোগ্য নয়....।" কিন্তু ইসলামের রাষ্ট্রের ভিত্তি যিনি জানেন, তিনি জানেন মুসলমান হওয়ার অর্থ 'সত্য ও কল্যাণের বন্ধু হওয়া'। 'জগতের বন্ধু হওয়া....'। 'মানব হিত'। 'কাণ্ডজ্ঞান' (কমনসেন্স)।"

১৯৪৮ (শাঃ বঃ) পৃঃ ১৫৪

একটি ঐতিহাসিক চরিত্র। সুলতান মামুদ (গজনীর মামুদ সোমনাথ ধ্বংসকারী) এই চরিত্রটি যেমন অসাধারণ তেমনি জটিলভাবে আলোচনা করেছেন লেখক। (পাঠকের মনে অনেক প্রশ্ন ওঠে: তিনি তাঁর প্রশংসা করতে চেয়েছেন, তাঁর কাজের সমর্থন করেন? অথবা তাঁর স্বধর্মীদের অন্য ধর্মীয় দেবস্থান ধ্বংস লুণ্ঠন কাজের সমর্থন করেন না?) লেখকের লেখার প্রথম লাইনকটি হল—

"সুলতান মামুদ ইতিহাসের একজন অতি পরিচিত পুরুষ। কিন্তু তাঁর পরিচয় একজন অসাধারণ যোদ্ধা ও লুণ্ঠনকারী রূপে। সেই সব ধনরত্নের জন্য মৃত্যুর পরে তার বিদেহ আত্মার লোলুপতা ও শোক কবি সাদী নিপুণভাবে রূপায়িত করেছেন।" প্রকৃতপক্ষে তিনি মুসলিম ইতিহাসে একটি অতি উচ্চ স্থান অধিকার করে আছেন.....।

"তাঁর এই সব অভিযান যে ধর্মযুদ্ধ তাকে তিনি এবং তাঁর সমসাময়িক মুসলমান সাধারণও একে ধর্মযুদ্ধই জ্ঞান করেন।

"ধন লোভ তাঁতে ছিল নিঃসন্দেহ কিন্তু সুবিচারক হবার প্রয়াসও ছিল তাঁর অনন্য। তাঁর এক প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে এক প্রজার সুন্দরী স্ত্রীকে আত্মসাৎ করার জন্য তাকে তিনি বধ করেন।

"জাতির সততা ও ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে তার দোষেই বেশী, গুণে তেমন নয়। যেমন হিন্দুর প্রতীকপ্রিয়তা — শ্বেত জাতির অশ্বেতজাতিবিদ্বেষ — মুসলমানদের প্রতীক

বিদ্বেষ......।

"সুলতান মামুদ আর ঐ মনোভাবাপন্ন মুসলমানেরা যে ইসলামের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন নি, তা বোঝা যায়: কোরআনের নানা বাণী থেকে— "ধর্মে বলপ্রয়োগ নিষিদ্ধ" (পৃ: ২৫৬ কোরআন শরীফ) "আল্লা ছাড়া যারা অন্যান্য ধরনে উপসনা করে তাদের নিন্দা করিওনা, পাছে তারা অজ্ঞানতাবশতঃ আল্লাকেই গালি দেয়।" (৬ : ১০৯ কোঃ শঃ) "যারা ভালো (কাজের) দ্বারা মন্দ বিদূরিত করে, তারা সুখকর আশ্রয় লাভ করে" (১৩ : ২২ কোঃ: শঃ)।

"সুলতান মামুদের কালেও দেখা যায় তাঁর "ধর্মযুদ্ধ" ও "কাফের পীড়ন" সম্পর্কে জ্ঞানশ্রেষ্ঠ আলবীরুনীর ক্ষোভ। স্বধর্মে এই মনস্বীর সুগভীর অনুরাগ সত্ত্বেও তাতে অন্ধতা বা মত্ততা ছিল না—, ছিল অনির্বাণ সত্য ও জগৎ প্রীতি।

"কিন্তু প্রতিমাধ্বংসী বীর মামুদ জনচিত্তে যে আসন অধিকার করে আছেন সহজে তা হতশ্রী হবার নয়....।"

(লেখকের) এখন প্রশ্ন কোনটি আজ মুসলিম সমাজের গতিপথ, মামুদের পথ অথবা আলবীরুনীর পথ। দু'পক্ষের উপরই লেখকের মানসিক দ্বিধা স্পষ্ট। নিরপেক্ষভাবে মনে জাগে ধর্মীয় 'প্রতীক ধ্বংস'কে যদিও বীর্য্য শৌর্য্য তাঁরা ভাবেন, ধন রত্ন লুণ্ঠন তো 'ধর্ম' হতে পারে না। যেমন যুদ্ধে পরস্পরের পুরুষ যোদ্ধাদের হত্যালীলাকে বীরত্ব বলা যেতে পারে, তাদের নারীর দেহ লাঞ্ছনা'কে শৌর্য্য বীর্য্য বলা অসম্ভব। কোনো বীর জাতিই তা সমর্থন করেন না।

(প্রসঙ্গত একটি স্পষ্ট সত্য স্বীকার করতে হয়। তাহলে মুসলমান শাসনের অবসানে ভারতের শাসনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পরাজিত হিন্দু-মুসলমান প্রজা সমাজের পুণ্যস্থান ধর্মসংস্থার কথা। এ ক্ষেত্রে কোনো "ভিন্ন ধর্মীয় দেবস্থান ধ্বংস" করা হয়নি। কোনো জায়গায় পুণ্য ও পুরাকীর্ত্তি ধ্বংসিত ও লুণ্ঠিত বিকৃত করা হয়নি। অনেক স্থলে হয়ত মুখে 'প্রতীক উপাসনার' (মিশনারী কণ্ঠে) নিন্দা করা হয়েছে, কিন্তু প্রতিমা বা কীর্ত্তি ধ্বংস করা হয়নি। বহুনিন্দিত লর্ড কার্জনের চেষ্টায় বরং সযত্নে ও শ্রদ্ধায় তাদের রক্ষা করার ব্যবস্থা হয়েছে। নইলে উত্তর ভারতের 'মোগল স্থাপত্য' আর 'দক্ষিণ ভারতের মন্দির স্থাপত্য' হয়তো কিছুই রক্ষা পেত না। এ ক্ষেত্রে লেখকেরই ২৯ পৃষ্ঠায় একটি "মহৎ সংবাদের" স্বসমাজের প্রতি মন্তব্য স্মরণীয়। "চমৎকার শুভ সূচনা।")

শা: ব: পৃ: ৩৯৪, সম্মোহিত মুসলমান

"হজরৎ মোহম্মদ যে একজন মহাপুরুষ — অর্থাৎ সত্য তিনি শুধু কথায় প্রচার করেননি, তা তাঁর সমগ্র জীবনের ভিতরে একটি আশ্চর্য্য দৃঢ় রূপ লাভ করেছিল, তা নিয়ে তর্ক বিচারের কাল বোধ হয় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

মহাপুরুষদের জীবনে একটা কেমন ঋজুতা প্রত্যক্ষ করি.....। (কিন্তু) বহুভঙ্গিমতা বা মানবমনের জটিলতা মহাপুরুষের জীবনে নিরাকৃত হয়ে যায় না।

হজরৎ মহম্মদের যাঁরা অভক্ত তাঁরা তাঁর এই জীবনের জটিলতায় বিড়ম্বিত হয়েছেন — দুঃখের বিষয়। কিন্তু তার চেয়ে শোচনীয় ব্যাপার তাঁর ভক্তদের মধ্যেই ঘটেছে। তাতে এই অতি বড় মহৎ সত্যটি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে, যে জগতের অনন্ত কোটি মানুষের মধ্যে হজরৎও একজন মানুষ। শক্তি মাহাত্ম্যে তিনি সুপ্রকট। কিন্তু সেটাই তাঁর পক্ষে চরম কথা নয়.....। বাস্তবিক মহাপুরুষ যে সর্বজ্ঞ নন। তিনি জীবন সংগ্রামে একটি আলোক স্তম্ভ। একজন বন্ধু মাত্র। সর্বময় প্রভু নন। ......তাঁর কথা ও চিন্তার ধারা চিরকালের জন্য মানুষের পথকে নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছে, এ কথা বিশ্বাস করলে মানুষরূপে তাঁর সাধনাকে চরমভাবে অপমান করা হয়— কেন না চির জাগ্রত, চির বিচিত্র, বিশ্বজগতের, রন্ধ্রে রন্ধ্রে দেশে দেশে যুগে যুগে (বিশ্বনিয়ন্তা) আল্লার শুভ মহিমা প্রকটিত। হজরতের অনুবর্ত্তী ভক্তেরা সেই প্রাণপ্রদ কথা বিস্মৃত হয়ে অন্যান্য ছোটখাটো প্রতিমার কাছে নতজানু হওয়ায় দায় থেকে কিছু নিষ্কৃতি পেলেও "প্রেরিতত্ব রূপ" একটি (বিরাট) প্রকাণ্ড প্রতিমায় নতশির হয়ে জীবনপাত করছেন, তা আধ্যাত্মিকতা, নৈতিকতা, সাংসারিকতা, সব দিক থেকেই শোচনীয়।

অথচ সেই মানুষ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম পর্য্যন্ত গ্রহণ করেননি। আধুনিক মুসলমানের এই অবস্থাকে আমি বলতে চাই 'সম্মোহিত'। এ দশাকে পৌত্তলিকতার চরম দশাও বলা যেতে পারে। তার কাছে একমাত্র সত্য শাস্ত্রবচন। হজরৎ ওমর, ইবনে জুবেরের মত বীরদের — শেখ সাদী ওমর খৈয়ামের মত কবি মনীষীদের — গাজ্জালি রূমীর মত সাধকদের জীবনের অন্তঃস্থলে দৃষ্টিপাত করলে একথা আলোর মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে।.....

ইসলামের ইতিহাস বহুল পরিমাণে এক ব্যর্থতার ইতিহাস। হজরতের সংযমের সাধনা তাঁর মৃত্যুর অল্পদিন পরেই আরব দেশের আদিম উচ্ছৃঙ্খলতা ও পারস্যের বিলাসমত্ততার আবর্ত্তে পড়েছিল......। হয়ত সেই জন্যই মুসলিম ইতিহাসে সব পর্য্যায়েই আমাদের চোখে পড়ে কখনো চরম উচ্ছৃঙ্খলতা আর কখনো অন্ধ অনুবর্ত্তিতার বাড়াবাড়ি......।

তবু বিশ্ববরেণ্য পুণ্যশ্লোক শেখ সাদী হজরৎ মহম্মদের "তৌহীদ" (একেশ্বরতত্ত্ব) ও বিশ্ব কল্যাণের সাধনাকে সবল মনুষ্যত্ব ও উদার বিচার-বুদ্ধির পথে গ্রহণ করেছেন......। যিনি বুদ্ধি বিচার প্রভৃতি মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্বল বিসর্জন দিয়ে মহাপুরুষের পায়ে গড় হয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে নয় — প্রাণ মস্তিষ্ক দিয়ে সেই তত্ত্বের সন্ধানে যে লাভ নব মুসলিমের হবে মুসলমা শ্রেষ্ঠ শেখ সাদী তাঁদের অন্যতম (নির্দেশক)।

তাঁর একটি প্রসিদ্ধ বাণী হল, আরবীতে — 'সৃষ্টির সেবা ভিন্ন ধর্ম আর কিছু নয়। 'তসবি' (মালা) 'জায়নামাজ' আলখাল্লায় ধর্ম নেই'।

এই বাণীটি রাজা রামমোহন রায়ের অতি প্রিয় ছিল।

.......জগতের জন্য ইসলামের প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়নি। কোনো সাধনা উত্তরাধিকারসূত্রে, বংশসূত্রে, শিষ্যত্বসূত্রেও নির্ণীত হয় না, হয় সাধনাসূত্রেই। শতশত বৎসরের বিধি-নিষেধের তুচ্ছ তালিকা থেকে চোখ উঠিয়ে আল্লাহ্র এই জীবন্ত দুঃখসুখকে সমবেদনায় দেখা শুধু 'আলেম' বলে যে কৃপার পাত্র নিজের পরিচয় দেয় তার দ্বারা সম্ভব নয়....।

মুক্ত বিচার বুদ্ধির সঙ্গে ইসলামের বিরোধ নেই। কিন্তু 'চেরাগের নীচেই অন্ধকার'।

একটি বড় সাধনায় সত্যের পূর্ণ পরিস্ফুটনের জন্য তেরশত বছর খুব দীর্ঘ কাল নয়। একটি বড় সম্প্রদায় হিসাবে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসাবে বিপুল ভবিষ্যৎ তাঁদের সামনে....।"

শা: ব: পৃ: ১৮৮ ইকবাল

ইকবালকে লেখক 'কবি' বলেই প্রথম স্থান দিয়েছেন। বলেন—

"ইকবাল দুর্বল চিন্তা নেতা। সমসাময়িক ভারতীয় জীবন-চিন্তায় বিক্ষুব্ধ।....

সেই জন্য কবি ইকবালের সঙ্গে তুলনায় চিন্তা নেতা ইকবাল আমার কাছে কিছু স্বল্পমূল্য......। তাঁর চিন্তাধারার অপব্যাখ্যা হতে পারে। এমন অপব্যাখ্যা বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারারও হয়েছে......।

শক্তিবাদ ও শাক্তবাদ দুই থেকেই কুফল ফলে। রবীন্দ্রনাথের 'রিলিজন অব ম্যান' স্মরণীয়......"।

(শাশ্বত বঙ্গ) ''বঙ্কিমচন্দ্র''।

"হিন্দুত্বের আড়ম্বর বঙ্কিম সাহিত্যে যতই থাকুক, তাঁর সত্যকারের প্রতিপাদ্য হিন্দুত্ব নয় — মানবতা। একথা আরো স্পষ্ট করে বোঝা যায় তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের কথা ভাবলে।.....সেই সঙ্গে আরো বুঝতে হয় বঙ্কিমচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর সন্তান; মোহ আর মোহমুক্তি এই দুইয়ের ধ্বস্তাধ্বস্তি সে যুগে উৎকট আকার ধারণ করেছিল।....."

(বঙ্কিমচন্দ্র, ঐ পৃষ্ঠা: ২৪৩)

(বঙ্কিম সাহিত্যে) "এই অসহিষ্ণুতা ও সত্য দৃষ্টি একই সঙ্গে কেন প্রবল হল বলা শক্ত। এই শক্তিশালী লেখকের অসহিষ্ণুতা সম্বন্ধে আমাদের একটি বিশেষ কথা মনে পড়ছে। ভারতবাসী বারবার পরপদদলিত হয়েছে তার জন্য কম যন্ত্রণা ভোগ করেনি। নিজেদের মধ্যেই তা পরিপাক হয়েছে বেশী। যদিও পরিপাক শব্দটি ঠিক সঙ্গত হল না। ....মনীষী আলবীরুনী বলেছেন "মামুদের আঘাতে এদেশের শ্রী সম্পদ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে, হিন্দুর। হিন্দুরা — ধূলিকণার মত বিক্ষিপ্ত হয়েছে দিগ্‌বিদিকে। এই সব চূর্ণবিচূর্ণ কণার অন্তরে মুসলিম বিদ্বেষ নিদারুণ।" বিজেতা মুসলিমের দৃষ্টির সামনে বিজিত হিন্দুরা অনেকখানি অস্বস্তি অসম্মান অনুভব করেছিলেন। স্বাভাবিক।

পর্যুদস্ত ভারতবাসীর যুগ যুগ সঞ্চিত ব্যথা যদি বঙ্কিমচন্দ্রের নেতৃত্বে (প্রতিবাদ) অভিযান ঘোষণা করে থাকে এক হিসাবে তা খুব স্বাভাবিক কাজই হয়েছে....।"

'দেশের জাগরণ' (শাশ্বত বঙ্গ) পৃ: ১৭৭

"মুসলমানের গত কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস ক্ষয়িষ্ণুতার ইতিহাস। তাই ওহাবী প্রতিক্রিয়া যে বর্তমানে তার প্রধান পরিচয়স্থল হবে সে কথা বোঝা যায়। কিন্তু একালের হিন্দুর ইতিহাস তার জাগরণ চেষ্টার ইতিহাস, তা-ই তার সত্যকার পরিচয় অর্থাৎ তার শক্তি ও দুর্বলতা......। আর তার এই জাগরণ চেষ্টা হিন্দুতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, দেশের অন্যান্য সম্প্রদায়েও সংক্রামিত হয়েছে। দেশ যে বিরোধ ব্যাধিতে ভুগছে তা থেকে উদ্ধার পাবার মত জীবনীশক্তি দেশের লোকজনের মধ্যে আছে কিনা তারও সন্ধান এই বিচিত্র জাগরণের চেষ্টার মধ্যেই পাওয়া সম্ভব।"

'বাংলা সাহিত্যে জাতীয়তার আদর্শ' (ঐ) পৃ: ২৩৬-২৪২

"এ কালের জাতীয় জীবনের সূচনা রামমোহন থেকে এ সম্বন্ধে আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি। কিন্তু একালে বাংলা সাহিত্যে জাতীয় জীবনের সমালোচনা আরম্ভ বোধহয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় থেকেই.....। তাঁর এই হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে চিন্তা এই কালের মনীষীদের সাধারণ লক্ষণ.....। অবশ্য আলবীরুনী থেকে রোঁমা রোলাঁ পর্য্যন্ত অনেক প্রথিতযশঃ অহিন্দুও হিন্দু সাধনার উচ্চ প্রশংসাও করে গেছেন......। .....আর হিন্দুর মত একটি সুপ্রাচীন সভ্যজাতির ইতিহাসে গৌরবজনক অনেক কিছু যে থাকবে, এ যেমন স্বাভাবিক, তেমনি সঙ্গত। কিন্তু তবু এ নিয়ে একালের চিন্তানায়কদের যে একটি আত্মপ্রশংসার রূপ ফুটে উঠেছে— (এবং) ও যে ফল ফলিয়েছে তা বুঝতে চেষ্টা করা একালের জিজ্ঞাসুদের নানা কারণেই কর্ত্তব্য.........।

আত্মপ্রশংসা মাত্রেই দোষার্হ নয়......। গ্রীক, মুসলমান, ইংরেজ, জার্মান, ফরাসী এদের সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের যে পরিচয়টুকু ঘটে তাতে আত্মগৌরববোধ এদের কারো কম নয়। ......জগতের বুকে দৃঢ় পদে দাঁড়াবার ও বিচরণ করবার ক্ষমতা থেকে উৎসারিত হয় যে একটি সহজ আত্মগৌরববোধ — সেই স্বাভাবিক আত্মপ্রশংসা একালের সাহিত্যে (বাংলা) দুর্লভ। (যেন) এঁদের আত্মপ্রশংসার মূলে রয়েছে তার্কিকতা...... এবং

প্রতিপক্ষের সামনে নিজেদের বজায় রাখার একটা চেষ্টা।.....

সত্যকার জাতীয় জীবনের উদ্দেশ্যে দুটি কর্ম ও চিন্তাধারার কথা সহজেই মনে পড়ে — প্রথমটি হিন্দু মুসলমান সমস্যার সমাধানচেষ্টা — দ্বিতীয়টি জাতীয় জীবন সুনিশ্চিত অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করা।.....

কিন্তু অর্থনৈতিক সমস্যার সুমীমাংসাতো সহজসাধ্য নয়.....। এর ভিত্তির পত্তন হতে পারে যদি শাসক ও শাসিত সকলেরই মনে এই চিন্তা প্রবল হয়, দেশে অন্নহীন ও কর্মহীন কেউ থাকবে না....। ঊনবিংশ শতকের বাংলায় সমাজ কল্যাণ চিন্তায় দেশের সমাজ ও রাষ্ট্রকে বিরুদ্ধ শক্তি কল্পনা করা হয়েছিল.....তাই সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠা ছিল সেকালে শ্রেষ্ঠকর্ম। সূক্ষ্মদৃষ্টি রবীন্দ্রনাথও দেশের রাজশক্তিকে বিরুদ্ধ শক্তিই ভেবেছেন.....।

অবশ্য অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি জাতীয় জীবনের উৎকর্ষের জন্য যথেষ্ট নয়। দেশের প্রাসাচ্ছাদনের জন্য যে — (দেশ) — সমস্ত দেশ দায়ী — এই চিন্তার প্রতি আপামর সকলের যে শ্রদ্ধা ও কর্তব্যবোধ আছে তাই আমাদের সাহায্য করবে আমাদের সমস্ত চেষ্টায় সত্যাশ্রয়ী হতে। আর প্রাচীনত্বের অভিমান নয় — সত্যাশ্রয়ের প্রয়োজনই আমাদের বেশী।"

কিন্তু আর উদ্ধৃতির দরকার নেই। লেখকের চিন্তা আশা স্বসমাজের ব্যর্থতায় বেদনা সর্বসমাজের কল্যাণ চিন্তায় ভরা গেটে, রবীন্দ্রনাথ, রামমোহন, আলবেরুণী, ইমাম, গাজ্জালি (এর নাম ও কর্মের সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই) আরো কত চিন্তানেতার স্বপ্নসাধনার আলোচনা তাঁর লেখায় ছড়িয়ে আছে তা যেমন অমূল্য ও অসামান্যও তেমনি।

আমার কথা শেষ করার সময় এলো। লেখকের পরিচয় যে তাতে সব দিতে পেরেছি তা নয়। তবু এতে অনেকের মনে হয়ত এই লেখকের লেখার ও চিন্তার পরিচয় নিতে ইচ্ছে হবে — এইটেই আমার আশা ও লেখার সার্থকতা লাভ।

চমৎকার একটি আখ্যান 'পণ্ডিত সাহেব' দিতে পারলাম না। দিলে সবটাই দিতে হয়।

আর একটি উদ্ধৃতি দিই — আশ্চর্য এটি — প্রায় একই ভাষায় রবীন্দ্রনাথের 'কালান্তরে' পাচ্ছি।

কাজী আবদুল ওদুদও বলেছেন—

"আচারে হিন্দু অনুদার হলেও অপরের ধর্মের প্রতি চিরদিন সে শ্রদ্ধাবান। কিন্তু আচারে যথেষ্ট উদার হলেও ধর্মমতে মুসলমান অনেক বেশি গোড়া। বিধর্মীর ভাষা সম্বন্ধে কৌতূহলী হওয়া তাঁর শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাইরে"। ("বাংলার জাগরণ")

রবীন্দ্রনাথও এই এক কথাই বলেছেন তাঁর নিজের ভাষায়।

কাজী সাহেব বলেছেন আবার অন্যত্র :

"প্রাচীন ভারত বা প্রাচীন ইসলামের চেয়ে আমি বর্তমান ইয়োরোপকে শ্রদ্ধা করি। তবু তাকে আমাদের অনুকরণ করতে হবে একথা বলিনা.....। মানুষ বিচার বুদ্ধির পথে চললে কত বড় হতে পারে ইয়োরোপের এই সাধনাই বর্তমানে সূচিত হয়েছে।" ("জ্ঞান ও প্রেম" পৃ: ২৫৭ শা: ব:)

"শাশ্বত বঙ্গের" মোট কথা হল মুসলমানের অনগ্রসরতা, দুর্বলতা, নানাবিধ ব্যর্থতার দিকদর্শন। আর সমগ্রভাবে ভিন্ন দেশ বিদেশ ভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে তার ঘাত সংঘাত প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিশ্বাস অবিশ্বাস প্রীত অপ্রীতিরও দিকনির্ণয়।

বইখানির ভূমিকা দু'কথায় যা বলেছেন তা-ই হচ্ছে তাঁর সুস্থ চিন্তাময় প্রবন্ধসম্ভারের সার কথা :

"বুদ্ধির মুক্তি ও ব্যাপক মানবহিত।"

"আজ মুষ্টিমেয়ের বুকে অনির্বাণ থাকুক।"

"তাইই মানুষের পথ.....সত্যাশ্রয়ী কল্যাণবাহী চিরন্তন ধর্ম। আর সব আপদ্ধর্ম। অন্য কথায় বিপথ"। এছাড়া লেখকের সেই একটা প্রিয় উক্তি আরো দু'একবার পেয়েছি, "ইতিহাস এখনো শেষ হয়ে যায়নি।"

তাঁর রচনার পাঠক পাঠিকা অবশ্যই আছেন কিছু — তাঁর সম্প্রদায়ে এবং অন্য সম্প্রদায়েও নিশ্চয়ই ; সেই সব বাঙালিকেই আমাদের অনুরোধ, পারেন যদি তাঁরা তাঁর অনুবাদিত দুখণ্ড "কোরআন শরীফ", "হজরৎ জীবনী" দুখণ্ড আর এই "শাশ্বত বঙ্গ" খানি যেন নেড়ে চেড়ে পড়েন। মন বিভ্রান্ত হলে তাতে ধর্ম ও চিন্তার পথ ও পাথেয়র বহু নির্দেশ ইঙ্গিত খুঁজে পাবেন।

যেমন "মহাপুরুষের মত মানুষের আর কেহ বন্ধু নাই—" "মহাপুরুষের দানের ক্ষমতা যেমন সামান্য নয় তেমনি সেটি

গ্রহণের ক্ষমতাও সাধারণ নয়। তপস্যা দ্বারাই তপস্যার দান গ্রহণ সহজ হয়।"

"গুরুর সত্যকারের শিষ্যত্ব এইখানে.....।"

(ফতেহা-ই-দোয়াজ দাহাম। পৃ: ৩৪১ শা: ব:, হজরতের আবির্ভাব ও তিরোভাব দিনের প্রার্থনা।)

"মানুষ অপ্রেম ও চিন্তার আবিলতা থেকে রক্ষা পাক্।"

(ভূমিকা)

রচনাকাল - ২৮.৬.৭২

বিস্মৃত-মনীষী মোহাম্মদ লুৎফর রহমান

ইসরাইল খান

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কথাটা পুরোপুরি সঠিক না হলেও পশ্চিমবাংলার সাহিত্য-সমাজে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান (১৮৮৯-১৯৩৬) যে এক বিস্মৃত-নাম তাতে সন্দেহ নেই। প্রচণ্ড ধাক্কা খেতে হয় বাংলা-সাহিত্যের পীঠস্থান কলকাতার গবেষণা কেন্দ্রগুলোর পুরোধারাও কাজী নজরুলের সমকালীন বাংলা সাহিত্যের মহান লেখক মোহাম্মদ লুৎফর রহমান সম্পর্কে কিছুই জানেন না। গ্রন্থাগারগুলোতেও তাঁর কোনও বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায় না। [বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারে 'সরলা' (উপন্যাস, ১৩২৫)-র একটি কপি আছে মাত্র] কৌতূহলী হয়ে জানতে পেলাম, পশ্চিম বাংলার মুসলিম-পণ্ডিত, কবি-সাহিত্যিকেরাও কাজী নজরুল ইসলাম এবং 'শিখা' গোষ্ঠীর ('মুসলিম সাহিত্য সমাজ') প্রধান চিন্তক কাজী আবদুল ওদুদ আর উনিশ শতকের মীর মশার্‌রফ হোসেন এবং ভক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ছাড়া মোজাম্মেল হক, কাজী ইমদাদুল হক, বেগম রোকেয়া, মোহাম্মদ এযাকুব আলী চৌধুরী, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী এমনকি বিশশতকের প্রধান চিন্তাবিদ মনীষী আবুল হুসেন, আবুল ফজল, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, কাজী মোতাহার হোসেন, মুহম্মদ এনামুল হক প্রমুখের খবরও প্রায় বিস্মৃত কিংবা অজানা। অথচ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির গবেষণা (তথা গুরুগম্ভীর চর্চা) সেখানে রীতিমত হৃদ্দম চলছে!

বাংলা ভাষায় লিখিত সাহিত্যের ইতিহাসে মৌলিক চিন্তার জন্য মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের উচ্চ আসন নির্ধারিত হয়নি, কিন্তু তিনি উচ্চ শ্রেণীর 'সাহিত্যিক' ছিলেন। বাংলা ভাষাভাষী সাহিত্যিকদের মধ্যে যে মুষ্টিমেয় সংখ্যক লেখক দুর্লভ নৈতিক-সচেতনতার অধিকারী ছিলেন এবং নৈতিক দিক থেকে বাঙালি জাতিকে উচ্চ শ্রেণীর 'মানুষ' হিসেবে গড়ে তুলবার উদ্দেশ্যে সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন— মোহাম্মদ লুৎফর ছিলেন তাঁদের মধ্যেও শীর্ষস্থানীয়। অসহনীয় দারিদ্র্য ও প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করে 'স্বাধীন মতের উপাসক' রূপে তিনি জীবনব্যাপী সাহিত্য-সাধনা করে বাঙালি জাতিকে জীবনপ্রদ অনেক মূল্যবান কথা শুনিয়ে গেছেন। কিন্তু সেগুলো ততটা মধুর ছিলনা, অনেক কটু কথাও তিনি বলেছেন। সে জন্যই কি আমাদের সমাজ তাঁকে এরূপ অবহেলা দেখিয়ে চলেছে? এক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা আছে ইতিহাস গ্রন্থগুলোর। শুদ্ধত্বের কারণে প্রকৃত মানবতাবাদী মহান মনীষী, সাহিত্যিক, দেশ ও স্বজাতিপ্রেমিক সাধক-চিন্তক লুৎফর রহমানকে আজ বাঙালি জাতি ভুলতে বসেছে। কিন্তু তাঁকে ভোলা জাতির জন্যই অকল্যাণকর। কারণ যেসমস্ত লেখকের মৌলিক, আন্তরিক স্বদেশ ইতৈষণার অনুভবে এবং মানবের উদ্দেশ্যে উচ্চকিত বাণীতে জাতি আজ নতুন প্রাণ ও নতুন চেতনা লাভ করতে পারে অন্তত বর্তমানের হিংসাত্মক সংঘর্ষে লিপ্ত, পারস্পরিক সম্প্রীতিশূন্য জাতির 'বিবেক' ও 'চারিত্র' গঠনে এবং স্বজাতি ও স্বদেশপ্রেমিক 'নাগরিক মন' গড়ে তুলতে যাঁদের রচনাবলী ধন্বন্তরী ফল দিতে পারে — তিনি তাঁদেরই অন্যতম।

বিস্মৃত এই মনীষী, সাহিত্য-সাধক, মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ১৮৮৯ সনে মশোর জেলার মাগুরা (বর্তমানে জেলা) অঞ্চলের পারনান্দুয়ালী (মাতুলালয়) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জোতদার এবং বৃটিশ সরকারের রেলওয়ে বিভাগের কর্মচারী (স্টেশন মাস্টার) ছিলেন। মৌলভী মঈনউদ্দীন আহমদ পুত্র লুৎফর রহমানকে স্বগ্রাম হাজীপুর মাইনর স্কুলে ভর্তি করান। এখানে এবং পরে মাগুরা উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় এবং হুগলি উচ্চ বিদ্যালয়ে লুৎফর রহমান পাঠাভ্যাস করেন। এন্ট্রান্স পাশ করবার পরে তিনি হুগলি কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। তবে পাঠক্রমের বাইরের পড়াশুনায় এবং সাহিত্যসাধনায় মেতে উচ্চশিক্ষা তিনি গ্রহণ করতে পারেননি। কিন্তু স্বশিক্ষিত এই মনীষী রীতিমত পাশ্চাত্য-দর্শন ও সাহিত্যের অনুরাগী হয়ে ওঠেন। তাঁর সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে ইউরোপীয় রেঁনেসার ফসল, মানবতাবাদ ও মুক্তির প্রাধান্য। এফ. এ. পড়াকালীন সময়েই তিনি পত্র-পত্রিকায় লিখতে আরম্ভ করে অল্প সময়ের মধ্যেই সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

বলাবাহুল্য, ইংরেজ সরকারের কর্মচারী পিতা মঈনউদ্দীনও এন্ট্রান্স পাশ ছিলেন এবং ভাল ইংরেজি জানতেন। পুত্রদেরও তিনি ইংরেজি শিখিয়েছিলেন। ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি উৎসাহিত করতে চেয়েছিলেন। লুৎফর রহমানের রচনাবলীতে ইউরোপীয় সাহিত্যের ও সমাজজীবনের বিচিত্র নিদর্শন অধিকমাত্রায় পরিলক্ষিত হবার কারণ সেটাই। যৌবনে তিনি ইংরেজি সাহিত্যের প্রচুর বই পড়েছিলেন এবং মধুসূদন দত্তর মতোই খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত হবার জন্য মনস্থির করেছিলেন।

লুৎফর রহমান ১৯১৫ বা ১৩২২ সনের সামান্য পূর্বে সিরাজগঞ্জ (পাবনা) বি. এল ইনস্টিটিউশনে সামান্য বেতনের স্কুল শিক্ষক ছিলেন। এসময়ে তাঁর 'প্রকাশ' (১৩২২) শীর্ষক একটি কবিতার বই প্রকাশিত হয়। অতঃপর বছর পাঁচেকের

মধ্যে তাঁর উপন্যাস ও প্রবন্ধ মিলে পাঁচখানা বই প্রকাশিত হয়। ১৩২৯ সনে দুস্থ-অসহায় নারীদের আর্থিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসনের জন্য তিনি 'নারীতীর্থ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান খোলেন কলকাতার ৫১ নং মির্জাপুর স্ট্রিটে। ঐ প্রতিষ্ঠানের ব্যয়-নির্বাহের জন্য 'নারীশক্তি' নামে একটি মাসিক পত্রিকাও তিনি প্রকাশ করেন। কিন্তু সমাজের বৈরী মনোভাবের জন্য এগুলো বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। তবে নারী সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য যে 'স্কিম' তিনি উদ্ভাবন করেছিলেন তা চিন্তার ধারাতে প্রাগ্রসর হিল বলতে হবে। বিদুষী মাতার প্রভাবে তিনি নারীজাতির মুক্তির ও উন্নতির লক্ষ্যে অনেক চিন্তা ও কাজ করে গেছেন। তাঁর রচনাবলীতে নারী-স্বাধীনতার অপূর্ব জয়গান বাণীবদ্ধ হয়ে আছে। যা আবেগে কেবল শুদ্ধ নয়, মুক্তিতেও সিক্ত। তাঁর অনুবাদ, শিশু-সাহিত্য, গল্পকথিকা, কবিতা সবই এক মহৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

কবিতার বই 'প্রকাশ' (১৩২২/১৯১৫) ব্যতীত ৮টি প্রবন্ধের বই — 'উন্নত জীবন' (১৯১৯/১৩২৬); 'মহৎজীবন' (১৯২৬/১৩৩৩); 'মানবজীবন' (১৯২৭/১৩৩৩); 'সত্যজীবন' (১৯৪০); 'উচ্চজীবন' (১৯৬২); 'ধর্মজীবন' (১৯৮১); 'যুবক জীবন' (১৯৮৫); 'মহাজীবন' (১৯৭৫); এবং ৫টি উপন্যাস — 'সরলা' (১৯১৮); 'পথহারা' (১৯১৯); 'রায়জন' (১৯১৯) 'প্রীতি উপহার' (১৯২৭); 'বাসর উপহার' (১৯৩০)। লেখকের জীবনকালে (মৃত্যু : ১৯৩৬) এইসব বইয়ের একাধিক সংস্করণ জনপ্রিয়তার পরিচয় দেয়। মৃত্যুর পরে বর্তমান সময় পর্যন্ত তাঁর অনেক বইয়ের ৫/৬টি সংস্করণ ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তার স্বাক্ষর বহন করে। বিশেষত তাঁর ছোটদের জন্য লেখা 'ছেলেদের মহত্ত্ব কথা' (১৯২৮); 'রানী হেলেন' (১৯৩৪); 'ছেলেদের কারবালা' (১৯৩১) প্রভৃতি বই মফঃস্বল শহরের শিশুদের জন্য প্রচুর বিক্রয় হয়। কারণ এযুগের লোকের 'প্রকৃত মানুষ' কিভাবে হওয়া যায় — তার সন্ধান করেন, কিন্তু পথ পাওয়া যায় না। গ্রাম্যজনের অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত অভিভাবকগণ এখনও সন্তান 'মানুষ' করতেই চান। একেবারে টাকা উপার্জনের যন্ত্র বা অস্ত্র বানাতে চান না বলেই হয়ত 'মানুষ' হবার উপায়গুলো লুৎফর রহমান থেকেই জানতে চান। এদিক থেকে বাংলা সাহিত্যে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের (১৮২৭-১৮৯৪) 'আচার প্রবন্ধ' 'পারিবারিক প্রবন্ধ' এবং অবশ্যই 'সামাজিক প্রবন্ধ' ইত্যাদি গ্রন্থগুলোর বক্তব্য, লক্ষ্য ও সাহিত্যিক পদ্ধতির সঙ্গে লুৎফর রহমানের অপূর্ব মিল দেখা যায়। কিন্তু ভূদেব আধুনিক যুগের অনুপযোগী খাঁটি হিন্দুর সাধনায় নিয়োজিত ছিলেন। আর লুৎফর রহমান আধুনিক বিশ্বের কাঙ্ক্ষিত উন্নত ব্যক্তিসম্পন্ন 'মানুষ' গড়তে চেয়েছিলেন। তাঁর উপরে উল্লিখিত এবং অনুক্ত, সকল রচনার বক্তব্যই এক ও অভিন্ন। ঘুরে ফিরে কী করে দেশ ও সমাজ সংস্কৃতির উন্নতির সহায়ক 'খাঁটি মানুষ' বা 'বড় মানুষ' হওয়া যাবে — কেবল তারই অনুসন্ধান এবং পর্যালোচনা, উদাহরণ আর উপমা এবং মোটিভেশন।

মোহাম্মদ লুৎফর রহমান 'বাংলার জাগরণের' একজন পথপ্রদর্শক এবং চিন্তক। কাজী আবদুল ওদুদ 'বাংলার জাগরণের' ক্ষেত্রে মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের অবদানকে (পৃ ১৯৩-৯৪) উচ্চ মূল্য দান করে লিখেছেন : তাঁর "নামকরা বই হচ্ছে 'প্রকাশ' আর 'উন্নত জীবন' ও 'মহৎ জীবন'। ....উন্নত নৈতিক-চেতনা সম্পন্ন জীবন গঠনের উপরে তিনি জোর দেন। Smiles-এর নীতি-উপদেশ-পূর্ণ লেখার সঙ্গে তাঁর লেখার কিছু মিল আছে, কিন্তু তাঁর লেখায় জীবনবোধ আরো তীক্ষ্ণ, সেজন্য সাহিত্যিক সম্পদ Smiles-এর চাইতে বেশি।" তিনি 'শাশ্বত বঙ্গ' গ্রন্থের (পৃ ২৬৮) একটি প্রবন্ধে (বেগম রোকেয়ার মৃত্যুপরবর্তী শোক-আলোচনা সভায় পঠিত) লিখেছেন: মানবতাহীনতার অভিযোগ থেকে রেহাই পাবেন যে কজন অব্যবহিত প্রতিভার সাধনাবলে, লুৎফর রহমান তাঁদের অন্যতম।

বস্তুত 'উন্নত জীবনের' কয়েকটি সংস্করণ খুব অল্প সময়ের মধ্যেই লেখক হিসাবে লুৎফর রহমানকে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়। লেখকের চিন্তাশীলতা সমাজে উচ্চ-প্রশংসা লাভ করেছিল। মানবজীবনকে আর্থিক, নৈতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক — সকল দিক দিয়ে উন্নত ও সুস্থ করে তোলাই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য। এই সাধনালব্ধ জ্ঞানই তিনি তাঁর প্রবন্ধে প্রকাশ করেছেন। 'উন্নতজীবন' গ্রন্থ সম্পর্কে 'প্রবাসী' 'মোহাম্মদী' 'হিতবাদী', 'বঙ্গরত্ন' প্রভৃতি প্রত্রিকা এবং বিভিন্ন সময়ে যতীন্দ্র মোহন সিংহ, রায় দীননাথ সান্যাল, ভবেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শশীমোহন সেন, নলিনীকান্ত ব্রহ্ম, শ্রীনারায়ণ দাস তর্কচূড়ামণি এবং মুসলিম সাহিত্যের আলোচনাকারী সকল লেখক, গবেষক, ঐতিহাসিক একবাক্যে লুৎফর রহমানকে মহান মনীষী, বিরল ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি অভিধায় 'ভূয়সী প্রশংসা' করেছেন। 'হিতবাদী' পত্রিকায় বলা হয় :

> "জীবনের যথার্থ উন্নতির পথ দেখাইয়া আত্মবিস্মৃত মোহমুগ্ধ জাতির যিনি জ্ঞান সঞ্চারের চেষ্টা করেন, তাঁহার নিকটে আমরা সামান্য ঋণী নহি। 'উন্নতজীবন' প্রণেতার নিকট বাঙ্গালী জাতি ঋণী.....দেশের বালক ও যুবকগণকে প্রকৃত মানুষ করিয়া তোলার জন্য তিনি যেরূপ সচেষ্ট, সেরূপ অধুনা অতি অল্প লোককেই দেখিতে পাওয়া যায়। ....লেখক প্রতি অক্ষরে আপনার প্রাণ ঢালিয়া দিয়া স্বদেশবাসীর উন্নতি কামনা করিয়াছেন।"

মোহাম্মদ লুৎফর রহমান সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা এই যে: ধর্ম সম্পর্কে 'মুক্তবুদ্ধির' এবং 'মুক্তিবাদী মানবিক ও জাগতিক' ব্যাখ্যাদানের জন্য 'শিখা-গোষ্ঠীর' (১৯২৬) ভূমিকাকে প্রধান গুরুত্বে ব্যাখ্যা করা হলেও এঁদের পূর্বে

মুক্তবুদ্ধির সাধনায় মোহাম্মদ লুৎফর রহমান আত্মনিয়োগ করেছিলেন যে সে কথা কেউ বলেন না। বস্তুত লুৎফর রহমান ১৯২২-২৩ সন নাগাদই 'স্বাধীন মতের উপাসক'রূপে সাহিত্য ক্ষেত্রে বিশেষায়িত হয়েছিলেন। তাঁর চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় — তিনি সমাজ, ধর্ম ও মানুষকে জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ ও সেভাবে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছিলেন। তাঁর রচনায় সমকালের বাঙালির ধর্ম-ভাবনার অকপট চিত্র পাওয়া যায়। তিনি ভেবেছিলেন, মুসলমানদের জাগতিক উন্নতির উপায় হচ্ছে কর্ম ও শ্রমের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি, আর প্রয়োজন, মনুষ্যত্ববোধের পূর্ণ-উদ্বোধন। এসবের প্রতি অশ্রদ্ধা ও বিমুখতাই তাঁদের পশ্চাদপদতার কারণ। এর মূলে আছে অশিক্ষা ও দারিদ্র্য। অজ্ঞতা থেকে চিন্তার আড়ষ্টতার উদ্ভব। অতএব অশিক্ষা ও অজ্ঞতা নিয়ে ধর্ম সম্পর্কে চিন্তা করতে গিয়ে মুসলমানেরা বাঁধা পড়েছিল ধর্মেরই অলঙ্ঘনীয় কঠোর শৃঙ্খলে। সমাজ-সংস্কারকের দৃষ্টিতে তাই তিনি ধর্মকে মানবতাবাদী দার্শনিকের যুক্তি ও ন্যায়ের ভিত্তিতে মানুষের কল্যাণের উপায়রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষের হৃদয় থেকে স্নেহ, প্রেম, দয়া-মায়া এসবের অপসারণ-লক্ষ্যে যান্ত্রিক-নিয়মে ব্যায়াম করানোর জন্যে, রুটিন মাফিক তপস্যাকারীরূপে মানুষকে গড়ে তুলতে ধর্ম পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়নি। তাঁর মতে 'ধর্ম ব্যায়ামমাত্র'। তাঁর ধর্ম-চিন্তার সারকথা একত্র করলে বোঝা যায়, তিনি প্রেম-ধর্মের উপাসক ছিলেন। রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের ধর্ম-দর্শন ও সাহিত্য-চিন্তার সঙ্গে লুৎফর রহমানের ধর্ম-দর্শন ও সাহিত্য-চিন্তার অপূর্ব মিল দেখা যায়।

এমন মহান সাহিত্যস্রষ্টা সম্পর্কে আমাদের সাহিত্য সমাজের ঔদাসীন্য অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক। আত্মপ্রত্যয়ণায় সম্মতি না থাকলে এই লেখকের চিন্তাধারার পরিচয় গ্রহণ করা এবং সমাজে তার প্রচার করা বাঙালির জাতীয়-স্বার্থেই করা উচিত।

ঢাকা ১৯৯৩

গ্যাট চুক্তি : আমেরিকা ও উন্নয়নশীল দেশ — জিতল কে?

বেণু গুহঠাকুরতা

গত প্রায় একবছর ধরে ভারতবর্ষে, তাইবা কেন বলা যায় পৃথিবী জুড়ে হট্টগোল হয়ে গেল উরুগুয়ে রাউন্ড বা ডাঙ্কেল প্রস্তাব (বা, অধুনা গ্যাট চুক্তি) নিয়ে। একদলের বক্তব্য এতে পৃথিবীতে ব্যবসা-বাণিজ্যের অবাধ প্রসার হবে ফলে সবাই কমবেশি লাভবান হবে, অপরপক্ষ-বিশেষ করে এদেশের বামপন্থী মহলের বক্তব্য, এতে দেশের সর্বনাশ হয়ে যাবে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির কব্জায় এ দেশের অর্থনীতিকে বন্ধক রাখা হবে, এদেশের গ্রামীণ অর্থনীতিকে সাম্রাজ্যবাদের হাতে তুলে দেয়া হবে। এব্যাপারে এদেশের বাম ও রামভক্তদের মূল সিদ্ধান্তে বিশেষ ফারাক দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

সাধারণ মানুষের কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই ধোঁয়াটে। গ্যাটই বা কাকে বলে, আর উরুগুয়ে রাউন্ডই বা কি জিনিস, আর ডাঙ্কেল প্রস্তাবটাই বা কি— এ সম্পর্কে তাদের কোন সমাক ধারণা আছে বলে মনে হয় না। পত্রপত্রিকাতে এব্যাপারে এত কথা বলা হয়েছে যে তাতে ধারণা পরিষ্কার হওয়ার চাইতে অপরিষ্কার হওয়ার সম্ভবনাই বেশি।

I.T.O

প্রথম থেকেই শুরু করা যাক। গ্যাট অর্থাৎ জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্যারিফস্ এন্ড ট্রেড-এর জন্মসূত্র জড়িয়ে আছে বিশ্বব্যাঙ্ক এবং আই.এম. এফের জন্মকালের সঙ্গে। ১৯৪৪ সালে অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার প্রাক্কালে Bretton Woods Confrence অনুষ্ঠিত হয়। উদ্দেশ্য যুদ্ধবিধ্বস্ত বিশ্ব অর্থনীতির পুনর্গঠন। এইখানেই সিদ্ধান্ত হয় ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক এবং আই এম এফ গঠন করার। সেই সঙ্গে এটাও স্থির করা হয় যে বিশ্বের ভবিষ্যত ব্যবসা-বাণিজ্য কিভাবে চলবে তা স্থির করবার জন্যও একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করা প্রয়োজন। এই কথাগুলি মাথায় রেখে ১৯৪৬ সালে জাতিসঙ্ঘের উদ্যোগে এই ধরনের একটি সংস্থা স্থাপনের জন্য কিছু আইনকানুন তৈরি করা হয়। স্থির হয় সংস্থাটির নাম হবে International Trade Organisation বা সংক্ষেপে I.T.O. নানান টানাপোড়েনের পর সবাই মোটামুটি একটি ঐকমতো এসে উপস্থিত হলেন। হাভানাতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই সম্মেলন। ফলে সম্মেলনে প্রদত্ত দলিলটি পরিচিত হয়েছিল হাভানা চার্টার নামে। কিন্তু বাধ সাধলেন আমেরিকা। যুদ্ধের পর তখন তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের রমরমা অবস্থা। তখন তাদের মেজাজই আলাদা। ফলে মার্কিন কংগ্রেস হাভানা চার্টার মেনে নিতে গররাজি হলেন। বাকি সবাই বললেন — ওরাই যদি না থাকে শুধু আমরা থেকেই বা কি করব? অতএব International Trade Organisation এর মৃত্যু সম্পন্ন হল।

GATT

কিন্তু যেহেতু ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য একটি সংস্থার প্রয়োজন ছিল এবং মার্কিন প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা ছিল কংগ্রেসের অনুমোদন না নিয়েই ঐ ধরনের সংস্থায় যোগদান করবার, তাই ১৯৪৭ সালে তৈরি হল একটি সাদামাটা সংস্থা যার নাম হল General Agreement on Tariffs and Trade বা সংক্ষেপে GATT. এই সংস্থার হাতে সিদ্ধান্ত নেবার কোন ক্ষমতা ছিল না। যা হবে তা সবার সঙ্গে আলোচনা করেই স্থির করা হবে। যার খুশি এতে যোগ দেবে, পছন্দ না হলে দূরে থাকবে। (যেমন কোন কমিউনিস্ট শাসিত দেশই এর সভ্য ছিল না। প্রথম থেকেই এঁরা এই সংস্থার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের গন্ধ আবিষ্কার করেছিলেন।) এটাই ছিল আগেকার ITO এবং বর্তমানের GATT এর মধ্যে পার্থক্য যাকে মার্কিন কংগ্রেসের Office of Technology Assessment ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে— The difference was that GATT on its surface was just an agreement, it did not explicitly call for the creation of an International Organisation. For example GATT's language does not provide for a general assembly or standing committee, but merely refers to the "contracting parties" acting in concert. Originally intended as a measure until United States

endorsed an ITO, GATT has provided the legal framework for trading among nations for over 40 years. In fact the member countries did form an organisation to carry out GATT's business. However GATT has the flovour of a loose, hastily arranged outfit, reminiscent of the Article of Confederation that preceeded the US Constitution. A key weakness is GATT's set of procedure for resolving disputes under its provision, in which any country can, in effect, veto any ruling against it.'' (সূত্র Competing Economics : America, Europe and Pacific Rim. Box 4A, P128, Published by Congress of the United States, Office of the Technology Assessment) একটা কথা খুব পরিষ্কার এর থেকে যে গ্যাটের হাতে কোন দেশের গলা কেটে নেবার অধিকার নেই যতদিন না অন্য কোন ধরনের আন্তর্জাতিক সংস্থার জন্ম হচ্ছে। তবে উরুগুয়ে রাউন্ডের আলোচনায় সেই ধরনের একটি সংস্থা গঠন করার প্রস্তাব আছে যার নাম হবে World Trade Organigation, তবে সেটা কবে গঠিত হবে তা কেউ বলতে পারে না, কারণ বিশ্বের তিন প্রধান বাণিজ্যিক গোষ্ঠী আমেরিকা, জাপান এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন-এর দেশগুলির মধ্যে প্রতিটি ব্যাপারে বিরোধ এখনও লেগেই রয়েছে।

যাহোক! ১৯৪৭-এ জেনেভাতে ২৩ জন সদস্য নিয়ে গ্যাটের জন্ম হল। এর ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল— দেশে দেশে জীবনধারনের মান উন্নয়ন, কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা, প্রতিটি দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করা, উৎপাদনের প্রসার ঘটানো এবং প্রতিটি দেশের অর্থনীতিতে গতিবেগ সৃষ্টি করা। এই সংস্থার মূলনীতি হল : কোন রকম বৈষম্য ছাড়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ। যদি কোন বৈষম্য করা হয়, তাহলে তা প্রথম থেকেই ঘোষণা করতে হবে। বর্তমানে গ্যাটের সভ্য ১১৭টি দেশ। ১৯৪৭ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত উরুগুয়ে রাউন্ডের মতো আরও সাতটি রাউন্ডের আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং প্রত্যেকটিতেই বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে বাণিজ্য-শুল্ক ছিল তা কমিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে।

উরুগুয়ে রাউন্ড

কিন্তু আলোচনা আটকে গেল ১৯৮৬ সালের উরুগুয়ে রাউন্ডে এসে, কোন ব্যাপারেই আর ঐকমত্যে আসা যাচ্ছে না। রাউন্ডের পর রাউন্ড কেবল আলোচনাই হচ্ছে, কিন্তু কোথায়ও এসে পৌঁছনো যাচ্ছে না। ঠিক হল ৯২-এর মধ্যেই আলোচনা শেষ করতে হবে। কিন্তু তা হল না— আবার স্থির হল, আর নয়— ১৯৯৩ এর ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যেই সবাইকে একটা ঐকমত্যে আসতে হবে। কি ধরনের ঐকমত্য হয়েছে তা আমরা সবাই মোটামুটি জানি। ইতিমধ্যে বছর তিনেক আগে তদানীন্তন গ্যাটের সেক্রেটারি জেনারেল আলোচ্য বিষয়বস্তুগুলিকে একটি খসড়াতে পরিবর্তিত করে সভ্যদের মধ্যে পেশ করেন, যাকে আমরা এদেশে ডাঙ্কেল প্রস্তাব বলে জানি। ইতিমধ্যে ডাঙ্কেল সাহেব অবসর নিয়েছেন। নতুন সেক্রেটারি জেনারেল হয়ে এসেছেন পিটার সাদারল্যান্ড সাহেব।

কেন এই বিরোধ ?

এবার দেখা যেতে পারে গ্যাটের সভ্যদেশগুলির প্রধানরা, যারা দখল করে আছেন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের শতকরা ৮০ ভাগ, তারা কেন ঐকমত্যে আসতে পারছে না নিজেদের মধ্যে ? কারণ একটাই — এই উন্নত দেশগুলি যাদের আমরা জি-সেভেন দেশ বলে জানি তারা কেউই সুখে নেই। সবাই গত কয়েক বৎসর ধরে অর্থনীতিতে মন্দা রোগে ভুগছে। এবং তা কবে শেষ হবে কেউ জানে না।

এদেশে অনেকের ধারণা সোভিয়েত ইউনিয়নের অবলুপ্তির ফলে, আমেরিকার কথাতেই দুনিয়া উঠছে বসছে। তাকে ঠেকাবার কেউ নেই। এখন বিশ্ব নাকি Uni-polar হয়ে গিয়েছে। অতএব সবাই সাবধান, বিশেষ করে গরীব দেশগুলির বিপদ যে কত রকমের হতে পারে তা কেউই জানে না।

মার্কিন অর্থনীতিতে সংকট

কিন্তু উরুগুয়ে রাউন্ডের আলোচনার শেষে সব দেখে শুনে মনে হচ্ছে কথাটা বোধ হয় ঠিক নয়। এমন কি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ক্লিন্টন সাহেব বোধ হয় ঐ মত পোষণ করেন না। কারণ গত ১৬ই ফেব্রুয়ারি, তাঁর দেশের হেজে যাওয়া অর্থনীতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে সাহেব দুঃখ করেছেন— ''For the last 30 years living standards in USA have been breaking down. For the past 20 years, the real compensation of working Americans has grown at a disappointing rate.

For 12 years (during Reagan and Bush presidencies) a policy of trickle down economics had built a false prosperity on a mountain of Federal debt.

As a result of our national drift, far too many American families, even those with two working parents no longer, dream of a better life for their children.''

(সূত্র : The Statesman, 17th February, 1994)

ক্লিন্টন সাহেবের এই কান্না অযৌক্তিক নয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আমেরিকা এখন আর বুক ফুলিয়ে মাল বিক্রি করতে পারছে না। ফলে ১৯৭৫-এর পর থেকে তার বহির্বাণিজ্যে ঘাটতির পরিমাণ বেড়েই চলেছে। একদিকে আমদানি বৃদ্ধি অপর

দিকে রপ্তানি কম — ফলে সংকট ক্রমশই তীব্র হয়ে উঠছে। নিচের তথ্য সেই কথাই প্রমাণ করবে—

বৎসর	বিশ্বের আমদানি বাণিজ্যে আমেরিকার অংশ শতকরা কত ভাগ	রপ্তানি বাণিজ্যে আমেরিকার অংশ শতকরা কত ভাগ
১৯৭৫	১১.৭ ভাগ	১২.৭ ভাগ
১৯৭৭	১৩.৬ ,,	১০.৮ ,,
১৯৭৮	১৩.৮ ,,	১১.১ ,,
১৯৭৯	১৩.১ ,,	১১.১ ,,
১৯৮০	১২.৫ ,,	১১.১ ,,
১৯৮১	১৩.৪ ,,	১১.৯ ,,
১৯৮২	১৩.৪ ,,	১১.৬ ,,
১৯৮৩	১৪.৪ ,,	১১.১ ,,
১৯৮৪	১৭.২ ,,	১১.৫ ,,
১৯৮৫	১৭.৯ ,,	১১.১ ,,
১৯৮৬	১৭.৫ ,,	১০.৩ ,,

(সূত্র : United Nations Department of International and Social affairs, 1985-86, Statistical year book, 35th Issue (New York) NY : United Nations 1988)

সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী এই অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। ১৯৭৫-এর পর থেকে বাণিজ্যে ঘাটতির পরিমাণ বেড়েই চলেছে। ডলারের অঙ্কে শেষ হিসাব হাতের কাছে রয়েছে ১৯৯২ সালের। এই বছর আমেরিকা আমদানি করেছে মোট ৫৫২ বিলিয়ন ডলার মূল্যের পণ্যসামগ্রী অপরদিকে রপ্তানি করেছে ৪৪৭ বিলিয়ন ডলার মূল্যের পণ্যসামগ্রী। ফলে মোট ঘাটতির পরিমাণ ১০৫ বিলিয়ন ডলার। (সূত্র: The Statesman, October 19, 1994, সংবাদদাতা U.N.I)

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে আমেরিকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে হটে যাচ্ছে কেন ? প্রথম কারণ আমেরিকানরা আয়ের চাইতে ব্যয় করেন বেশি ফলে জাতীয় সঞ্চয়ের পরিমাণ অতি সামান্য। গড়ে সাতটি করে ক্রেডিট কার্ড আছে প্রতিটি পরিবারে ফলে অর্থনীতিটা দাঁড়িয়ে আছে ঋণং কৃত্বা, ঘৃতং পিবেৎ এই দর্শনের উপর। দ্বিতীয়ত দেশরক্ষা খাতের বিপুল ব্যয়ভার যা জাতির সম্পদ সৃষ্টিতে কোন কাজে লাগে না। তৃতীয়ত — আমেরিকা আর আগের মতো বিশ্বের বাজারে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াবার মতো উন্নতমানের পণ্যসামগ্রী উপযুক্ত মূল্যে তৈরি করতে পারছে না। একদিকে ক্রেডিট কার্ড সৃষ্ট অভ্যন্তরীণ বাজার ফলে উত্তরোত্তর আমদানি বৃদ্ধি, অপরদিকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পিছু হটার ফলে সারপ্লাস পুঁজি তার হাতে বিশেষ থাকছে না। উন্নত মানের পণ্যদ্রব্য তৈরি করার জন্য যে বিশাল অঙ্কের পুঁজির প্রয়োজন তা আজ তার হাতে নেই ফলে সঙ্কট আরও তীব্র হয়ে উঠেছে।

এই বিপদ কাটাবার জন্য আমেরিকা আজ মোটামুটি তিনটি উপায় অবলম্বন করেছে। এক : যেখানেই অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন সম্ভব সেখানেই পুঁজির বিনিয়োগ। দুই : নিজের দেশের অর্থনীতিতে বিদেশী পুঁজির আহ্বান। তৃতীয়ত — বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা মারফৎ উপযুক্ত আইনকানুন সৃষ্টি যাতে তার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার হতে পারে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যে পরিমাণ বৈদেশিক পুঁজি নিয়োজিত আছে তার শতকরা ২৫ ভাগ নিয়োজিত রয়েছে আমেরিকাতে। ১৯৯০ সালে এর পরিমাণ হয়েছে ৪০৪ বিলিয়ন ডলার। আমাদের দেশের টাকার অঙ্কে প্রায় ১২,৯২,৮০০ কোটি টাকা। এই পুঁজির সিংহভাগ এসেছে নিচের দেশগুলি থেকে।

ব্রিটেন	১০৮.১	বিলিয়ন ডলার
নেদারল্যান্ড	৬৪.৩	,, ,,
জাপান	৮৩.৫	,, ,,
জার্মানি	২৭.৮	,, ,,
ফ্রান্স	১৯.৬	,, ,,
কানাডা	২৭.৭	,, ,,

(সূত্র : US Dept of Commerce, Bureaue of Economic Analysis, Russel B. Scholl, 'The International Investment Position of the United States in 1990', Survey of Current Business Vol 71, No. 6, June 1991, P32)

১৯৭৭ সালে আমেরিকাতে বিদেশিদের সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৪১,৭৫৯ মিলিয়ন ডলার, ১৯৮৮তে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৮১,৩১৬ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ গড়ে প্রতি বছরে তা বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ১৮.৯ ভাগ। ১৯৭৭ সালে বিদেশি পুঁজি নিয়োজিত শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন মূল্য ছিল ৫০,৪৮৯ মিলিয়ন ডলার। ১৯৮৮ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৫৮,৫১১ মিলিয়ন ডলার। (সূত্র : US Dept of Commerce, Bureau of Economic Analysis, Foreign Direct Investment in the United States, Operations of US Affiliates of Foreign Companies, Preliminary 1998 Estimates, 1990. Table E7 & Table B5)

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ঘাটতি পূরণে মার্কিনি মতলব

অপরদিকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ৪২১ বিলিয়ন ডলার মার্কিন পুঁজি নিয়োজিত রয়েছে। আমেরিকার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যে বিপুল পরিমাণ ঘাটতি রয়েছে তার কিছুটা পূরণ হয় এই নিয়োজিত পুঁজি থেকে যে মুনাফা হয় তাকে স্বদেশে ফিরিয়ে এনে। কিন্তু, তাতে সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। তাই এই কঠিন পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমেরিকা উরুগুয়ে রাউন্ডের আলোচনাকালে কতকগুলি নতুন বিষয় অন্তর্ভূক্ত করে। এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মার্কিন কংগ্রেসের Office of the Technology Assessment বলছে —

"While GATT and its codes have eliminated some non-tariff barriers, they have not succeeded to the same extent as the efforts to reduce quotas and tariffs. Non-tariff barriers have been an important focus of the latest GATT negotiating round, which began in 1986 scheduled for completion in 1990 but has been extended through 1992. Canada and EC have proposed replacing GATT with an ITO, but the proposal will be considered only after Uruguay Round is completed.

The United States priorities in Uruguay Round negotiations have included :

1) Extension of GATT to require countries to afford certain minimum levels of protection for intellectual property (patents, copyrights and the like).
2) Extension of GATT to cover investment.
3) Extension of GATT to cover services.
4) Stronger dispute settlement mechanism.
5) A stronger legal regime to minimise subsidies and dumping.
6) Tighter limits on exceptions to GATT's requirements granted to developing countries, and
7) Strengethening of GATT's coverage of Trade in Agricultural products.

(Source : Competing Economics : America, Europe and the Pacific Rim, Box 4A P 129.)

আমেরিকার উদ্দেশ্য কতটা সাধিত হয়েছে তা আমরা পরে পর্যালোচনা করব। তার আগে আমরা দেখতে পারি যারা ফ্রি-টেডের প্রবক্তা, তারা নিজেরা তাতে বিশ্বাস করেন কিনা।

অবাধ বাণিজ্য কতটুকু অবাধ

প্রথমে আমেরিকার কথাতেই আসা যাক। আমেরিকা এমন একটা ভাব দেখায়, যেন তার দেশের বাণিজ্যের দরজা সবার জন্যই খোলা রয়েছে, যে কেউ অবাধে সেখানে প্রবেশ করতে পারে। কথাটা আংশিক সত্য। যেমন ধরুন বস্ত্র শিল্প। আমেরিকা এখানে উন্নয়নশীল দেশগুলির ভয়ে ভীত। একথা সত্য নয় যে উন্নত দেশগুলিই কেবল সস্তায় শিল্প পণ্য উৎপন্ন করতে পারে, অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে ভারতের মতো পেছিয়ে পড়া দেশগুলি এগিয়ে আছে (নানা কারণে)। একে ঠেকানোর জন্য তার প্রয়োজন হয়েছে Multifibre Agreement চালু করবার। প্রবর্তন করা হয়েছে কোটা সিস্টেম। অর্থাৎ ভারতবর্ষ খুশিমত মার্কিন দেশে বস্ত্রজাত পণ্য বস্ত্রজাত রপ্তানি করতে পারবে না, যতটুকুই তার কোটা— ততটুকু পারবে।

এছাড়া শিল্পোদ্যোগে সরকারি সাহায্য সম্পর্কেও তার বক্তৃতার শেষ নেই অথচ সে নিজে অসামরিক বিমান শিল্পে আমেরিকার প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য NASA এবং দেশরক্ষার নামে কত টাকা ব্যয় করে তা কেউই জানে না।

তৃতীয়ত, অবাধ বাণিজ্যের ঢক্কানিনাদের আড়ালে তাকেই আবার দেখা যায় আঞ্চলিক বাণিজ্য জোট গঠন করতে। যেমন North American Free Trade Association বা NAFTA। চতুর্থত সুপার ৩০১ ধারা প্রয়োগের হুমকি।

জাপানি ব্যবস্থা

জাপানের এব্যাপারে একটু আভিজাত্য আছে। জাপানে আমদানি শুল্কের বেড়াজাল তেমন নেই তবে এমন বন্দোবস্ত আছে যাকে আমেরিকানরা বলছে Non-tariff barrier.যেমন নিচের শিল্পজাতদ্রব্যগুলি। এতে তিনটি দেশের আমদানি শুল্কের হার দেওয়া হল।

	জাপান	ইসি দেশগুলি	আমেরিকা
প্যাসেঞ্জার কার-	শুল্ক নেই	১০.০%	২.৫%
হেভি ট্রাক-	"	২২.০%	৮.৫%
ভি সি আর-	"	১৪.০%	৩.৯%
টিভি-	"	১৪.০%	৫.০%
টেলিফোন সেট-	"	৭.৫%	৮.৫%
সুইচিং ইকুইপমেন্ট-	"	৭.৫%	৮.৫%
যন্ত্রাংশ-	"	৪.৯%	৮.৫%
কম্পিউটার-	"	৪.৯%	৪.৯%
"মনিটরস্-	"	৪.৯%	৩.৭%
সেমি কন্ডাক্টর-	"	১৪.০%	শুল্ক নেই
ফটো কপিয়ার-	"	৭.২%	৩.৭%
ঐ যন্ত্রাংশ-	"	৭.২%	৩.৯%

(সূত্র : Office of the Technology Assissment, Congress of the United States, 1991, devived from published tariff Schedules for the United States, EC and Japan.)

কিন্তু জাপানের বাজারে আপনি ঢুকতে পারবেন না যদিনা সে জিনিসটিতে জাপানের প্রয়োজনীয়তা থাকে। যেমন ধরুন লৌহ আকর। বস্তুটি ভারতবর্ষ জাপানে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি করে। কারণ এটি জাপানে আদৌ পাওয়া যায় না। যেমন তেল বা এমন জিনিস যা আমদানি করে শিল্পজাত দ্রব্যে পরিণত করে আবার রপ্তানি করা চলে অন্যদেশে। ফলে আমেরিকা কেন — যে কোন দেশের পক্ষেই জাপানের বাজারে প্রবেশ করা খুবই কঠিন। আমেরিকানদের এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতা হল : Some have likened Japan's trade obstacles to an onion. When one layer is peeled away, another is waiting below. This happened with semi conductors and super computers. It occured from 1980 to 1983, when US producers of Aluminium bats tried to have their bats certified for use in Japan by the government-run children's baseball league. First certification was flatly denied, though that went against an agreement signed by Japan in 1979 as a part of GATT's Tokyo Round. Then certification was offered but conditioned on meeting discriminatory standards requiring an alloy seldom used in the United States and a base plug not used in US made bats. Then the standards were changed, but the US factories, because they were outside Japan, could not be qualified as meeting the standards, so that each lot of bats would have to be opened and inspected individually. Finally the inspection issue was resolved, but Japanese distributors refused to carry US-made bats, effectively shutting the US producers out of the market. Each step required high level US government involvement. (সূত্র : Back to Business by Prestwitz Jr. in Business Tokyo, July 1990 P40)

আরও অনেক এমনই মজার ঘটনা ঘটে জাপানে। ১৯৮৯ তে এক আমেরিকান সংস্থা সরকারের কাছে অভিযোগ করেছিল, তাদের একটি বিজ্ঞাপন দুটি জাপানি ট্রেড জার্নাল, ছাপতে অস্বীকার করেছে তাদের জাপানি প্রতিযোগীদের চাপে পড়ে। আমেরিকান বাণিজ্য প্রতিনিধি Glen Fukushima এব্যাপারে মন্তব্য করেছেন— While the outcome of this case is positive, it is troubling to realize that it required the intervention of USTR and MITI, (দুই দেশের সরকারি সংস্থা — লেখক) potential congressional involvement and 1 year of frustrated effort for a major, well established and well endowed American Company even to place an ad in two Japanese trade journals— several stages removed from actually making a sale to Japanese users. (সূত্র : Ibid PP 96-99)

এই অভিযোগ, শুধু আমেরিকানদেরই নয়, ভারতীয়রাও ঐ একই অভিযোগ এনেছেন, জাপানিদের বিরুদ্ধে। কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজের সিনিয়র ডিরেক্টর শ্রীমতী মানসী রায় অল্পকিছু দিন আগে জাপান ঘুরে এসেছেন। দি টেলিগ্রাফের প্রতিনিধি শ্রীমতী সুধা ভাটিয়ার সঙ্গে অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন : I found that although the tariffs were very low, which should have resulted in flooding of imported goods, this is not the case. This is because their distribution system is so complex making it virtually impossible for any other country to make a dent in their market. (The Telegraph, 16th October, 1993).

জাপানের সঙ্গে চুক্তি করে ফায়দা নেই

জাপানের সঙ্গে ব্যবসার আরেকটি বিপদ হল বাণিজ্য চুক্তি অনুযায়ী আপনার ব্যবসা বাড়বে না। প্রমাণ আমেরিকার সঙ্গে সেমিকন্ডাক্টর চুক্তি। এই চুক্তির একটি ধারা মতে জাপানের বাজারের ২০ শতাংশ আমেরিকানরা পাবে এরকম আশা করা হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল আমেরিকার শেয়ার ১০ শতাংশের বেশি কিছুতেই বাড়ছে না। ১৯৭২ থেকে বাদানুবাদ চলে আসছে। শেষ পর্যন্ত ১৯৮৫ এর ৩১শে জুলাই আবার একটি চুক্তি হল, একই আশা নিয়ে। দু বছর কেটে গেল কিন্তু অবস্থার কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। ১৯৮৭ সালে আমেরিকা ক্ষেপে গিয়ে জাপানি কমপিউটার ও কিছু বিদ্যুৎ চালিত যন্ত্রপাতির উপর আমদানি শুল্ক বাড়িয়ে দিল। ১৯৯০-তে আবার বৈঠক এবং জাপানি সরকারের হস্তক্ষেপের ফলে তা বেড়ে হল ১৩ শতাংশ। ১৯৯১ সালে ৪ঠা জুন আবার দুই দেশের মধ্যে চুক্তি হয়েছে যে ১৯৯২-এর শেষে যাতে আমেরিকার অংশ বেড়ে ২০ শতাংশ হয়। শেষ সংবাদ আমার জানা নেই। ১৯৭২ থেকে ১৯৯২, বিশবছর ধরে টানা হেঁচড়া ও চুক্তির পর চুক্তির করেও অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। আজও আমেরিকা ও জাপানের মধ্যে ৭০টি চুক্তি রয়েছে কিন্তু জাপানের সঙ্গে আমেরিকার বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ আজ ৫৩ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি। এই কারণেই আমেরিকা আজ বলছে এসব কাগুজে চুক্তির কোন দাম নেই। জাপানকে বলতে হবে সে আমেরিকার কাছ থেকে কত টাকার মাল কিনবে। যদি তা না করা হয় তাহলে প্রয়োগ করা হবে ধারা ৩০১। জাপানের উত্তরটাও মজার। জাপান বলছে ছিঃ, একে কি অবাধ বাণিজ্য বলা চলে ? এ তো Managed Trade, আমরা এতে কি করে রাজি হব ? এর মধ্যে প্রতিযোগিতা কোথায় ?

জাপানের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নিজের অংশ বাড়াবার আরেকটি হাতিয়ার হল বিদেশে এমন ভাবে পুঁজি রপ্তানি, যাতে করে সে দেশে জাপানি মালের বিক্রি বাড়ানো যায়। ফলে দেখা যায় আমেরিকায় নিয়োজিত জাপানি পুঁজির বেশির ভাগই রয়েছে জাপানি মাল কেনা-বেচার কাজে। শিল্পে নয়। এবং শিল্পে নিয়োজিত জাপানি পুঁজি কখনও মেশিনপত্র বিশ্ববাজার থেকে কেনে না। সবই নিয়ে আসে জাপান থেকে।

"A detailed survey in 1987 showed 93 percent of the imports of Japanese affiliates were from Japan." শুধু তাই নয়, "In 1988 the combined total

of wholsale and manufacturing sales of motor vehicles by all foreign affiliates amounted to $80.9 billion. Two Thirds of this ($52.9 billion) was from Japanese affiliates and most of it ($ 44.3 billion) was sales from wholesaling not manufacturing establisments (Source: Competing Economics: America, Europe and the Pacific Rim. PP 90-91)

জাপানের আমেরিকায় পুঁজি বিনিয়োগের আরেকটি লক্ষ্য হল Advanced Technology-র ক্ষেত্রে যথাসম্ভব অনুপ্রবেশ যা শেষ পর্যন্ত আমেরিকানদের ক্ষেত্রে বিপদের সৃষ্টি করতে পারে।

"For example, the recent decision of the administration to allow the Japanese company Nippon Senso to purchase Semi-Gas System, a supplier of high quality gas equipment to semi conductor makers (and a participant in Semtech), could make the US semiconductor industries vulnurable in several ways. The purchase will mean that Japanese companies will control over 40 percent of the world market and nearly half of the US market for high quality gas equipment. (Source: letter from Senator Jeff Bingman and Lloyd Bentson to James F. Rill, Assistant Attorney General Antitrust Division, US Department of Justice, Sept 27, 1990).

এখন আমেরিকার ভয় হল: It might for instance, mean that Nippon Senso could cut off sapplies to Semtech (আমেরিকান সংস্থা) or its member companies in response to trade policy decisions like the 1989 naming of Japan as unfair trader under the super 301 sections of US trade law. Or the pressure could be more on business operations than politics: Nippon Senso could selectively favour its Japanese customers with new products, low prices and quick deliveries. (Sheridon Tatsuno, US threatened by Rash of High Tech buy-outs, New Technology Week, Monday August 6, 1990, P7) ইতিমধ্যেই অভিযোগ উঠেছে সাত রকমের Semi-conductor equipments আমেরিকান সংস্থাগুলি পাচ্ছে জাপানিদের চাইতে দুই/তিন বৎসর পরে।

বিদেশি পুঁজির জাপানে প্রবেশের অবাধ অধিকার নেই। ১৯৮৫ পর্যন্ত মোটামুটি দুই দেশেরই পরস্পরের সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৬৪ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু পরবর্তী তিন বছরে আমেরিকাতে জাপানের সম্পত্তির পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ২৭৫ বিলিয়ন ডলার কিন্তু আমেরিকান সম্পত্তির পরিমাণ জাপানে সেই পরিমাণে বাড়েনি। ১৯৮৮-তে তা হয়েছিল ১২৯ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ অর্থনীতির সর্বক্ষেত্রেই জাপান আমেরিকাকে কোণঠাসা করে রেখেছে। তারই জন্য উরুগুয়ের রাউন্ডের আলোচনায় দুই দেশের মধ্যে এত তিক্ততা। এবং এই দুই মহারথীর কেউই PQSS qO_এর পূজারী নয়। আর এক মহারথী রয়ে গেল তার নাম ইউরোপিয়ান কমিউনিটি, তার অবস্থাটা এবার দেখা যেতে পারে।

ইউরোপিয়ান কমিউনিটি

এরা যে অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিশ্বাস করে না তা এদের নাম থেকেই বুঝতে পারা যায়। তাদের একটাই উদ্দেশ্য সভ্যদেশগুলির বাণিজ্য স্বার্থ রক্ষা করা। ফলে আমেরিকার সঙ্গে ঝগড়া রয়েছে একেবারে তুঙ্গে। যদিও আমেরিকার ব্যালান্স অব ট্রেডে ইসিদেশগুলির সঙ্গে কোন ঘাটতি নেই তবে বাড়তিটাও কিছু উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু আলাদা আলাদা করে যদি দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে আমেরিকা এগিয়ে তো নয়ই উল্টে অনেকটাই পেছিয়ে রয়েছে। যেমন জার্মানির সঙ্গে ঘাটতি রয়েছে, ৮৯ সালে ৮ বিলিয়ন ডলার এবং ইতালির সঙ্গে ৪.৭ বিলিয়ন ডলার।

ইসি দেশগুলির সম্পূর্ণ একীকরণের ফলে এই বাজার আরও সঙ্কুচিত হবার সম্ভাবনা প্রবল এবং এ ব্যাপারে আমেরিকার চিন্তার কারণ হল—

The most direct effect of EC 92 on the United States will come through trade policy, public procurement policy, and new mechanism for setting technical standards. EC trade policy differentiates between goods produced within the EC and those imported into it, discriminating against the latter. The new EC public procurement system does the same, providing large benefits for goods where at least half the content added in the EC. And as Europe develops new procedures for setting EC-wide standards to replace existing national standards, US firms have worried both that they will be frozen out of the process and the EC firms will use the standards to keep out foreign made goods. (Source: EC 92: Trade and Industry Policy, Competing Economics: America, Europe and Pacific Rim P 192)

এছাড়াও রয়েছে ইউরোপের বুকে জাপানি প্রতিযোগিতার ভয়। গত কয়েক বৎসরে জাপানি পুঁজি বৃদ্ধি পেয়েছে প্রচণ্ড

রকমের। আমদানি শুল্কের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সবাই পুঁজি বিনিয়োগ করছে ব্যবসা বাড়ানোর জন্য। গত কয়েক বৎসরে জাপানি পুঁজি ইউরোপ ও আমেরিকাতে গিয়েছে নিচের হারে:

সাল	মোট বিনিয়োগ (বিলিয়ন ডলার)	ইউরোপ	উত্তর আমেরিকা
১৯৮০	৪.৭	১২.৩%	৩৪%
১৯৮৫	১২.২	১৫.৮%	৪৫%
১৯৮৬	২২.৩	১১.৫%	৪৬.৮%
১৯৮৭	৩৩.৪	১৯.৭%	৪৬.০%
১৯৮৮	৪৭.০	১৯.৪%	৪৭.৫%
১৯৮৯	৬৭.৫	২১.৯%	৫০.২%

(Source: Organisation for Economic Co-operation & Development (OECD), OECD Economic Surveys 1988-90: Japan (Paris, France 1990) Table 14, P52)

ইউরোপের বুকে ১৯৯০ সালে জাপান তৈরি করেছিল ২৯৫,০০০ হাজারটি মোটর গাড়ি। ১৯৯৪ সালে তা বেড়ে গিয়ে হবে ৯৩৪,০০০ টি। কাজেই আমেরিকার চিন্তার কারণ ক্রমশ বেড়েই চলেছে।

উরুগুয়ে আলোচনার শেষে কে কোথায় দাঁড়াল?

আট বৎসর লাগাতার আলোচনার পর একথা বলা চলে এই আলোচনায় আমেরিকার স্বার্থসিদ্ধি বিশেষ হয়নি। জাপান এবং ইওরোপের বাজারে তার ব্যবসা যে বিশেষ বাড়বে না সে কথা ক্লিন্টন সাহেব ভালই বুঝেছেন।

বহুকষ্টে আমেরিকা জাপানি এবং দক্ষিণ কোরীয়দের হাত আমেরিকান চাল খাওয়াতে পারবেন কিন্তু ইউরোপে তা হবে না কারণ EC দেশগুলি কৃষিতে ভর্তুকি কমাতে শেষ পর্যন্ত রাজি হয়নি। আমেরিকান ফিল্ম ও টেলিভিশন শিল্পের উপর থেকে বিধিনিষেধ তুলে নেয়নি। অসামরিক বিমান শিল্পে সরকারি সাহায্য বন্ধ করার ব্যাপারেও আমেরিকার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে IMFA তুলে দেবার জন্য আমেরিকা যা সময় চেয়েছিল তা শেষ পর্যন্ত হয়নি। ফলে আমেরিকানরা প্রচণ্ড রেগে গিয়েছে জাপান ও EC দেশগুলির উপর। তাদের রাগবার কারণও ঘটেছে, যেমন: As a result of the failure to reach agreement, the 12 European nations in the community will be allowed to set their own rules on royalties and limits on the number of American and other foreign shows that their television and movie screens will carry.

ফলে হলিউডের কর্তারা EC দেশগুলির উপর প্রচণ্ড রেগে গিয়েছেন। মোশান পিকচার্স এসোসিয়েশন অব আমেরিকার প্রেসিডেন্ট "Mr. Valentin alleged a 'deliberate strategy' by European negotiators to put on the table at 3 am and (offer) so riven with potholes that no rational, sane person could ever consider it". (The Telegraph 17 Dec, 1994)

The Times, London এর সংবাদ অনুযায়ী, "Mr. Lee Hamilton, Chairman of the foreign affairs committee, warned that he expects another rough year on foreign policy issue in 1994, as a result of public scepticism about the foreign aid and free trade." "The GATT deal will face fierce opposition from Congressmen whose districts are seen to be suffering because of the agreement. Among them are ten Democrats with strong Textile interest, who supported NAFTA after President Clinton promised to work towards a 15 year phase out of the Multifibre Agreement. Mr. Clinton could not deliver on his promise, since the final draft envisage only a 10 year phase out. (The Telegraph, December 17, 1993) ফলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টনকে ঢোক গিলে বলতে হচ্ছে: The agreement did not accomplish everything we wanted.... but to-days GATT accord does meet the test of good agreement.

উরুগুয়ে রাউন্ড ও উন্নয়নশীল দেশ

ভারতবর্ষের বাম মহল সবচাইতে বেশি হৈচৈ করেছে উরুগুয়ে রাউন্ড অথবা ডাঙ্কেল প্রস্তাব নিয়ে। কিন্তু অন্য দেশগুলি যেমন চীন, ভিয়েতনাম এই সব দেশগুলিতে মোটেই এই প্রস্তাব নিয়ে কোন হৈচৈ হয়নি। উপরন্তু ভারতবর্ষের অনেক আগেই তারা এই প্রস্তাবে সয় দিয়ে বসে আছে। কিছু লোক বলছেন, চীন তো গ্যাটের সভ্য না হয়েও তার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে, আমেরিকার সাথে টক্কর লাগাচ্ছে, তাহলে আমরাই বা গ্যাটের বাইরে থাকলে ক্ষতি কি?

যারা এসমস্ত কথা বলেন তারা না জেনে অথবা ইচ্ছাকৃত ভাবেই এইসব বাজে কথা বলেন। বরং এর উল্টোই সত্যি। পি.টি.আই বেজিং থেকে ১৯শে ডিসেম্বরে এক সংবাদে জানিয়েছে "China to-day Threatened to withhold trade concessions and ignore the General Agreement on Tariffs and trade (GATT) if it was denied admission to the world trade body before 1995." চীন ১৯৮৬ সাল থেকেই চেষ্টা করে আসছে গ্যাটের সভ্য হওয়ার জন্য। সব রকমে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য চীন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। "If we have not pledged enough concessions during the Uruguay talks, we will make

up for that in the future negotiations on our reentry'' কথাগুলি বলেছেন Mr. Li Zhongzhou, deputy secretary general of China's GATT negotiations team. তিনি আরও জানিয়েছেন ''that China would reduce its tariff levels by more than 33 precent as required by GATT. (The Telegraph, 20 December 1993) অতএব আসল সমাজতন্ত্রী দেশগুলির যদি উরুগুয়ে রাউন্ডে কোন ক্ষতি না হয় তাহলে 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচওয়ালা' দেশের কেন ক্ষতি হবে সেটা বোধগম্য নয়। অতএব উরুগুয়ে রাউন্ডের ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলি সব শ্মশানে পরিণত হবে এমন কথা বিশ্বাস করা শক্ত হয়ে পড়ছে।

গ্যাট চুক্তিতে জিতল কে ?

এত কথার পরও এই প্রশ্নটা থেকেই যায়, যে তাহলে এত কাণ্ডের পর ব্যাপারটা কি দাঁড়াল ? এক কথায় বলা যেতে পারে যা সাধিত হয়েছে তা পর্বতে মুষিক প্রসব।

আমেরিকা যা চেয়েছিল তা পায়নি। জাপানের দরজা বিশেষ আলগা হয়নি একমাত্র চালের ব্যাপার ছাড়া, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কৃষিতে অনুদান কমায়নি, অডিও ভিস্যুয়াল শিল্পকে আলোচনার আওতার বাইরে রেখেছে। অসামরিক বিমান শিল্পে সরকারি অনুদান দেওয়ার অধিকার অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

তবে একেবারেই কিছু হয়নি একথা ভাবলে ভুল হবে। EC দেশগুলিতে আমদানি শুল্ক গড়ে শতকরা ৫০ ভাগ কমানো হয়েছে, অনেকক্ষেত্রে একেবারেই তুলে দেওয়া হয়েছে। সব দেশ মিলিয়ে গড়ে আমদানি শুল্ক কমেছে শতকরা ৩৩ ভাগ, ফলে লাভবান হবে সবচাইতে বেশি উন্নয়নশীল দেশগুলি বিশেষ করে চীন। কারণ এই সব দেশে শ্রমিকদের মজুরি উন্নত দেশগুলির চাইতে অনেক কম, ফলে এদের বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতার ক্ষমতা আগের চাইতে অনেক বেড়ে যাবে।

উন্নত দেশগুলির বাণিজ্যে বিশাল প্রসারতা ঘটবে বলে কেউ মনে করছেন না। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা EC এবং জাপানের বহির্বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে শতকরা ১.৭ ভাগ, আমেরিকার ০.০৪ ভাগ। সব মিলিয়ে ২০০২ সাল নাগাদ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বাড়বে ২৭০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থাৎ মোটের উপর খুব একটা ক্ষতিবৃদ্ধি উন্নত দেশগুলির হবে না। তবে মন্দের ভাল হিসাবে মর্গান স্ট্যানলির Mr. David Roche এর সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলা যায় : The actual economic benifit of the round is hardly the important thing. He points out that world output in the year 2000 is likely to be about $30, 000 billion, making the GATT contribution pale into insignificance. Most important for world consumer and business confidence, according to Mr. Roche, is the maintenance of a system of free and open trade. (The Telegraph 22, December, 1994) আজকের দুনিয়াতে এইটাই হল মূল কথা। একলা বেঁচে থাকার বোধ হয় কোন উপায় নেই। তবে লড়াই শেষ হয়নি। এবার তা আরও জমাট বাঁধবে। তার লক্ষণ স্পষ্ট ভাবেই দেখা যাচ্ছে আলোচনার শেষে।

চতুরঙ্গ পত্রিকার মালিকানা
ও
অন্যান্য বিবরণী

১। প্রকাশ স্থান : ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩
২। প্রকাশের ব্যবধানকাল : মাসিক
৩। মুদ্রক : নীরা রহমান, জাতীয়তা : ভারতীয়
ঠিকানা : ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩
৪। প্রকাশক : নীরা রহমান, জাতীয়তা : ভারতীয়
৫। সম্পাদক : নীরা রহমান, জাতীয়তা : ভারতীয়
৬। স্বত্বাধিকারীদের নাম-ঠিকানা :
নীরা রহমান
৮এ, সামসুল হুদা রোড, কলিকাতা-১৭

আমি নীরা রহমান, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরিলিখিত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী সত্য।

নীরা রহমান

নানা ভাষা নানা মত
নানা পরিধান
বিবিধের মাঝে দেখ
মিলন মহান

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি. এ. ৫২৭/৯৪